আদ-দালালাহ্ আলা

বিদয়াতে দ্বলালাহ্

* কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিদয়াতের ভয়াবহতা
* বিদয়াতের প্রচলিত সংজ্ঞা খন্ডায়ন ও প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ
* যেসব কাজ বিদয়াত হিসেবে প্রচলিত কিন্তু প্রকৃত বিদয়াত নয়
* প্রকৃত বিদয়াতের কিছু উদাহরণ

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রথম প্রকাশ:

জ্বিলহজ্জ-১৪৩৫ হিজরী

সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম ফটোস্ট্যাট এন্ড কম্পিউটিং

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মূল্যঃ ২২০ টাকা।

লেখকের কথা:

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সর্বোত্তম সলাত ও সালাম পেশ করছি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ এর উপর যিনি সত্য দিন ও সীরাতে মুস্তাকীমের দিকে সমগ্র মানবতাকে আহ্বান করার জন্য মহান রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন। পর কথা হলো, যারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করেন এমন প্রতিটি দাঈর উপর অবশ্য কর্তব্য হলো, কুরআন-হাদীসের উপর জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি যুগের চাহিদাকে উপলব্ধী করার চেষ্টা করা। একজন দাঈর ভূমিকা অনেকটা ডাক্তারের মতো। রোগীর সর্ব শরীরে মলম লাগানো ডাক্তারের কাজ নয় বরং তাকে লক্ষ্য করতে হবে প্রকৃত রোগ কোথায় এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। কোন রোগটির গুরুত্ব কতটা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে কোনটি সেটিও এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। দুঃখজনক হলো, বর্তমানে যারা দাওয়াতে দ্বীনের সাথে যুক্ত আছেন তাদের একটি বিরাট অংশ এ বিষয়ে সচেতন নয়। এটা অবশ্যই সঠিক যে, রসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার নিকটবর্তী সোনালী যুগসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর হতে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্ বিভিন্ন প্রকার বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস ও অসঙ্গত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। বিপরীত দিকে এটাও ঠিক যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর হতে আজ পর্যন্ত যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন নতুন জিনিসের উদ্ভব ঘটেছে। এই সকল নতুন সৃষ্ট বিষয়ের সবটা যে মন্দ তা নয় বরং তার মধ্যে একটি বিরাট অংশ ইসলামের সাথে সংঘর্ষের পরিবর্তে সদ্ভাব রেখে চলে। এমতাবস্থায় অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দায়িত্ব ছিল, নতুন সৃষ্ট মন্দ বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া এবং উত্তম বিষয়গুলোর ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহ দেওয়া বা কমপক্ষে সেগুলোর বিপক্ষে কঠোরতা না করা। বাস্তবে ঘটলো এর

বিপরীত। বর্তমান যুগের আলেম-ওলামাদের একটি অংশ “রাসুলের যুগে যা ছিল না তা বিদয়াত” এই স্লোগান দিয়ে নতুন সৃষ্টি প্রতিটি বিষয়কে বর্জন করার নীতি অবলম্বন করলো এবং যারা এসবের কোনোটিতে লিপ্ত হয় তাদের পথভ্রষ্ট বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে লাগলো। এদের অবস্থা হলো ঐ ডাক্তারের মতো যে রোগীর সারা শরীরে মলম লাগায়। আলেম-ওলামাদের আরেকটি অংশ প্রথম দলটির বিরুদ্ধে স্বোচ্চার হলো। তারা বলল, সব নতুন সৃষ্ট বিষয়ই যদি বিদয়াত হয় তবে, বাস-ট্রাক, ট্রেন ও প্লেন কি বিদয়াত! পবিত্র কুরআনে যের-যবর যোগ করা বা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা কি বিদয়াত! এই প্রশ্নটি যৌক্তিক কিনা সেটা লম্বা আলোচনার বিষয়, পরবর্তীতে পাঠক সে বিষয়ে জানতে পারবেন কিন্তু এই দলটির মূল সমস্যা হলো তারা প্রথম দলের সমালোচনা ও তাদের মতামত খন্ডায়ন করেই থেমে যায়। বিদয়াতের প্রকৃত সংজ্ঞা কি এবং তার বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ সে ব্যাপারে তাদের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বিদয়াত বলে আসলে কিছু নেই বা থাকলেও তার তেমন একটা গুরুত্ব নেই। বলা বাহুল্য যে, এই দুটি কর্ম পদ্ধতিই শরীয়তের নির্দেশনার সাথে সমানভাবে বৈপরিত্ব রাখে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদয়াত সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বিদয়াতকে পথভ্রষ্টতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর শাব্দিকভাবে বিদয়াত অর্থ- “যে কোনো নতুন সৃষ্ট বিষয়”। ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, বিদয়াতের এই অর্থ উক্ত হাদীসে উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু সকল নতুন আবিষ্কারই পথভ্রষ্ট বিদয়াত নয়। একারণে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থা, পবিত্র কুরআনে যের-যবর সংযুক্ত করা, সহীহ হাদীসের গ্রন্থ প্রনয়ণ করা করা বা চার মাজহাবের অনুসারী হওয়া বিদয়াত নয়। আবার এর অর্থ এমনও নয় যে, বিদয়াত বলে আসলে কিছু নেই এবং তার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা নেই। এ দুটি

চিন্তাধারার বাইরে সঠিক কর্মপন্থা হলো, নতুন সৃষ্ট বিষয়াবলীর মধ্যে পথভ্রষ্ট বিদয়াত কোনটি তা চিহ্নিত করা এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। বর্তমান গ্রন্থে এটিই আমাদের উদ্দেশ্য। একারণে আমরা গ্রন্থটির নামকরণ করেছি, "আদ-দালালাহ্ আলা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (الدلالة علي بدعة ضلالة) অর্থাৎ- পথভ্রষ্ট বিদয়াতের পথনির্দেশ। মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করি, তিনি যেনো গ্রন্থটিকে মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণময় করেন এবং গ্রন্থটি প্রণয়নে যারা সহযোগিতা করেছেন বা উৎসাহ যুগিয়েছেন, সরাসরি বা ফোনে যোগাযোগ করে বারবার তাগাদা দিয়েছেন তাদের সকলের আমলনামায় এটাকে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

كلمة المصنف

الحمد لله العلي العظيم وأفضل الصلاة والتسليم علي سيد البشر محمد الذي بعثه الله ليدعو العالمين الي دين الحق وصراط مستقيم أما بعد، فيجب علي الدعاة الذين يدعون الناس إلي الله أن يجمعوا بين فهم نصوص القرآن والأحاديث وبين فهم واقعهم فمهمتهم مشابه بمهمة الطبيب فلا ينبغي له أن يدلك سائر جسد المريض بل عليه أن يعين محل الأذي ويداوي بناء عليه ويراعي قائمة الأولويات في مداواة أخطر الأمراض ومما يدعو الي الأسف أن جل دعاة يومنا أغفلوا هذا الأمر

ولا شك في أن الأمة المسلمة بعد انقراض عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وعصور ذهبية تالية له إلي يومنا هذا ظلت في انحراف عقدي وعملي ومن جهة أخري فمما لا شك فيه أيضا أن أمورا محدثة قد حدثت بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم إلي عصرنا هذا حسب ما اقتضته العصور والأزمان وليس من الضروري أن يكون كل تلك الأمور المحدثة مذموما لأن كثيرا منها يوافق الشرع بدلا من أن يخالفه فكان علي العلماء الحذاق وأولي الأمر والحالة هذه أن يميزوا ما كان مذموما من تلك المحدثات ويثوروا ضدها أشد ثورة أما ما كان منها خيرا فيدعو الناس إليه أو يسكتوا عنه ولايشددوا فيه علي الأقل ولكن الواقع خلاف هذا تماما فبعض علماء عصرنا رفعوا شعار "كل ما لم يكن في عهد الرسول فهو بدعة" فتبنوا أسلوب ترك كل ما كان محدثا وظلوا يفندون كل من يرتكب شيئا منها أشد تفنيد فكان مثلهم كمثل الطبيب الذي يدلك سائر جسد المريض

وخالفهم في ذالك طائفة أخري من العلماء فردوا عليهم بقولهم إن كان كل محدث بدعة فهل الحوافل والشاحنات والقطارات والطائرات كل هذه المخترعات بدعة!! وهل تنقيط المصاحف وبناء المدارس بدعة!! ولا يهمنا الآن إن كان هذا الرد منطقيا أم لا وسيعرفه القارئ في طيات هذا الكتاب إن شاء الله إلا أن المشكلة الرئيسية في طريقة هذه الطائفة أن دورهم ينتهي عند الرد علي منهج الطائفة الأولي و نقد طريقتهم فإنهم لا يتكلمون في تحديد البدعة ولا يبينون الطريق الصحيح لمكابحة البدعة وكأنهم يقولون بلسان حالهم أن ليس هناك شيء يسمي بدعة وعلي فرض وجوده فليس بقابل لكبير إهتمام!! وكلتا الطائفتين علي طريقة مخالفة للشريعة سواء بسواء فالرسول صلي الله عليه وسلم أمرنا أمرا جازما بأن نحذر البدعة ووصف البدعة بأنها ضلالة والبدعة بمعناها اللغوي يتناول كل شيء محدث وقد اتفق العلماء علي أن هذا المعني غير المراد في الحديث المذكور سابقا لأن كل شيء أحدث ليس ببدعة ضلالة لذا لا نسمي بناء المدارس وتنقيط المصاحف بدعة ولا تصنيف الصحاح من كتب الحديث ولا اتّباع المذاهب الاربعة ولا يعني هذا أيضا أن البدعة لا وجود لها أو لا يجب التحذير منها والنهي عن غشيانها والصواب خلاف أسلوبي الطائفتين وهو أن يعمد إلي المحدثات ثم يميز ما كان منها بدعة ضلالة ثم يقام علي قدم وساق في تبطيلها وتعطيلها وهذا ما أردنا تحقيقه في كتابنا هذا ولذا سميناه "الدلالة علي بدعة ضلالة" ونرجو من الله تبارك وتعالي أن ينفع به الأمة و أن يجعله صدقة جارية في صحيفة كل من أعاننا وشجعنا وكرر طلباته لاتمام تصنيفه شفاهيا أو هاتفيا — آمين

ভূমিকা:

বিদয়াতের ভয়াবহতা:

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون}

আমি জিন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। [যারিয়াত/৫৬]

ইবাদত অর্থ হলো দাসত্ব করা বা আনুগত্য করা, নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ-অপছন্দকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দের সামনে মাথা নত করা এবং তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই হলো ইবাদত। বিপরীত দিকে আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান পরিত্যাগ করে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো কোনো বিধি-বিধানকে আল্লাহর বিধান হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার নামই হলো বিদয়াত। দ্বীনের ভিতরে বিদয়াত সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ ﷻ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন,

{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُون}

তোমরা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো বলো না এটা হালাল আর এটা হারাম। এতে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা হয়। আর

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে তারা কখনও সফল হয় না।

[সূরা নাহল-১১৬]

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}

আপনি বলুন তোমরা কি লক্ষ্য করেছো! আল্লাহ তোমাদের যে রিজিক দিয়েছেন তোমরা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো তার কিছু অংশকে বলছো হালাল আর কিছু অংশকে বলছো হারাম। আপনি বলুন, আল্লাহ কি তোমাদের এমন করার অনুমতি প্রদান করেছেন? নাকি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছো? যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে তারা কি ভাবে না কিয়ামতের দিন তাদের কি অবস্থা হবে!

[ইউনুস/৫৯,৬০]

এছাড়া অন্যান্য আয়াতে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা আরোপ করার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন, {انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا}

আপনি দেখুন তারা কিভাবে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যারোপ করে। মারাত্মক অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

[নিসা/৫০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ}

তার চেয়ে মহাপাপী আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে বা বলে, আমার উপর ওহী হয়েছে অথচ তার উপর কিছুই ওহী হয়নি। একইভাবে যে ব্যক্তি বলে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন আমি সেরকম কিছু নাজিল করতে পারি। আপনি যদি দেখতেন এই সকল পাপী লোকদের মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলে ফেরেশতারা বলবে তোমাদের প্রাণ বাহির করো। আজ তোমাদের অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা যে মিথ্যা বলতে এবং আল্লাহর আয়াতকে অগ্রাহ্য করতে তার বিনিময়ে।

[আনয়াম/৯৩]

এই আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় হলো, আল্লাহ ﷻ নিজের খেয়াল-খুশি মতো কোনো বিধি-বিধানকে আল্লাহর দ্বীন হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার অপরাধকে মিথ্যা নবুওত দাবি করা বা আল্লাহর আয়াতের মতো আয়াত নাজিল করতে পারার দাবী করার ন্যায়

মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন। এর মাধ্যমে বিদয়াতের ভয়াবহতা প্রমাণিত হয়। যেহেতু বিদয়াতী নিজের মনগড়া নিয়ম-কানুনকে আল্লাহর দ্বীন হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

রসুলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন,

وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদ ﷺ এর পন্থা এবং সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হলো নতুন সৃষ্ট বিষয়। আর প্রতিটি বিদয়াতই হলো পথভ্রষ্টতা। [সহীহ মুসলিম]

আবু দাউদ শরীফের একটি বর্ণনাতে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة

তোমরা নতুন সৃষ্ট বিষয়াবলী থেকে সতর্ক থাকো কেননা প্রতিটি নতুন সৃষ্ট বিষয় বিদয়াত, প্রতিটি বিদয়াত পথভ্রষ্টতা।

নাসাঈর বর্ণনাতে এই হাদিসটির শেষে অতিরিক্ত এসেছে, (وكل ضلالة في النار) এবং প্রতিটি পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে।

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ

যে কেউ আমার এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করে

যা এর মধ্যে নেই তবে তা পরিত্যক্ত।

[সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

তিনি আরও বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

যে কেউ এমন কোনো আমল করে যে ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই তা গ্রহণীয় নয়।

[সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

আবু দাউদ শরীফের একটি রেওয়ায়েতে এসেছে,

مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدّ

যে কেউ আমার নির্দেশের বাইরে কোনো কাজ করে তা পরিত্যক্ত।

এছাড়া সাধারণভাবে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار

আমার উপর মিথ্যারোপ করা অন্য কারও উপর মিথ্যারোপ করার মতো নয়। যে কেউ আমার উপর মিথ্যারোপ করে তার স্থান জাহান্নামে। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে,

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَام

যে কেউ কোনো বিদয়াতীকে সম্মান করে সে দ্বীন ধ্বংসে সাহায্য করে। [বাইহাক্বী শোয়াবুল ঈমান]

মুহাদ্দীসীনে কিরাম এই হাদিসটিকে দূর্বল বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন মাওজু। তবে হাদিসটির মূলভাব অন্যান্য হাদিসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু বিদয়াত বলতে বোঝায় শরিয়তের বিপরীত বিষয়কে শরিয়তের নামে চালু করা। সংক্ষেপে বলা যায় বিদয়াত হলো নকল শরিয়ত। বিদয়াত চলতে থাকলে নকল শরিয়তের ভিড়ে আসল শরিয়ত চিনে নেওয়া যে কষ্টকর বা ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব হয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এভাবে বিদয়াতের মাধ্যমে শরিয়ত ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। যে বিদয়াত সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে সে দ্বীন ধ্বংসের প্রয়াস চালায় আর যে তাকে সম্মান করে সে তাকে দ্বীন ধ্বংসের কাজে সহযোগিতা করেছে বলে গণ্য হয়।

মোল্লা আলী কারী ﵀ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা তিবী ﵀ থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন,

فإن كان حال الموقر كذا فما حال المبتدع

যদি বিদয়াতীকে সম্মান করার বিষয়টি এমন হয় তবে যে নিজেই বিদয়াতী তার অবস্থা কি? [মিরকাত]

আরেকটি হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

ولعن الله من آوي محدثا

যে কেউ এমন কাউকে আশ্রয় দেয় যে নতুন কিছু করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। [সহীহ মুসলিম]

এই হাদীসে মুহদিস (محدث) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ ‘যে নতুন কিছু করে।’ মূলত এই হাদীসে নতুন কিছু করা বলতে শরীয়তে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধে লিপ্ত হওয়া বোঝানো হয়েছে। তবে হাদীসের ব্যাখ্যাকাররা এখানে বিদয়াতীকেও এই হাদীসের অর্থের মধ্যে শামিল করেছেন। ইবনে আছীর আন-নিহায়াতে দুটি ব্যাখ্যাই উল্লেখ করেছেন।

ইবনে মাযা বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَبَى اللَّهُ أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

একজন বিদয়াতী যতক্ষণ না তওবা করবে ততক্ষণ তার কোনো আমল আল্লাহ কবুল করবেন না।

এই হাদীসটির সনদ দূর্বল তবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস এই হাদীসের সাথে সমার্থপূর্ণ। সেখানে ক্বদরিয়াদের সম্পর্কে ইবনে উমর ﵁ আল্লাহর কসম করে বলেন,

لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ

যদি তারা উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করে আল্লাহ তা কবুল করবেন

না যতক্ষণ না তারা তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপন করে। [সহীহ মুসলিম]

ইমাম নাব্বী ﵀ শারহে মুসলিমে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ এর এই কথার দুরকম অর্থ হতে পারে। হতে পারে তিনি এই সকল কাদরিয়াদের কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন একারণে তাদের কোনো আমল কবুল হবে না এমন মন্তব্য করেছেন। আবার এমনও হতে পারে যে তিনি আসলে তারা কাফির এমন উদ্দেশ্য করেন নি বরং দ্বীনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপরাধে তাদের আমল কবুল হবে না এমন মন্তব্য করেছেন।

শেষের অর্থটি গ্রহণ করলে তার কথার মধ্যে বিদয়াতীর আমল কবুল না হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোট কথা, যে আমলে বিদয়াত সংঘটিত হচ্ছে সেটা কবুল না হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে কেউ এমন কোনো আমল করে যে ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই তা পরিত্যক্ত। উদাহরণস্বরুপ যদি কেউ ভর দুপুরে রোদে দাড়িয়ে থাকলে সওয়াব হয় এমন মনে করে সারাটা দুপুর রোদে দাড়িয়ে থাকে তবে তার এই কষ্ট-ক্লেশ আল্লাহর দরবারে ভাল আমল হিসেবে গণ্য নয়। যেহেতু এ বিষয়ে আল্লাহ বা তার রাসুল কোনো নির্দেশনা প্রদান করেন

নি। এই ব্যক্তির রোদে দাড়িয়ে থাকাটা যে কোনো আমল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় সে ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। উপরন্তু সে বিদয়াতী হিসেব গণ্য হবে এবং তার পাপ হবে। এমনকি তার অন্যান্য আমল কবুল হবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। যেমনটি আমরা উপরে বর্ণনা করেছি।

ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,

إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا

যে কেউ আমার পর আমার কোনো মৃত সুন্নাতকে জীবিত করবে তার পর যত লোক ঐ সুন্নাতের উপর আমল করবে সে তাদের সমান সওয়াব প্রাপ্ত হবে যদিও তাদের সওয়াবে সামান্যও কমতি হবে না। আর যে কেউ এমন কোনো বিদয়াত সৃষ্টি করে যা পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য এবং আল্লাহ ও রাসুলের নিকট অপছন্দনীয় তার পর যত লোক ঐ বিষয়ের উপর আমল করবে তাদের সবার সমান পাপ তার জন্য লেখা হবে। যদিও অন্যদের পাপে সামান্যও কমতি হবে না।

হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী বলেন, (حسن صحيح) ‘‘হাদিসটি হাসান সহীহ’’।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের একটি বর্ণনাতে এসেছে, রসুলুল্লাহ

ﷺ যখন তার উম্মতকে হাওজে কাওছারের পানি পান করাবেন তখন একদল লোক তার নিকট আগমণ করবেন। তিনি তাদের চিনতে পারবেন এবং তাদের পানি খাওয়ানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। হঠাৎ একটি পর্দা এসে তাদের আড়াল করে দেবে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলবেন, এরা তো আমার লোক। তাকে বলা হবে, (فإنك لا تدري ما احدثوا بعدك) আপনি তো জানেন না আপনার পরে এরা নতুন কি করেছিল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, (فإنك لا تدري ما بدلوا بعدك) "আপনি তো জানেন না আপনার পর এরা কি পরিবর্তন করেছিল।"। এটা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ বলবেন, (سحقا سحقا لمن غير بعدي) "আমার পর যারা পরিবর্তন করেছিলে তারা দূর হও"।

ইমাম নাব্বী ﵀ শারহে মুসলিমে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আলেমদের বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, এখানে মুনাফিক ও মুরতাদদের কথা বলা হচ্ছে যারা রসুলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর পর দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করেছিল। কেউ কেউ বলেছেন, এরা হলো বিদয়াতীরা যারা ইসলামের উপর টিকে থাকার দাবী করতো কিন্তু ইসলামী বিধি-বিধানে পরিবর্তন সাধন করেছিল। ইবনে বাত্তাল ﵀ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, সকল প্রকারের বিদয়াতী ও অপরাধীরা এই হাদীসের আওতাভুক্ত।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যে কেউ রসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত পরিত্যাগ করে বিদয়াতের অনুসরণ করবে কিয়ামতের দিন তাকে হাওজে কাউছারের পানি পান করতে দেওয়া হবে না। আল্লাহর নিকট আমরা এ ধরনের পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই।

বিদয়াতের ভয়াবহতা সম্পর্কে এধরণের অনেক বর্ণনা রয়েছে যা এখানে সবিস্তারে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

বিদয়াত সম্পর্কে উদাসীনতা:

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদিস সমূহ স্পষ্টভাবে বিদয়াতের ভয়াবহতা প্রমাণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এধরনের সুস্পষ্ট সতর্কবার্তা ও ভয়াবহতা বর্ণিত থাকার পরও দেখা যায় বেশিরভাগ লোক এমনকি যারা স্বনামধন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত তাদের একটি বিরাট অংশ বিদয়াত সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা নিজেরা বিদয়াত থেকে বেঁচে থাকা এবং বিদয়াত সম্পর্কে জানার চেষ্টা তো করেই না উপরন্তু কেউ বিদয়াত সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলে তাকে বিভিন্ন জটিল-কুটিল প্রশ্ন করে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বিদয়াতের কথা শুনলেই তারা বলে ওঠে, তাহলে তো, মাইকে আজান দেওয়া, মোবাইলে কথা বলা, বাস-ট্রেনে ভ্রমণ করা সবই বিদয়াত! তাদের ভাব দেখে মনে হয় বিদয়াত

বলে যে আসলে কিছু আছে তা তারা স্বীকার করে না। যদি তারা এটা স্বীকারই করবে তবে বিদয়াতের সঠিক সংজ্ঞা কি এবং বর্তমান যুগে প্রচলিত বিদয়াতগুলো কি সে বিষয়ে আলোচনা করে না কেনো? এটা ঠিক যে বর্তমানে কিছু লোক বিদয়াতকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এমন অনেক বিষয়কে তারা বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করছে যেগুলো শরীয়তে বৈধ বা মুস্তাহাব। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ সকল লোকদের সমালোচনা করা এবং তাদের ভুল-ক্রটিগুলো উপস্থাপন করলেই কি আলেমদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? বিদয়াতের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা এবং সাধারন মুসলিমদের তার ভয়াবহতা হতে সতর্ক করা কি আলেমদের দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়? এ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন আলেম খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এই উদাসীনতার কারণে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে বিদয়াতী কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বিদয়াতী ফিরকা শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান সম্পর্কে আজগুবী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করতে শুরু করেছে। একদিকে রয়েছে পীর-ফকিরদের মারেফতী ব্যাখ্যা অন্য দিকে বিজ্ঞানমনা আধুনা চিন্তাবিদদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তার উপর আছে সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর খেয়াল-খুশি মতো ব্যাখ্যা। কেউ বলছে, পীর ধরা ফরজ, যার পীর নেই তার পীর শয়তান ইত্যাদি। সেই সাথে রয়েছে পীর সাহেবদের প্রতি মুরিদানদের অতিভক্তির ক্ষতিকর প্রভাব। বিদয়াতী পীর-

ফকীরদের কথা তো বাদ, যারা হক্কানী পীর হিসেবে পরিচিত তাদের পুস্তাকাদিতেও শিরক-কুফর সহ নানা রকম বিভ্রান্ত চিন্তা-দর্শনের ছড়া-ছড়ি। পীর সাহেব আদেশ করলে এমনকি জায়-নামাজ মদ দিয়ে ভিজিয়ে ফেলা, জেনা করতে বললে, জেনা করা, কবিরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো অপরাধে পীর সাহেবের উপর আপত্তি উত্থাপন না করা এবং কবিরা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার পরও কেবলমাত্র যারা মুফতি ও ফকীহ স্তরের তারা ছাড়া অন্য কেউ পীর সাহেবকে সংশোধন করার প্রচেষ্টা না করা ইত্যাদি।

আহলে হাদীসরা বলছে, আল্লাহর দেওয়া মুসলিম পরিচয় পরিবর্তন করে হানাফী, শাফেঈ, হাম্বালী ইত্যাদি নামে নিজেকে পরিচয় দেওয়া হারাম। এদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কি সুন্নী বা আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াত নামে পরিচয় দেওয়াও নিষিদ্ধ মনে করে। সাধারন মুসলিমদের জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট মাজহাব মেনে চলা হারাম মনে করে। বিপরীত দিকে মাজহাবী ওলামায়ে কিরামের কেউ কেউ তাকলীদে শাখসী (التقليد الشخصي) তথা সারাটা জীবন নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের আনুগত্য করে যাওয়া ফরজ মনে করে। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি কুরআন হাদীসের উপর ব্যাপক গবেষণা করে বুঝতে পারে তার মাজহাবের মতটি সঠিক নয় তার ক্ষেত্রেও মাজহাবের মত পরিত্যাগ করা এক শ্রেণীর আলেম অনুচিত মনে করেন। তাদের

মধ্যে নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিরাও অনেক সময় বলে ফেলেন, "এ মাসয়ালায় যদিও শাফেঈ মাজহাবের দলিল-প্রমাণ অধিক শক্ত তবু যেহেতু আমরা হানাফী মাজহাবের মুকাল্লিদ তাই আমাদের হানাফী মাজহাবের ফতোয়া মেনে চলতে হবে।"

বিজ্ঞানমনা আধুনা ইসলামী চিন্তাবিদরা বলছে, কোনো একটি কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে কিনা সেটা বুঝতে হলে বিজ্ঞানের সাথে তা মিলিয়ে দেখতে হবে। যদি বিজ্ঞানের সাথে কিতাবটির হুবহু মিল পাওয়া যায় তাহলে প্রমাণিত হবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে নতুবা নয়। এভাবে আল্লাহর নাজিল করা কিতাব সত্য কি মিথ্যা সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব তারা মানুষের তৈরী বিজ্ঞানের উপর ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহর কাছে এ ধরনের দূর্মতি থেকে আশ্রয় চাই। এই মতাদর্শের লোকেরা পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে প্রমাণ করার জন্য এর প্রতিটি আয়াতকে টেনে-হেঁচড়ে বিজ্ঞানের সাথে মিলানোর চেষ্টা করছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ চাঁদকে নুর বলেছেন। তারা বলে 'নুর' অর্থ ধার করা আলো অর্থাৎ পবিত্র কুরআন দেড় হাজার বছর আগেই বলে দিয়েছে চাঁদের আলো ধার করা আর বিজ্ঞান এখন সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। এই ব্যাখ্যা শুনে শ্রোতারা নিজেদের অজান্তেই বলে ওঠেন 'সুবহানাল্লাহ'। কিন্তু নুর মানে ধার করা আলো এটা যে বক্তা কোথা থেকে ধার করলো সে প্রশ্ন কেউ করে না। আরবী

অভিধানে কি নুর অর্থ ‘ধার করা আলো’ এটা লেখা আছে? কুরআন-হাদিসের কোথাও কি বলা আছে নুর অর্থ ধার করা আলো? তাছাড়া আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনকে নুর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, (وأنزلنا إليكم نورا مبينا) “তোমাদের নিকট আমি নাজিল করেছি সুস্পষ্ট নুর” [নিসা/১২৪] অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন, (الله نور السموات والأرض) “আল্লাহ হলেন আকাশ ও পৃথিবীর নুর।” [সূরা নূর/৩৫] যদি নূর অর্থ ধার করা আলো হয় তবে প্রশ্ন হলো, আল্লাহর কি ধার করা আলো এবং তার কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আলোও কি ধার করা! আজগুবি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের এটাই হলো সমস্যা, একটু মিলিয়ে দেখতে গেলেই গরমিল হয়ে যায়। বিজ্ঞানের আলোকে পবিত্র কুরআনকে সহীহ্ শুদ্ধ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আরও অনেক উদ্ভট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাজির করা হয়। সাজদা করলে মাটি থেকে কি পরিমান ইলেকট্রন, প্রটন বা নিউটন মাথার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় তা কি পরিমান ভূমিকা রাখে, নামাযের সময় নাভীর নিচে হাত রাখলে তা কীভাবে যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে, সওম পালন করলে শরীর স্বাস্থ্যের কি উন্নতি ঘটে সেসব বিষয়ে শুরু হয় পান্ডিত্বপূর্ণ আলোচনা।

“সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই” এই মতবাদে বিশ্বাসী নেতা-নেত্রীবর্গ “তোমার দ্বীন তোমার আমার দ্বীন

আমার” এই প্রকৃতির কিছু আয়াত ও হাদিস পেশ করে ঘোষণা করে সকল ধর্মই উত্তম কথা বলে। কোনো ধর্মকে বাতিল ও ভ্রান্ত বলা যাবে না, নিজের ধর্মকেই একমাত্র সঠিক ও অভ্রান্ত বলে দাবী করা যাবে না ইত্যাদি।

ইসলাম সম্পর্কে এই প্রকৃতির ভুল ব্যাখ্যা সাধারন মুসলিমদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল যা বলেন নি তা তাদের নামে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে যা নেই তা দ্বীনের নামে প্রচার করা হচ্ছে। এই সকল সুস্পষ্ট বিদয়াতের বিপরীতে শক্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই। সবাই এসব ব্যাপারে উদাসীন।

বিদয়াত সম্পর্কে বাড়াবাড়ি:

উপরোক্ত দলের বিপরীতে এমন একদল লোক রয়েছে যারা বিদয়াতের ব্যাপারে মাত্রাতিক্ত কড়াকড়ি করে থাকে। তারা এমনকি বৈধ বা উত্তম কার্যকলাপকেও অনেক সময় বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে থাকে। সুর করে দরুদ শরীফ পাঠ করা, একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকির করা, পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের শেষে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে সেসব কাজে লিপ্ত সাধারন মুসলিমদের কঠোরভাবে তিরষ্কার করে থাকে। এখানেই শেষ নয়। এরা

পূর্ববর্তী নেককার ওলামায়ে কিরামকে বিভিন্ন ভাষায় বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। যখনই তারা শোনে পূর্ববর্তী কোনো একজন নেককার ব্যক্তি সারারাত সলাত আদায় করতো বা নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত সারা বছর সওম পালন করতো কালবিলম্ব না করে তারা উক্ত ব্যক্তির নিন্দা মন্দ শুরু করে। তারা বলে, যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ এভাবে ইবাদত করেন নি তাই এটা করা বিদয়াত। যারা একইরাত্রে একবার বা কয়েকবার পবিত্র কুরআন খতম দিয়েছেন বলে বর্ণিত আছে তাদের ব্যাপারেও এই সকল লোকেরা একই মন্তব্য করে। এদের প্রচার প্রসারে বিভ্রান্ত হয়ে সাধারন মুসলিমরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। উপরে বর্ণিত দলটির তুলনায় এই দলটির কার্যকলাপ অধিক ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু তারা মানুষকে ভাল কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টায় প্রাণান্তকর সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। এই সকল অজ্ঞ লোকেরা বিদয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার তুলনায় নিরব থাকলেই অধিক কল্যাণ হতো। ইমাম শাতেবী আল-ই'তিসামের ভূমিকাতে ইমাম মালিক হতে একটি শিক্ষনীয় উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইবেন ফররুখ নামে একজন ব্যক্তি তার নিজ এলাকায় বিদয়াতীদের উৎপাত লক্ষ্য করে তাদের বিরুদ্ধে একটি বই লেখেন। বইটি প্রকাশের পূর্বে তিনি ইমাম মালিকের নিকট এ বিষয়ে অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলে ইমাম মালিক তাকে লিখে পাঠান,

إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك ، لا يرد عليهم إلا من كان ضابطاً عارفاً بما يقول لهم لا يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا لا بأس به ، وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطىء فيمضوا على خطئه أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تمادياً على ذلك

তুমি যদি এমন কিছু করতে চাও তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে তুমি পথ হারা হয়ে ধ্বংস হবে। বিদয়াতীদের বিপরীতে কেবল এমন ব্যক্তির দাড়ানো উচিৎ যে নিজে কি বলছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ (অর্থাৎ যা বলবে জেনে-শুনে বলবে। অজ্ঞতার কারণে বা অতিরিক্ত আবেগী হয়ে ভুল কিছু বলে বসবে না। যেটা বিদয়াত নয় সেটাকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবে না) এবং এমনভাবে তাদের প্রতিবাদ করবে যাতে তারা লা জওয়াব হয়ে যায় (তার বিরুদ্ধে বিদয়াতীরা যেনো কোনোরুপ যুক্তি-তর্কের মাধ্যেম বিজয় অর্জন করতে না পারে।) এভাবে করতে পারলে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যার এমন যোগ্যতা নেই তার ব্যাপারে আমার ভয় হয়, সে হয়তো তাদের প্রতিবাদ করতে যেয়ে নিজেই ভুল কথা বলবে, (যেটা বিদয়াত নয় সেটাকে বিদয়াত বলে বসবে) আর তারা তার কথার উপর ভিত্তি করে সেই ভুলকেই ঠিক হিসেবে গ্রহণ করে তার উপর টিকে থাকবে অথবা (সে হয়তো প্রকৃত বিদয়াতকেই বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করছে কিন্তু যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপণে অদক্ষ হওয়ার কারণে) বিদয়াতীরা তার উপর

বিজয়ী হয়ে যাবে ফলে তাদের স্পর্ধা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে আমরা ইমাম মালিকের কথার হুবহু প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। একদল লোক বিদয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নামে সকল প্রকারের ভাল জিনিসের বিপরীতে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। প্রকৃতই যারা বিদয়াতী এরা তাদের পরিত্যাগ করে সাধারন মুসলিমদের যিকির-আযকার, তসবীহ্ তাহলিল ও দোয়া-দরুদের মধ্যে বিদয়াতের গন্ধ শুকে বেড়াচ্ছে। যে ব্যক্তি নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না সেই কিনা মুসলমানদের হানাফী, শাফেই ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচয় দিতে নিষেধ করছে। যে ব্যক্তি পবিত্র বাইবেল পবিত্র গীতা ইত্যাদি নিষিদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করে বিধর্মীদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীকে সম্মান প্রদর্শন করছে সেই কিনা আল্লাহর দেওয়া পবিত্র বিধান জিহাদকে পবিত্র যুদ্ধ বলতে অস্বীকার করছে। যেহেতু কুরআন হাদীসের কোথাও জিহাদকে পবিত্র যুদ্ধ তথা হারবুম মুকাদ্দাসা (حرب مقدسة) বলা হয় নি। প্রশ্ন হলো, তবে কি পবিত্র কুরআনে পবিত্র বাইবেল কথাটি লেখা আছে? অথবা পবিত্র গীতা! আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। একজন মুসলিম যখন রসুলে আকদাস ﷺ এর ভালবাসায় আবেগপ্রবণ হয়ে মদীনা মুনাওয়ারাতে রওজা মোবারোক জিয়ারতে রওয়ানা হয় এই নেক আমল থেকে উক্ত ব্যক্তিকে ফিরানোর জন্য কিছু লোক ফতোয়াবাজী শুরু করে। রসুলে আকদাস ﷺ এর কবর জিয়ারত

করাকে বিদয়াত এমনকি শিরক-কুফর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সৌদি আরবের রাজা-মহারাজারা যখন আমেরিকা জিয়ারতে রওয়ানা হয় এবং সেখানে গমণ করে বেগানা নারীদের সাথে নাচা-গাওয়া করে, ক্রুশ পরিধান করে, মদ পান করে তখন এসকল ফতোয়াবাজদের তোয়াজ করা ছাড়া ভিন্ন কোনো কাজ থাকে না। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের বহিঃষ্কার করো সে নির্দেশ অমান্য করে যারা আমেরিকান সৈন্যদের আরব উপদ্বীপে স্থান দিয়েছে, যারা আফগানস্থানের ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে নিঃশেষ করতে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের সহযোগীতা করেছে সেই সব খান্নাস শয়তানদের আমীরুল মুমিনিন ও ওলীউল আমর হিসেবে আখ্যায়িত করতে এই সকল ফতোয়াবাজদের মুখে বাধে না। এরচেয়েও বড় বিদয়াতটি হলো, সৌদি আরবের যুবকদের বলা হচ্ছে ওলিউল আমর তথা আমেরিকার ধ্বজাধারী সৌদি রাজাধিরাজের অনুমতি ছাড়া নাকি আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না। এভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশের নাস্তিক-মুরতাদ ও তাদের মদদপুষ্ট রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুমতি ছাড়া কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা নাকি ইসলামের দৃষ্টিতে চরম অন্যায়। অনেকটা আব্দুল্লাহ ইবেন উবায়ের অনুমতি নিয়ে কুরাইশ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার মতো। নীল আকাশের নীচে

এরচেয়ে বেশি বড় বিদয়াত খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সেটা ব্যাপক গবেষণার বিষয়। এই বিদয়াতীরাই আবার আফগান মুজাহিদদের কারো হতে তাবীজ ঝুলতে দেখলে বা তার মুখে ইয়া রাসুলুল্লাহ শুনলে দাত-মুখ খিচিয়ে তাদের মুশরিক মুরতাদ বা কমপক্ষে ঘৃণিত বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করে ভীষণ তিরষ্কার করে থাকে। এরা বিদয়াতের বিরুদ্ধে গলাবাজী করে অথচ নিজেরাই সর্বাপেক্ষা বড় বিদয়াতী। এরা নিজেরা বড় বড় বিদয়াতে লিপ্ত রয়েছে অথচ সাধারন মানুষ দোয়া-দরুদ বা যিকির আযকার করলে তাদের বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করে গাল-মন্দ করে। এদের আজগুবি প্রচার প্রচারনায় অতিষ্ঠ হয়ে কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করে বলে ওঠে, দোয়া-মোনাজাত, যিকির-আযকার, এসব যদি বিদয়াত হয় তবে তো বাস-ট্রাক, মোবাইল-মিসাইল সবাই বিদয়াত। তুমিও বিদয়াত তোমার বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ সবাই বিদয়াত। কিন্তু এভাবে বিরক্তি প্রকাশ করলেই এই জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না বরং শরীয়তের নিক্তিতে এসব উক্তির ক্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরতে হবে। সে উদ্দেশেই আমাদের এই সংক্ষিপ্ত প্রয়াস।

বিদয়াতের সংজ্ঞা ও বিধান

উপরে বর্ণিত জটিলতা ও অস্পষ্টতা দূর করার জন্য সর্বাগ্রে যে বিষয়টি জরুরী তা হলো বিদয়াত শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয় করা।

এ বিষয়টির সমাধান করা গেলে সকল বিতর্ক নিরসন হবে ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই আমরা বিদয়াত শব্দটির প্রচলিত অর্থ নিয়ে কথা বলবো। আমরা দেখবো, বর্তমানে যারা বিদয়াত সম্পর্কে আলোচনা করেন তারা বিদয়াত বলতে কি বোঝেন। এরপর বিদয়াতের প্রচলিত অর্থের মধ্যে যেসব অসঙ্গতি আছে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো। পরিশেষে বিদয়াত শব্দটির সঠিক অর্থ নির্ণয় করার মাধ্যমে আমাদের এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ হবে। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা। বর্তমান সময়ে যারা বিদয়াত নিয়ে আলোচনা বা লেখালেখি করেন বিদয়াতের সংজ্ঞায় তারা বলেন,

বিদয়াত হলো দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো বিষয় নতুন সৃষ্টি করা যা রসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবায়ে কিরাম করেন নি বা করতে বলেন নি।

শায়েখ বিন বায বলেন,

فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولا أصحابه، ولم يدل عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد إليه، بل أحدثه الناس وأدخلوه في دين الله فهو بدعة

যা কিছু রসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবায়ে কিরাম করেন নি। রসুলুল্লাহ ﷺ সে ব্যাপারে নির্দেশও দেন নি বরং মানুষ সেটা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করেছে তাই বিদয়াত। [ফাতওয়া নুর আলাদ্ দারব]

শায়েখ সালিহ আল মুনজিদ রসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী “যে কেউ এমন কোনো আমল করে যে বিষয়ে আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত” এটা উল্লেখ করে বলেন,

وبهذا يعلم أن التوجه إلى الله تعالى والتوسل إليه بما لم يرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا قولاً ولا فعلاً ، وبما لم يفعله أصحابه الكرام الذين كانوا أحرص الناس على الخير وأسبقهم إليه ؛ بدعة منكرة

এর মাধ্যমে বোঝা যায় রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত নয় এবং সাহাবায়ে কিরাম যে কাজ করেন নি অথচ ভাল কাজে তারাই ছিলেন অগ্রগামী ও সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহী ঐ কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা নিকৃষ্ট বিদয়াত। [ফাতাওয়ে ইসলাম সুয়াল ও জাওয়াব]

অন্যান্য সালাফী ওলামায়ে কিরাম অনুরুপ ফতোয়া প্রদান করেছেন। সাধারন মানুষের মধ্যে বিদয়াতের এই সংজ্ঞাটির ব্যাপক প্রচার-প্রসার রয়েছে। কাউকে কোনো কাজ করতে দেখলেই মানুষ এখন প্রশ্ন করে- এটা কি রসুলের যুগে ছিল? সাহাবায়ে কিরাম কি এটা করেছেন? “রসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম যা করেন নি তা করা বিদয়াত” এই মূলনীতির উপর নির্ভর করে এমন অনেক কাজকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে নিন্দা করা হয় যা নিজ কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না।

উদাহরণস্বরুপ একদল লোক বলছে, পবিত্র কুরআনে চুম্বন করা বিদয়াত। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবায়ে কিরাম থেকে এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ‘‘পবিত্র কুরআন কিভাবে তাফসীর করা উচিৎ’’ নামক একটি কিতাবে শায়েখ আলবানী একথা বলেছেন। ইমাম শাতেবী আল’ইতিসামে জুময়ার খুতবায় খোলাফায়ে রাশেদার জন্য দোয়া প্রার্থনা করা বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু সাহাবায়ে কিরামের যুগে এটার প্রচলন ছিল না। এরই ধারাবিহকতায় কেউ কেউ কুরআন শারীফ বলা বিদয়াত বলছেন যেহেতু কুরআন-হাদীসের কোথাও কুরআন শারীফ বলা হয়নি বরং কুরআন কারীম বা কুরআন মাজিদ বলা হয়েছে। একইভাবে ঈদুল আজহা বা ইদুল ফিতরে ঈদ মোবারোক বলাও বিদয়াত। কোথাও আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশা-পাশি লেখা বিদয়াত শুধু আল্লাহ লেখাও বিদয়াত। এক কথায় দ্বীনী কোনো কাজ করলেই সেটা কোনো না কোনো দিক থেকে বিদয়াত হয়ে যাবে অতএব বিদয়াত থেকে বাঁচার একটা সহজ উপায় হলো যতদূর সম্ভব দ্বীনী কাজ হতে বিরত থাকা এবং গান-বাজনা ও নাচা-নাচিতে মনোনিবেশ করা।

এই ধরনের গোলোযোগই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে উপরোক্ত সংজ্ঞাটিতে কোনো গোলমাল রয়েছে। এখন আমরা সেই গোলমালটিই খুঁজে বের করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই আমরা সংজ্ঞাটির মুলভাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো।

সংজ্ঞাটিতে বলা হচ্ছে,

"আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যা রাসুলুল্লাহ ﷺ বা তার সাহাবায়ে কিরাম করেন নি।"

চিন্তা করলে দেখা যাবে সংজ্ঞাটির দুটি স্থানে অস্পষ্টতা রয়েছে। এখনে বলা হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু অনুপ্রবেশ করানো বিদয়াত। নতুন কিছু বলতে বোঝানো হচ্ছে আল্লাহর রসুল বা তার সাহাবারা করেন নি এমন কিছু। 'দ্বীনের মধ্যে' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে দ্বীনের বাইরে নতুন কিছু করাতে কোনো দোষ নেই। এখন এই সংজ্ঞাটির উপর বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। নিচের আলোচনাতে আমরা সেসব প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু অনুপ্রবেশ করানো বলতে কি বোঝায়।

এ সম্পর্কে আমাদের প্রথম প্রশ্ন, দ্বীন বলতে আমরা কি বুঝবো এবং দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু অনুপ্রবেশ করানো বলতে কি বোঝায়। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা অত্যাধিক গুরুত্ববহ যেহেতু সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু অনুপ্রবেশ করানো বিদয়াত। এর অর্থ দ্বীনের বাইরে নতুন কিছু অনুপ্রবেশ করানো হলো সেটা বিদয়াত হবে না। এ কথাটি অবশ্য যথার্থ যেহেতু রসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই বলেছেন, (من احدث

(في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) “যে কেউ আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে তবে তা পরিত্যক্ত হবে। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]। সুতরাং দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা হলে তা বিদয়াত এ কথা সঠিক। দ্বীনের বাইরে নতুন কিছু সৃষ্টি করা বিদয়াত নয় একথাও সঠিক। কিন্তু দ্বীন কি জিনিস এবং দ্বীনের ভিতর ও বাহির বলতে কি বোঝায় সেটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

অনেকে অবশ্য ভাববেন এটা কোনো জটিল প্রশ্ন হলো? তারা খুব সহজভাবে বলেন,

“দ্বীনের মধ্যে বলতে বোঝায় সওয়াবের উদ্দেশ্যে কিছু করা যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর মোনাজাত করা, ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন করা ইত্যাদি। আর দ্বীনের বাইরে বলতে বোঝায় সওয়াবের কাজ নয় এমন নতুন জিনিস সৃষ্টি করা যেমন, বাস, ট্রাক, ট্রেন, প্লেন ইত্যাদি। সওয়াবের উদ্দেশ্য নতুন কিছু করাই আসলে বিদয়াত। সওয়াবের কাজ নয় এমন নতুন জিনিসে সমস্যা নেই।”

এই উত্তরটি যতটা স্পষ্ট মনে হচ্ছে আসল ব্যাপার কিন্তু মোটেও তেমন নয়। এই কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় দ্বীনের সম্পর্ক কেবল সওয়াবের সাথে। যাতে সওয়াব নেই তার সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই। মদ হারাম হওয়া, দাড়িয়ে পানি পান করা

মাকরুহ হওয়া, বাস-ট্রাক, ট্রেন ও প্লেনে ভ্রমণ করা বৈধ হওয়া এগুলো কি দ্বীনী বিধি-বিধান নয়? আল্লাহ ﷻ কি রাসুল প্রেরণ করেছেন কেবল সওয়াবের কাজ কোনটি তা বলে দেওয়ার জন্যে নাকি, পাপ-পূণ্য, হালাল-হারাম, মাকরুহ্-মুবাহ ইত্যাদি যাবতীয় বিধি বিধান বর্ণনা করার জন্য? আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ}

আমি তো রাসুল প্রেরণ করি কেবলমাত্র সুসংবাদ প্রদান করা এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য। [আনয়াম/৪৮]

সুসংবাদ প্রদান করা অর্থ কোনটি সওয়াবের কাজ অর্থাৎ কি করলে জান্নাত পাওয়া যাবে সেটা বর্ণনা করা আর ভীতি প্রদর্শন করা অর্থ কোনটি পাপের কাজ তথা কি করলে জাহান্নামে যেতে হবে তা বর্ণনা করা। সুতরাং সওয়াবের কাজের সাথে সাথে পাপের কাজ কোনটি সেটি বর্ণনা করাও রাসুলের দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ সেটিও দ্বীনের অংশ।

অন্য আয়াতে এসেছে,

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

তিনি (রাসুল) তোমাদের উপর উত্তম জিনিসগুলোকে হালাল করেন আর নিকৃষ্ট জিনিস গুলোকে হারাম করেন। [আ'রাফ/১৫৭]

হালাল বলা হয় ঐ জিনিসকে যা করলে কোনো সওয়াব নেই না করলেও পাপ নেই। মোবাহ বলতেও একই বিষয়কে বোঝায়। যেমন, রুটি খাওয়া বা ভাত খাওয়া, বাস-ট্রেনে বা প্লেনে কোথাও ভ্রমণ করা করা ইত্যাদি। উপরোক্ত আয়াতে দেখা যাচ্ছে হারামের পাশাপাশি হালাল বা মুবাহ তথা বৈধ জিনিসগুলো কি সেটা বর্ণনা করাও রাসুলে আকদাস ﷺ এর দ্বীনী দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং বাস-ট্রাক, প্লেন-ট্রেন ইত্যাদি বিষয় দ্বীনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন মন্তব্য যারা করে তারা দ্বীন বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে জানে না। তাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন হলো যদি এসব বিষয় দ্বীনের বিধি-বিধানের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নাই হবে তবে এগুলো যে বৈধ সেটা কিভাবে জানা গেলো? দ্বীনের বিধান ছাড়াই কেবল মনগড়া সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই কি তারা এগুলোকে হালাল বা বৈধ বলে থাকে? অথচ আল্লাহ ﷻ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,

{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}

তোমরা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো বলো না এটা হালাল আর এটা হারাম। এতে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা হয়। আর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে তারা কখনও সফল হয় না। [নাহল-১১৬]

অর্থাৎ নিজের খেয়াল খুশি মতো কোনো বিষয়কে যেমন হারাম বলা যায় না একইভাবে সেটাকে হালাল বা বৈধও বলা যায় না। কোনো বিষয়কে কেবল তখন হালাল বলা যাবে যখন দ্বীনের মূলনীতির আলোকে তা হালাল প্রমাণিত হবে। বাস-ট্রাক ইত্যাদি যানবাহন ব্যবহার করা বা কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করা সাধারনভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ এর কর্মপন্থা ছিল প্রযুক্তি ব্যবহার করা। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ও দৈনন্দিন জীবনে তার যুগে বিদ্যমান সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে নতুন নতুন কৌশল নির্ধারন করেছেন। কাঠের ট্যাংক ব্যবহার করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে সালমান ফারসী رضي الله عنه এর পরামর্শে গর্ত খননের মতো নতুন কৌশল অবলম্বন করে কুরাইশদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। যারা মানুষের পা দেখে বংশ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারতো তাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। মানুষকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে বলেছেন তবে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখার অনুমতি দেন নি। বরং নিজেদের মেধা ও পরিশ্রমকে যথাসাধ্য ব্যাবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (اعقلها وتوكل) ‘‘উট বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করো’’ [তিরমিযি] তার ওফাতের পর মুসলিমরা জাহাজ তৈরী করে সমুদ্র পার হয়ে কাফিরদের উপর আক্রমণ করবে স্বপ্নযোগে এটা জানতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং

তাদের প্রশংসা করেছেন। রসুলে আকরাম ﷺ এর এই কর্ম পন্থার উপর ভিত্তি করে যে মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হয় তার উপর নির্ভর করেই আমরা বর্তমানে নতুন সৃষ্ট যানবাহন ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা বৈধ বলছি। নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নয়। এ বিষয়ে যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কর্মপন্থা ভিন্ন হতো তবে আমরাও ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হতাম। যদি তিনি নতুন প্রযুক্তিকে বর্জন করতে আদেশ করতেন তবে আমাদের তা বর্জন করতে হতো। এখনও যদি প্রযুক্তির কোনো কিছু রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশের বিপরীত হয় তবে তা বর্জন করতে হবে। উদহারণস্বরুপ বিবাহ ছাড়াই যারা সন্তান ধারন করতে চায় বা স্বামীর অক্ষমতার কারণে সন্তান হচ্ছে না এমন একটি দম্পতি যদি যে কোনো মুল্যে সন্তান গ্রহণ করতে চায় তবে বর্তমানে এর একটি আধুনিক প্রযুক্তি বের হয়েছে। চিকিৎসার মাধ্যমে ভিনপুরুষের বীর্য গ্রহণ করে কোনো নারী যৌন মিলন ছাড়াই সন্তান ধারন করতে পারে। বর্তমান সময়ের ওলামায়ে কিরাম একমত হয়ে এ বিষয়টিকে নিষিদ্ধ বলেছেন। প্রশ্ন হলো এ বিষয়টিকে তারা কেনো নিষিদ্ধ বলছেন? এটা কি তাদের মনগড়া সিদ্ধান্ত নাকি শরীয়তে এর কোনো মূলনীতি রয়েছে। সত্য কথা হলো, শরীয়তের মূলনীতির আলোকেই এটা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে। কারো মনগড়া সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নয়। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ যৌন মিলন ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়কে জিনা

হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হাদিসে চোখ, হাত ও পায়ের জিনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যা কিছুর ফলে মানুষ জেনার দিকে আকৃষ্ট হয় তথা যা কিছু মানুষকে জিনার দিকে টেনে নিয়ে যায় সেগুলোকে ইসলাম জিনা হিসেবে নামকরণ করেছে এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে একইভাবে জিনার ফলাফলে যা কিছু সৃষ্টি হয় তথা বীর্যপাত ও সন্তান গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ও ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে।

এছাড়া রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

যে কেউ আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেনো অন্যের সন্তানের উপর পানি (বীর্য) নিক্ষেপ না করে।

ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন এবং হাসান বলেছেন। তিনি আরো বলেন,

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ

আলেমরা এই হাদীসের উপর নির্ভর করে বলেছেন যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো দাসী ক্রয় করে যার পেটে অন্যের সন্তান রয়েছে ঐ সন্তান প্রসব করার আগ পর্যন্ত ঐ দাসীর সাথে সহবাস করা তার জন্য বৈধ হবে না।

লক্ষণীয় বিষয় হলো যে মহিলার সাথে সহবাস করা বৈধ তার গর্ভে অন্যের সন্তান থাকার কারণে সেই সন্তানের সম্মান রক্ষার্থে ঐ মহিলার গর্ভে নিজের বীর্য নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে অন্যের স্ত্রীর গর্ভে কারো বীর্য নিক্ষেপ করা কিভাবে বৈধ হতে পারে!

এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট দলিলটি হলো রসুলুল্লাহ ﷺ এর কথা,

الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

কোনো নারী যার স্ত্রী সন্তান হবে কেবল তার আর যে চরিত্রহীনা হবে তার জন্য রয়েছে পাথর। [বুখারী]

মুলত এই হাদীসের উদ্দেশ্য হলো বিবাহের মাধ্যমে ছাড়া জেনার মাধ্যমে অর্জিত সন্তান পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হবে না। অর্থাৎ কোনো নারী যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কেবল তার সন্তান গর্ভে ধারন করা তার জন্য বৈধ হবে। এছাড়া অন্য কারো সন্তান গর্ভে ধারন করলে সে চরিত্রহীনা বলে গণ্য হবে। তার সন্তানও অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে। তাহলে সহবাসের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে একজন নারী নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সন্তান নিজের গর্ভে ধারন করতে পারবে না।

এই বিশ্লেষণের অর্থ হলো, আধুনিক প্রযুক্তির সবটুকু ইসলামে গৃহীত হবে তা নয়। বরং তার কিছু অংশ বৈধ হবে আর কিছু

হবে অবৈধ। তবে এই বৈধ অবৈধের মাপকাঠি শরিয়তের মূলনীতির আলোকেই নির্ণিত হবে মনগড়া নয়। আল্লাহ ﷻ এর দ্বীন পরিপূর্ণ। এখানে সকল বিষয়ের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন জিনিস আসবে সেগুলোর বিধান কি হবে তার মুলনীতি ইসলামে রয়েছে। দ্বীনের বাইরে থেকে কিছুই আমদানী করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ ﷻ বলেন, (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম" [মায়েদা/৩] বৈধ, অবৈধ সকল বিষয়ের বিধান আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে পাওয়া যাবে। কোনো কিছু অবৈধ হওয়াটা যেমন দ্বীনি বিধান একইভাবে কোনো কিছু বৈধ হওয়াও দ্বীনি বিধান। কেবল সওয়াবের কাজগুলো ছাড়া বাকীগুলো দ্বীনের বিধান নয় এই ধারণা সঠিক নয়। যারা হালাল বা বৈধ বিষয়সমূহকে দ্বীনি বিষয় মনে করে না তারা দ্বীনের একটি বড় অংশকে অস্বীকার করে। এ ধরনের বোকামী থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

এতদূর আলোচনার পর অনেকের মনে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

"হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি সবই যখন দ্বীনের বিধান তাহলে বাস-ট্রাক, মোবাইল-কম্পিউটার ইত্যাদি জিনিসগুলো কি দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি? একইভাবে ভীনপুরুষের বীর্য গ্রহণ করা যাবে না এই বিধান কি দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন?

তবে কি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা বৈধ? তাহলে বিদয়াত অর্থ কি?”

এসব প্রশ্নে উত্তর জানার জন্য প্রথমেই আমাদের আরেকটি ছোট প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।

- দ্বীন কি?

দ্বীন বলতে কি বড় আকৃতির একটা গ্যারেজ বা গোডাউনকে বোঝায় যেখানে একটা নতুন মডেলের বাস বা ট্রাক শো-ডাউন থেকে কিনে এনে ঢুকিয়ে রাখা হবে? নাকি দ্বীন বলতে বোঝায় একটা চমৎকার পাত্র যার মধ্যে আস্ত মোবাইল বা কম্পিউটার ভরে রাখা যায়?

চিন্তা করলে দেখা যাবে দ্বীন বলতে এমন কোনো স্থান বা পাত্রকে বোঝায় না যার মধ্যে কোনো বস্তুকে আস্ত পুরে রাখা যায়।

- তবে দ্বীন কি?

আসলে দ্বীন হলো কিছু বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন যা প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ ﷻ এর পক্ষ থেকে তার রসুল মুহাম্মাদ ﷺ উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আজ অবধি কুরআন ও সুন্নাতের মোড়কে তা সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে রয়েছে যাবতীয় বিষয়ের বিধি-বিধান। কিয়ামত পর্যন্ত যত সমস্যা

আসবে তার সমাধান এবং যত নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হবে তার বিধান। দ্বীন বলতে প্রশস্ত স্থান বোঝায় না বরং দ্বীন হলো পরিপূর্ণ জীবন বিধান। সুতরাং বাস-ট্রাক, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি জিনিসকে দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো সম্ভব নয়। দ্বীন হলো কিছু বিধি-বিধানের সংকলন। দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা বলতে বোঝায় দ্বীনের নামে নতুন কোনো বিধান প্রনয়ণ করা। সেটা হতে পারে সওয়াবের ক্ষেত্রে বা পাপের ক্ষেত্রে বা বৈধতার ক্ষেত্রে। হতে পারে ফরজের ক্ষেত্রে বা শিরক কুফরের ক্ষেত্রে। যেমন খারেজীরা বিদয়াতী কারণ তারা কবিরা গোনা তথা হারাম কাজকে কুফরী মনে করে। এভাবে তারা দ্বীনের মধ্যে নতুন একটি বিধান যোগ করে যা আসলে দ্বীনের মধ্যে নেই। বর্তমানে কিছু লোক আছে বিভিন্ন কুট-কৌশল অবলম্বন করে সুদকে বৈধ করার চেষ্টা করে। এভাবে তারা দ্বীনের বিধান পরিবর্তন করে ফলে তারা বিদয়াতী বলে গণ্য হবে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম পরিত্যাগ করে কাফির হয়ে যায় তাকে হত্যা করতে হবে। বর্তমান সময়কার কিছু ইসলামী চিন্তাবিদের মতে এই ব্যক্তিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বা হত্যা না করে ছেড়ে দেওয়াও বৈধ। এটাও একটা ঘৃণিত বিদয়াত। যেহেতু এতে ইসলামের সঠিক বিধানটি পরিবর্তন করা হয়। যদি কেউ বলে রাত জেগে তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করা ফরজ তবে এটা বিদয়াত বলে

গণ্য হবে। যেহেতু এ বিষয়ে ইসলামের সঠিক রায় হলো তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করা নফল ইবাদত। যদি কেউ বলে জিহাদ যে করে তার অত্যধিক সওয়াব হয় কিন্তু না করলে কোনো পাপ হয় না অর্থাৎ জিহাদ করা ফরজ নয় বরং নফল বা মুস্তাহাব। তবে এটা বিদয়াত হবে যেহতু এ বিষয়ে ইসলামের রায় হলো জিহাদ সাধারনত ফরজে কিফায়া আর শত্রুরা আক্রমণ করলে ফরজে আইন। যারা বলে শত্রুরা আক্রমণ না করা পর্যন্ত জিহাদ করা বৈধ নয় তথা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য জিহাদ করা যায়। তারাও বিদয়াতী যেহেতু আল্লাহ ﷻ সূরা তাওবাতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন কাফিরা আক্রমণ না করলেও তাদের সাথে যুদ্ধ করে জিজিয়া আদায় করতে হবে। রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও তার সাহাবাদের একই নির্দেশ দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে এটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে, না বুঝে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলোয়াত করলেও কোনো সওয়াব হবে না বা মিসওয়াক করা সুন্নাত নয় সেও বিদয়াতী। যেহেতু এ রায় ইসলামে সঠিক নয়। এভাবে ফরজ-মুস্তাহাব, মোবাহ-মাকরুহ, হারাম-হালাল, শিরক-কুফর ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে ইসলামের বিপরীত বিধি-বিধান ইসলামের নামে চালানোর চেষ্টা করাই হলো বিদয়াত। কেবল সওয়াবের কাজের সাথেই বিদয়াতের সম্পর্ক তাই নয় বরং এর সম্পর্ক সকল প্রকার বিধি-বিধানের সাথে। এক কথায় বলা

যায়,

“আল্লাহর দ্বীনের বিপরীত যে কোনো বিধানকে দ্বীনের নামে চালু করাই বিদয়াত”

কোনো বৈধ কাজকে সওয়াবের কাজ মনে করা যেমন বিদয়াত একইভাবে কোনো বৈধ কাজকে অপছন্দনীয় মনে করাও বিদয়াত এ সম্পর্কে আলোচনা করার পর মালেকী মাজহাবের প্রখ্যাত ফকীহ আল-মুয়াক বলেন,

فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ حَكَمَ عَلَى الْمُبَاحِ بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ ، أَوْ بِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ .كَانَ سَيِّدِي ابْنُ سِرَاجٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : هَذِهِ هِيَ الْبِدْعَةُ الْمَذْمُومَةُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ بِغَيْرِ حُكْمِهِ

কোনো বৈধ কাজকে সওয়াবের কাজ মনে করা এবং কোনো বৈধ কাজকে অপছন্দনীয় ঘোষণা করা আসলে একই বিষয়। আমার শায়েখ ইবনে সিরাজ রহেমাহুল্লাহ বলতেন এটাই হলো বিদয়াত যে, কোনো বিষয়ে শরীয়তের বিধানের বিপরীত বিধান প্রয়োগ করা হবে। [আত-তাজ ওয়াল ইকলীল]

এখন প্রশ্ন হলো, বাস-ট্রাক, মোবাইল-কম্পিউটার, ভীন পুরুষের বীর্যের মাধ্যমে সন্তান ধারন করার অত্যাধুনিক পদ্ধতি, সূর্য ডোবা-ওঠার চার্ট দেখে সাহরী ও ইফতারের সময়সীমা নির্ধারন করা ইত্যাদি বিষয়াবলী রসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ছিল না। এগুলো

নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন এই সকল নতুন বিষয়ের উপর শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করে কোনোটিকে বৈধ বলা হচ্ছে কোনোটিকে বলা হচ্ছে অবৈধ। এটা কি দ্বীনের বিধানের মধ্যে নতুন সংযোজন নয়?

এর উত্তর হলো, না। এটা দ্বীনের বিধানের মধ্যে নতুন সংযজোন বলে গণ্য নয়। এই জিনিসগুলো নতুন কিন্তু এগুলোর বিধান পুরোনো। দেড় হাজার বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন ও রাসুলের হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার আলোকেই এগুলোর বিধান নির্ণয় করা হয়েছে। সুতরাং এই বিধানগুলোকে দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযজন বলার কোনো সুযোগ নেই। যদি কেউ দেড় হাজার বছর পূর্বে অবতীর্ণ বিধি-বিধান ও মূলনীতি পরিত্যাগ করে এই সকল বিষয়াবলীর উপর নতুন বিধান প্রয়োগ করে বলে, ভীন পুরুষের বীর্য নিয়ে সন্তান ধারন করা বৈধ বা বাস-ট্রেন, প্লেন ইত্যাদিতে সফর করা অবৈধ তবে এটা দ্বীনের বিধানের মধ্যে নতুন সংযোজন বলে গণ্য হবে এবং বিদয়াত হবে। একইভাবে যদি কেউ বলে বাসে ভ্রমণ করলে ১০ নেকি আর ট্রেনে ভ্রমন করলে ২০ নেকি তবে এটা বিদয়াত হবে যেহেতু এটা শরীয়তের বিধান নয়। যদি কেউ বলে মাইকে আজান দিলে বেশি সওয়াব তবে বিদয়াত হবে না। যেহেতু শরীয়তের মূলনীতির আলোকে এটা প্রমাণ করা সম্ভব। রসুলুল্লাহ ﷺ বিলাল رضي الله عنه কে আজান দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর

কারণ হিসেবে বলেন, (إنه اندي صوتا) “তার গলার আওয়াজ অধিক উঁচু” [সহীহ মুসলিম] আরেকটি হাদীসে এসেছে, الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ যতদূর পৌঁছায় তাকে সে অনুযায়ী ক্ষমা করা হবে এবং জল ও স্থলের প্রতিটি প্রাণি তার পক্ষে সাক্ষী দেবে। [আবু-দাউদ]

এই সকল বর্ণনা অনুযায়ী আজানের সময় মাইক ব্যবহারে অধিক সওয়াব এমন বলা হলে তা দোষনীয় হবে না। এক কথায় কুরআন-হাদীসের উপর গবেষণা করে সঠিক মুলনীতির আলোকে নতুন সৃষ্ট বিষয়াবলীর উপর যে বিধান প্রয়োগ করা হয় তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য নয়। বিপরীত দিকে কোনো বিষয়ের উপর ইসলামের বিপরীত বিধান প্রয়োগ করা হলে এবং উক্ত বিধানকে ইসলামী বিধান হিসেবে দাবি করলে তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত বিষয়টি পুরোনো হোক বা নতুন হোক। উদাহরণ স্বরুপ যদি কেউ মিসওয়াক করাকে ফরজ মনে করে বা এটাকে নিষিদ্ধ মনে করে তবে এটা বিদয়াত হবে। এখনে যদিও মিসওয়াক কোনো নতুন সৃষ্ট বিষয় নয় কিন্তু মিসওয়াক সম্পর্কে যে বিধান দেওয়া হচ্ছে তা নতুন সৃষ্ট। শরীয়তে মিসওয়াকের বিধান সুন্নাত, ফরজ বা নিষিদ্ধ নয়। মোট কথা বিদয়াতের সম্পর্ক বিধি বিধানের সাথে। যদি সঠিক বিধান প্রয়োগ করা হয় তবে বিদয়াত হবে না যে বিষয়ের উপর

বিধানটি প্রয়োগ করা হচ্ছে তা নতুন হোক বা পুরোনো হোক। বিপরীত দিকে যদি বিধানটি শরীয়তের বিপরীত তথা নতুন সৃষ্ট হয় তবে বিদয়াত হবে যে বিষয়ের উপর বিধানটি প্রয়োগ করা হচ্ছে তা নতুন হোক বা পুরোনো হোক।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা দ্বীন বলতে কি বোঝায় এবং দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং তার আলোকে বিদয়াত শব্দের সঠিক অর্থ কি তার একটা রূপরেখা তুলে ধরেছি। আমরা বলেছি,

“কুরআন-হাদীসে প্রতিটি বিষয়ের বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু নতুন বিষয় আমাদের চোখের সামনে আসবে শরীয়তের মূলনীতির আলোকে সেগুলোর সঠিক বিধান নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হবে। যে কোনো ক্ষেত্রে শরীয়তের সঠিক বিধান পরিত্যাগ করে তার বিপরীত বিধান গ্রহণ করা হলে তা বিদয়াত হবে। আর যদি কোনো বিষয়ের উপর শরীয়তের মাপকাঠি অনুযায়ী সঠিক রায় প্রয়োগ করা হয় তবে এটা কখনও বিদয়াত বলে গণ্য হতে পারে না যদিও বিষয়টি নতুন সৃষ্ট হয় বা দেখতে নতুন মনে হয়।”

এই বিষয়টি স্মরণ রেখে আমরা আবার পিছনে ফিরে যাবো।

আমরা বিদয়াতের প্রচলিত সংজ্ঞা নিয়ে কথা বলছিলাম। আমরা বলছিলাম, বিদয়াতের প্রচলিত সংজ্ঞার মধ্যে বেশ কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। পূর্বের আলোচনাতে আমরা সংজ্ঞাটির একটি অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। এখন আমরা সংজ্ঞাটির দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে কথা বলবো। সংজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে,

“রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত নয় দ্বীনী উদ্দেশ্যে এমন কোনো কাজ করা বিদয়াত।”

পূর্বেই বলেছি “যা কিছু রাসুলুল্লাহ ﷺ করেননি সাহাবায়ে কিরাম করেননি তাই বিদয়াত” এই মুলনিতীটি বর্তমানে ব্যাপক প্রশিদ্ধ। যারা বিদয়াত সম্পর্কে লেখা-লেখি করেন তাদের বেশিরভাগই চোখ বুজে এই মূলনীতি অনুসরণ করেন। তারা দ্ব্যার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, “আল্লাহর কুরআন ও রাসুলের সুন্নাতে যে বিষয়ের প্রমাণ নেই, যে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের আমল নেই দ্বীনের মধ্যে তা আবিষ্কার করা বিদয়াত”। এই সংজ্ঞার সাথে আমরা পুরোপুরি একমত কিন্তু সংজ্ঞাটির যাথার্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বর্তমানে যারা সংজ্ঞাটিকে বেশি-বেশি ব্যবহার করেন তারা এটার সঠিক ব্যাখ্যা জানেন না বলেই যত্র-তত্র সংজ্ঞাটি প্রয়োগ করে গোলমাল সৃষ্টি করছেন। এই সংজ্ঞাটি ভুলভাবে ব্যবহার করে তারা প্রচুর সংখ্যক ভাল কাজকে বিদয়াত বানিয়ে ছেড়েছেন। যেমন, আল্লাহর নামে যিকির করা, পবিত্র কুরআন চুম্বন করা, পবিত্র কুরআনকে কুরআন শরীফ

বলা, জামাতবদ্ধ হয়ে বা সূর করে দরুদ পাঠ করা ইত্যাদি। আমরা সংজ্ঞাটি পরিত্যাগ করতে বলছি না তবে সংজ্ঞাটির সঠিক ব্যাখ্যা জেনে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে বলছি। উপরে আমরা সংজ্ঞাটির একটি অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আমরা বলেছি, দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার বলতে বোঝায় দ্বীনের নামে এমন কোনো বিধি-বিধান তৈরী করা যা আসলে দ্বীনের মধ্যে নেই। আমরা বলেছি, আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাতের আলোকে যে বিষয়ে যে বিধান প্রমাণিত হয় উক্ত বিষয়ে ঐ বিধানই প্রয়োগ করতে হবে। তার বিপরীত কোনো বিধান প্রয়োগ করা হলে তা বিদয়াত হিসেবে পরিগণিত হবে। এটা একটা স্পষ্ট বিষয়। কিন্তু যে বিষয়টা অনেকের নিকট অস্পষ্ট তা হলো,

কুরআন সুন্নাহর আলোকে তথা রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের মাধ্যমে কোনো বিষয় প্রমাণিত হওয়ার অর্থ কি?

অনেকের ধারনা কুরআন-হাদীসে কোনো বিষয়ের প্রমাণ থাকা অর্থ উক্ত বিষয়ের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণিত হওয়া। তারা বলেন, কুরআন-হাদীসে কি মিলাদ পড়ার প্রমাণ আছে? এর অর্থ কুরআন-হাদিসে কি মীলাদ নামে কোনো আমলের বর্ণনা এসেছে এবং মীলাদে আগা-থেকে গোড়া পর্যন্ত কি কি

করতে হবে সেগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে? যখন তাদের বলা হয় মীলাদে তো খারাপ কিছু করা হয় না। একটু দরুদ পাঠ করা হয়, কিছুক্ষণ যিকির করা হয় এবং মোনাজাত ও মিষ্টান্ন বিতারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এসব যা কিছু করা হয় তার সবই তো শরীয়তে প্রমাণিত ও প্রশংসিত কাজ। এতে সমস্যার কি আছে? তারা বলে, এসব কাজ শরীয়তে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত আছে কিন্তু এই ধারাবাহিকতা ও পদ্ধতিতে তা আদায় করার কথা শরীয়তে নেই। অতএব, এটা বিদয়াত। একইভাবে দোয়া-মোনাজাত ভাল জিনিস হলেও, বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের শেষে সম্মিললিতভাবে হাত তুলে মোনাজাত করা বিদয়াত কারণ ঠিক এভাবে মোনাজাত করার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কিছুই বর্ণিত হয়নি। এখানে স্পষ্ট বুঝে নিতে হবে যে, কোনো ব্যাপারে শরীয়তের দলিল প্রমাণ অন্বেষণের এই পদ্ধতিটি সঠিক নয়।

সত্য কথা হলো, আল্লাহর ﷻ রাসুলকে প্রেরণ করেছেন সারা পৃথিবীর সকল মানুষকে ভাল-মন্দের জ্ঞান দেওয়ার জন্য। কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল মানব-দানবের দৈনন্দিন জীবনে যত রকমের বিধি-বিধানের প্রয়োজন সেসব কিছুর বর্ণনা আল্লাহর দ্বীনে রয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন, (اليوم أكملت لكم دينكم) “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম” [মায়েদা/৩] অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে,

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}

আমি আপনার উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তাতে সকল কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। [সূরা নাহল/৮৯]

মোট কথা, সময়ের বিভিন্ন ক্ষণে আগত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত সাদা-কালো, সভ্য-অসভ্য সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান আল্লাহর কিতাব তথা তার দ্বীনে রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, প্রতিটি বিষয়ের নাম ধরে ধরে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে নাকি কিছু মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যার আলোকে সকল বিষয়ের বিধান নির্ণয় করা সম্ভব হবে? এর উত্তর খুবই সহজ, খুবই স্পষ্ট। যদি সকল বিষয়ের নাম ধরে ধরে বিধান বর্ণনা করা হতো তবে পবিত্র কুরআন আকারে এত বড় হতো যা বক্ষে ধারন করার ক্ষমতা কোনো হাফিজের হতো না এবং কোনো আলেমের পক্ষে সেসব বিধানাবলীর উপর পূর্নাঙ্গরূপে গবেষণা করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي}

বলুন যদি আমার রবের বাণী লেখার জন্য সমুদ্রের পানিকে কালি করা হয় তবু আমার রবের বাণী শেষ হওয়ার পূর্বেই সমূদ্রের পানি শেষ হয় যাবে। [কাহফ/১০৯]

একারণে পবিত্র কুরআন ও রাসুলের সুন্নাতে সরাসরি সকল বিষয়ের নাম-পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি বরং এমন কিছু মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যার আলোকে সকল বিষয়ের বিধান নির্ণয় করা যায়। উদাহরণ স্বরুপ পৃথিবীতে যত রকমের নেশাদ্রব্য আছে সবগুলোর নাম কুরআন-হাদিসে উল্লেখ নেই তবে সাধারনভাবে বলা হয়েছে, “সকল নেশাসৃষ্টিকারী দ্রব্য হারাম” এই মূলনীতির আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রকার মাদক দ্রব্য আবিষ্কৃত হবে তার সবই হারাম প্রমাণিত হবে। সরাসরি সেগুলোর নাম কুরআন-হাদিসে উল্লেখ থাকার প্রয়োজন নেই। কুরআন হাদীসে কোনো বিষয় নাম ধরে উল্লেখ না থাকলে যারা মনে করে সে ব্যাপারে কুরআন হাদিসে কোনো প্রমাণ নেই তারা এ বিষয়ে ভুলের মধ্যে আছে। এই ভুলের কারণে তারা নতুন সৃষ্ট যে কোনো বিষয়কে বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কোনো দ্বীনী কাজ একটু নতুন আঙ্গিকে করতে দেখলে তারা সেটার নিন্দা করা শুরু করে। যে পদ্ধতিতে কাজটি করা হচ্ছে শরীয়তের মুলনীতিতে তা গ্রহনযোগ্য কিনা সেটা লক্ষ্য করে না। পুর্ববর্তী যুগের বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম কিন্তু এমন মনে করেন নি। তারা বলেছেন, নতুন সৃষ্ট যে কোনো বিষয় তিরষ্কার যোগ্য নয়। বরং লক্ষ্য করতে হবে শরীয়তের মূলনীতিতে সেটা গ্রহণযোগ্য না কি অগ্রহণযোগ্য। যদি গ্রহণযোগ্য হয় তবে তো তা উত্তম নতুবা তা হবে ঘৃণিত বিদয়াত।

ইমাম শাফেঈ ﷺ বলেন,

المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة

নতুন সৃষ্ট বিষয়াবলী দু'রকম। তার মধ্যে যেগুলো কিতাব, সুন্নাত বা ইজমার বিপরীত হয় সেগুলো বিদয়াত ও পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য। আর যেগুলো এসব কিছুর বিপরীত নয় সেগুলো নতুন সৃষ্ট হলেও নিন্দিত নয়। [ফাতহুল বারী]

ইবনে হাযার আসক্বালানী ﷺ বলেন,

والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام

সকল বিদয়াত পথভ্রষ্টতা এর অর্থ হলো যেসব নতুন সৃষ্টির স্বপক্ষে নাম ধরে বা সাধারন মূলনীতি আকারে কোনো দলিল বর্ণিত নেই সেগুলো। [ফাতহুল বারী]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তিনি কোনো বিষয়ে দলিল বর্ণিত হওয়ার দুটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত বিষয়ে সরাসরি দলিল বর্ণিত হওয়া অথবা সাধারনভাবে কোনো মূলনীতি বর্ণিত হওয়া।

ইজ্জুদ্দিন ইবনে আব্দিস সালাম থেকে ইবনে হাযার আসক্বালানী ফাতহুল বারীতে এবং ইমাম নাব্বী শারহে মুসলিমে বর্ণনা করেছেন তিনি নতুন সৃষ্ট বিষয়াবলীকে শরীয়তের বিধানাবলী অনুযায়ী পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলো, ফরজ,

মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ। অর্থাৎ শরীয়তের মুলনীতি অনুযায়ী নতুন সৃষ্ট বিষয়ের উপর এই সকল বিধানের মধ্যে যে কোনো একটি বিধান প্রযোজ্য হতে পারে। এরপর তিনি প্রতিটি বিষয়ের উদহারণ উল্লেখ করেছেন। ফরজের উদাহরণে তিনি নাহু শিক্ষা করা, উসুলে ফিকহ ও হাদীসের রেজালশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি বিষয়াবলীকে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু এগুলো ছাড়া শরীয়ত সম্পর্কে জানা ও শরীয়তকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। হারাম তথা নিষিদ্ধ বিদয়াত সম্পর্কে তিনি কাদরিয়া, মু'তাজিলা, মুজাসসিমা ইত্যাদি বিদয়াতী ফিরকার ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড ও আক্বীদা-বিশ্বাস সমূহ উল্লেখ করেছেন। নতুন সৃষ্ট যেসব বষয়াবলী মুস্তাহাব সেগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন,

كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي

এগুলো হলো প্রতিটি উত্তম কাজ রসুলের যুগে যার সরাসরি অস্তিত্ব ছিল না।

ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনে আব্দুস সালামের এই কথাটির উপর গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি রসুলের যুগে বিদ্যমান ছিল না এমন কাজকেও উত্তম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এর কারণ হলো- যদিও বিষয়টি নতুন আবিষ্কৃত কিন্তু শরীয়তের মূলনীতির আলোকে তা উত্তম হিসেবে প্রমাণিত।

এরপর তিনি নতুন সৃষ্ট মুস্তাহাব তথা উত্তম কার্যাবলীর উদাহরণ হিসেবে, তারাবীর সলাত জামাতে পড়া, মাদ্রাসা নির্মাণ করা, অন্তর নরম করার জন্য বৈধ তাসাউফ চর্চা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের ইচ্ছা নিয়ে মোনাজারা তথা দ্বীনী মাসয়ালা মাসায়েল সম্পর্কে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি বিষয়কে উল্লেখ করেছেন।

সব শেষে তিনি নতুন সৃষ্ট বৈধ বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে ফজর ও আসরের পর মুসল্লীদের সাথে মোসাফা করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ফাতহুল বারীতে এবং ইমাম নাব্বী তাহজিবুল আসমা নামক কিতাবে এসব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম নাব্বী বর্ণনা করেন, ইজ্জুদ্দিন আব্দিস সালাম নতুন সৃষ্ট বিষয়াবলীকে উপরোক্ত পাঁচটি ভাগে ভাগ করার পর বলেন,

والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة

নতুন সৃষ্ট কোনো বিষয়ের সঠিক বিধান জানতে হলে তা শরীয়তের মূলনীতির উপর পেশ করতে হবে। যদি মুলনীতির আলোকে তা ফরজ প্রমাণিত হয় তবে তা ফরজ বলে গণ্য হবে,

মুলনীতির আলোকে হারাম প্রমাণিত হলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। এভাবে মুস্তাহাব হলে মুস্তাহাব, মাকরুহ হলে মাকরুহ এবং মুবাহ হলে মুবাহ বলে গণ্য হবে। [তাহযিবুল আসমা]

ইমাম নাব্বী নিজেও এই কথা সমর্থন করেছেন। ইমাম নাব্বীর শায়েখ আবু শামা ﵀ তার কিতাব "আল-বায়িছ আলা ইনকারিল বিদায়ি ওয়াল হাওয়াদিস" নামক কিতাবে বিদয়াতকে ভাল ও মন্দ দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

ইবনে দাকীকিল ঈদ ﵀ বলেন,

إعلم أن المحدث على قسمين : محدث ليس له أصل في الشريعة فهذا باطل مذموم ومحدث بحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم لأن لفظ (المحدث) ولفظ (البدعة) لا يذمان لمجرد الإسم بل لمعنى المخالفة للسنة والداعي إلى الضلالة ولا يذم ذلك مطلقا

জেনে রাখো নতুন সৃষ্ট বিষয় দুই প্রকার, একপ্রকার হলো শরীয়তে যার কোনো মূলনীতি নেই। এটা নিন্দনীয়। আর এক প্রকার হলো নতুন সৃষ্ট একটি বিষয়কে শরীয়তে বর্ণিত কোনো বিষয়ের সাথে মিলিয়ে (কিয়াস করে) কোনো বিধান দেওয়া। এটা নিন্দনীয় নয়। কেননা শুধু মাত্র নতুনসৃষ্ট হওয়ার কারণে বা বিদয়াত নামের কারণে কোনো বিষয় নিন্দনীয় হবে না বরং কোনো কিছু নিন্দনীয় হবে যদি সেটা সুন্নাতের বিপরীত হয় বা কোনো পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। একারণে সব ধরণের

নতুন সৃষ্ট বিষয়ের নিন্দা করা যাবে না। [ইমাম নাব্বীর চল্লিশ হাদিসের ব্যাখ্যা]

ইবনে আছির ﷺ আন-নিহায়াতে বলেন,

البدعة بِدْعَتَان : بدعة هُدًى وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما أَمَر اللّه به ورسوله صلى اللّه عليه وسلم فهو في حَيِّز الذّم والإنكار وما كان واقعا تحت عُموم ما نَدب اللّه إليه وحَضَّ عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنَوْع من الجُود والسخاء وفعْل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما وَرَدَ الشرع به

বিদয়াত (নতুন সৃষ্ট বিষয়াবলী) দুই প্রকার। উত্তম বিদয়াত আর পথভ্রষ্ট বিদয়াত। যা কিছু আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক তাই নিন্দনীয় আর যেসব বিষয় আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সাধারন নির্দেশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত সেগুলো প্রশংসিত। যদিও এমন হয় যে, সেগুলো পূর্বে ছিল না যেমন নতুন কোনো পদ্ধতিতে দান করা বা ভাল কোনো আমল করা। তবে এসকল পদ্ধতি শরীয়তের বিপরীত হতে পারবে না।

এরপর এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ

عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

যে কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো উত্তম সুন্নাত (রীতি-নীতি) চালু করে তাকে তার সওয়াব দেওয়া হবে এবং তার পর যত লোক ঐ সুন্নাতের উপর আমল করবে সে তাদের সমান সওয়াব প্রাপ্ত হবে যদিও তাদের সওয়াবে সামান্যও কমতি হবে না। আর যে কেউ ইসলামের মধ্যে খারাপ সুন্নাত (রীতি-নীতি) চালু করবে সে পাপ তাকে বহন করতে হবে এবং তার পর যত লোক ঐ বিষয়ের উপর আমল করবে তাদের সবার সমান পাপ তার জন্য লেখা হবে। যদিও অন্যদের পাপে সামান্যও কমতি হবে না। [সহীহ মুসলিম]

এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় নতুন কোনো রীতি-নীতি বা পদ্ধতি অনেক সময় উত্তম বলে বিবেচিত হতে পারে।

ইমাম নাব্বী ﵀ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه و سلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة

এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় রসুলুল্লাহ ﷺ যে বলেছেন, "সকল বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা" এর মাধ্যমে আসলে সকল বিদয়াত (নতুন সৃষ্ট বিষয়) উদ্দেশ্য নয় বরং যেসব নতুন সৃষ্ট বিষয় ভ্রান্ত এবং যেসব বিদয়াত নিন্দনীয় কেবল সেগুলো উদ্দেশ্য। [শারহে মুসলিম]

অনেকে অবশ্য এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে উত্তম রীতি-নীতি ও পদ্ধতি চালু করা বলতে শরীয়তে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে বোঝানো হয়েছে যা মানুষ পরিত্যাগ করেছে। উক্ত বিষয়কে পুনরায় চালু করলে এমন সওয়াব পাওয়া যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে নতুন কোনো রীতি-নীতি বা পন্থা-পদ্ধতি চালু করা উদ্দেশ্য নয়। আমরা বলবো, এই হাদিসটির এই ব্যাখ্যাও সঠিক তবে এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। সাধারন ভাবে শরীয়তের মানদন্ডে গৃহীত যে কোনো রীতি-নীতি ও পন্থা পদ্ধতি চালু করা এই হাদিসের মূলভাবের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। নিজের খেয়াল-খুশি মতো কোনো একটি ব্যাখ্যাকে বাতিল করার অধিকার কারও নেই। উত্তম রীতি নীতি ও পন্থা-পদ্ধতি চালু করা বলতে একদিকে যেমন শরীয়তে সরাসরি উল্লেখিত কোনো বিষয় অজ্ঞ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া বা কোনো মৃত সুন্নাত জীবীত করা বোঝায় একইভাবে শরীয়তের মূলনীতিতে গ্রহণযোগ্য কোনো নতুন রীতি-নীতি বা পন্থা-পদ্ধতি চালু করাও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। উদাহরণস্বরুপ, খুবাইব ﵁ কে কাফিররা হত্যা করার ইচ্ছা করলে তিনি তাদের নিকট দু'রাকাত সলাত আদায় করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তারা অনুমতি দিলে তিনি দু'রাকাত সলাত আদায় করেন। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে বলা হয়েছে, (فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا) "খুবাইব ﵁ সর্বপ্রথম বন্দি অবস্থায় যারা নিহত হয় এমন সকল মুসলিমদের

জন্য নিহত হওয়ার পূর্বে দু'রাকাত সলাত আদায় করার সুন্নাত (রীতি) চালু করেন।''

আবু দাউদ শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে, প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরাম জামাতে সলাত দাড়িয়ে যাওয়ার পর হাজির হলে পাশের জনের নিকট ইশারায় জেনে নিতেন কত রাকাত সলাত শেষ হয়েছে তারপর তাড়াতাড়ি আগের রাকাতগুলো পড়ে নিয়ে ইমামের সাথে বাকী সলাত শেষ করতেন। মুয়াজ ইবনে জাবাল ﵁ একদিন সলাতে দেরি করে হাজির হলেন কিন্তু তিনি এমনটি করলেন না। তিনি এসেই জামাতে সলাত আদায় করা শুরু করলেন এবং পরে আগের রাকাতগুলো আদায় করে নিলেন। এটা দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً، كَذَلِكَ فَافْعَلُوا) ''মুয়াজ তোমাদের জন্য এই সুন্নাত (রীতি) চালু করেছে এখন থেকে তোমরা এমনই করবে''

শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন [সহীহ আবি দাউদ/৪৭৮]

এসব হাদীস প্রমাণ করে উত্তম রীতি-নীতি চালু করার বিষয়টি দু'রকমই হতে পারে। যে বিষয় শরিয়তে সরাসরি প্রমাণিত কিন্তু মানুষের নিকট পরিত্যাক্ত সেই বিষয় মানুষের মাঝে পুনরায় চালু করা যেমন উত্তম রীতি চালু করা হিসেবে গণ্য একইভাবে যেসব বিষয়ে শরিয়তে সরাসরি প্রমাণ নেই তবে

সাধারন মূলনীতি রয়েছে সেগুলো চালু করাও উত্তম রীতি-নীতি হিসেবে গণ্য। এর কোনো একটিকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই।

ইমাম নাব্বী ﷺ এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় কেউ ভাল বা খারাপ রীতি নীতি চালু করলে তার পাপ-পূন্য চিরকাল সে পেতে থাকবে এই মন্তব্য করার পর বলেন,

سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْهُدَى وَالضَّلَالَة هُوَ الَّذِي اِبْتَدَأَهُ ، أَمْ كَانَ مَسْبُوقًا إِلَيْهِ

উক্ত রীতি নীতি সে নিজে প্রথম শুরু করুক বা তার পূর্বে কেউ করেছিল (কিন্তু পরিত্যক্ত হওয়ার পর সে আবার তা চালু করছে) এমন হোক। [শারহে মুসলিম]

এসব আলোচনার সারমর্ম হলো কোনো বিষয়ে শরীয়তে দলিল-প্রমাণ আছে কিনা এবং সেটা শরীয়তের মূলনীতিতে বৈধ কিনা তা বুঝতে হলে ঐ বিষয়টির নাম ধরে অনুসন্ধান করলে হবে না। যেহেতু শরীয়তে সকল বস্তুর নাম ধরে বিধান বর্ণনা করা হয় নি। এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হলো বিষয়টির অভ্যন্তরভাগে দৃষ্টিপাত করা। সেখানে যা কিছু করা হয় বা বলা হয় সেগুলোর ব্যাপারে শরীয়তের রায় কি তা লক্ষ্য করা। যদি তার মধ্যে নিষিদ্ধ কিছু পাওয়া না যায় তবে বিষয়টিকে নিষিদ্ধ বলার কোনো সুযোগ নেই। কেবল নতুন হওয়ার কারণে কোনো বিষয় নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে না। কুরআন হাদীস ও উম্মতের ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

উদাহরণস্বরুপ রসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মাদ্রাসা বলে কিছু ছিল না। তখন ইলম চর্চা তো অবশ্যই ছিল কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নয়। বছরের শুরুতে ছাত্র ভর্তি করা, বিভিন্ন ক্লাস ও বিষয়বস্তু নির্ধারন করে সারাবছর পড়াশোনার পর পরীক্ষা গ্রহণ করে পাশ ফেলের সার্টিফিকেট প্রদান করার পদ্ধতি তখন ছিল না। এখানে লক্ষনীয় হলো ইলম চর্চা একটি দ্বীনী বিষয়। এই দ্বীনী বিষয়টিকে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতিতে আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। কুরআন হাদীসের কোথাও মাদরাসা শব্দটি উল্লেখ নেই। হুবহু এই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়াও সম্ভব নয়। তবে কি আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থাকে বিদয়াত বলবো? যারা কুরআন-হাদীসে সব কিছুর সরাসরি প্রমাণ চান তাদের এমনই বলা উচিৎ। কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক পদ্ধতি হলো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয় শরীয়তের মুলনীতির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। যদি এর মধ্যে নিষিদ্ধ কোনো বিষয় থাকে তবে এটাকে নিষিদ্ধ বলা হবে আর যদি এর মধ্যে নিষিদ্ধ কোনো বিষয় না পাওয়া যায় তবে এটা অবশ্যই বৈধ ও উত্তম বিবেচিত হবে। চিন্তা করলে দেখা যাবে ইলম অর্জনের জন্য কোথাও ভর্তি হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় নয়। সাধারনভাবে বলা যায় ইলম অর্জন বা অন্য কোনো ভাল কাজে নাম লেখানো অর্থ উক্ত ভাল কাজে অংশ গ্রহণ করা সুতরাং এটা বৈধ। তাছাড়া ভালো কাজে

নাম নথিভূক্ত করার প্রমাণও পাওয়া যায়। কা’ব ﵁ বলেন, তাবুকের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেনি তারা নিশ্চিন্ত ছিলো যে তাদের অনুপস্থিতি কেউ টের পাবে না কারণ তাবুকের যুদ্ধে লোক সংখ্যা এতই বেশি ছিল যে তাদের নামের লিস্ট প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল না। [বুখারী ও মুসলিম] এ থেকে বোঝা যায় যুদ্ধে মুজাহিদদের নামের লিস্ট প্রস্তুত করার বিষয়টি সে সময় পরিচিত ছিল। ছাত্র ভর্তি করার পর সারাবছর তাদের পড়া-শোনা করিয়ে এবং পরীক্ষা নিয়ে যদি মনে হয় সত্যিই তারা জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তবে সেই জ্ঞানের প্রমাণ সরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করাতেও দোষ নেই। সার্টিফিকেট অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া। যদি কেউ সত্যিই জ্ঞানী হয়ে থাকে তবে তার জ্ঞানের সাক্ষ্য দেওয়াতে দোষের কিছু নেই। এভাবে বিশ্লেষণ করলে শরীয়তের মূলনীতির আলোকে সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় এমন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থা উত্তম প্রমাণিত হয়।

যদি একই পন্থায় পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর মোনাজাত করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা হয় তবে দেখা যাবে বিষয়টি হুবহু রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। কিন্তু এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াবলীর উপর শরীয়তের নির্দেশ পাওয়া যায়। প্রথমত সালাতের পূর্বে, পরে বা অন্য যে কোনো সময়ে দোয়া করার ব্যাপারে শরীয়তে সাধারন অনুমতি রয়েছে। এমনকি বিশেষভাবে সলাতের পর দোয়া করার ফজিলত সম্পর্কেও

হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলো, (أي الدعاء أسمع) কোন দোয়া আল্লাহ সর্বাধিক শ্রবন করেন? তিনি বলেন, (جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة) রাতের শেষ ভাগ এবং ফরজ সলাতের পরে দোয়া করা।

ইমাম তিরিমযী বলেছেন, হাদিসটি হাসান। শায়েখ আলবানীও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

দোয়া করার সময় হাত তোলার ব্যাপারেও হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ইমাম বুখারী এ বিষয়ে পৃথক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দোয়া করার সময় হাত তুলেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করে অনেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন। আনাস رضي الله عنه বলেন, (كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء) "রাসুলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া ছাড়া অন্য কোনো দোয়াতে হাত তুলতেন না"। [সহীহ বুখারী]

সহীহ বুখারীতেই এই হাদীসের বিপরীত বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। একটি বর্ণনাতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ওজু করার পর হাত তুলে বলেন, (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ) "হে আল্লাহ আপনি উবাইদ আবি আমরকে ক্ষমা করুন" অন্য একটি হাদিসে এসেছে খালিদ رضي الله عنه অসতর্কতাবশত কিছু ব্যাক্তিকে হত্যা করলে,

রসুলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে বলেন, (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ) "হে আল্লাহ খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করছি।" আবু দাউদ ও তিরমিযীর একটি বর্ণনাতে এসেছে,

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

তোমাদের রব সম্মানিত ও আত্মসম্মানী। বান্দা যখন তার নিকট দুটি হাত তুলে প্রার্থনা করে তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।

ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, ইবনে হাযার আসক্বালানী এই হাদীসের সনদকে উত্তম বলেছেন, শায়েখ আলবানীও হাদিটিকে সহীহ বলেছেন [সহীহু আবি দাউদ-১৩২০]

এসকল হাদিস প্রমাণ করে রসুলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্যান্য দোয়াতেও হাত তুলতেন। একারণে ইবনে হাযার আসক্বালানী বলেন, আনাস رضي الله عنه যা জানতেন তাই বলেছেন আর অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বৃষ্টি প্রার্থনা ছাড়াও অন্যান্য দোয়াতে হাত তুলতে দেখেছেন তাই তারা তা বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরও বলেন,

فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الاخبار بمشروعيتها

অতএব দোয়াতে হাত তুলতে নিষেধ করার কোনো মানে হয় না যেহেতু এটা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে বেশ কিছু হাদিস প্রমাণিত হয়েছে। [ফাতহুল বারী]

মোট কথা, সাধারনভাবে যে কোনো দোয়াতে হাত তোলার ব্যাপারটি রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত।

এখন বাকী থাকে সম্মিলিতভাবে দোয়া করার ব্যাপারটি। এ ব্যাপারে শরীয়তের মুলনীতি হলো বিশেষ কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলে যে কাজ একাকী করা যায় তা সম্মিলিতভাবেও করা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে সম্মিলিতভাবে কোনো কাজ করার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। হাদিসে কুদসীতে এসেছে আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُم

যদি আমার বান্দা আমাকে নির্জনে একাকী স্মরণ করে তবে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি আর যদি সে আমাকে কোনো মজলিসে অনেক মানুষের মধ্যে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে তদাপেক্ষা উত্তম মজলিসে (ফেরেশতাদের মসলিসে) স্মরণ করি। [সহীহ বুখারী]

সন্দেহ নেই যে আল্লাহকে স্মরণ করা বলতে যে কোনো উত্তম

কথা ও নেক আমলকে বোঝায়। পবিত্র কুরআনে জুময়ার খুতবা এবং সলাতকে যিকির তথা আল্লাহর স্মরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ হিসেবে দোয়া-মোনাজাত, সলাত-সওম ইত্যাদি যে কোনো উত্তম ইবাদতই আল্লাহর স্মরণ হিসেবে গণ্য। সুতরাং এই হাদীসটি সম্মিলিতভাবে যে কোনো ইবাদত করার ফজিলত প্রমাণ করে। এছাড়া সরাসরি দোয়া করা সম্পর্কে একটি হাদিসে এসেছে,

لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم و يؤمن البعض إلا أجابهم الله

যখন একদল লোক একত্রিত হয়ে একজন দোয়া করে আর বাকীরা আমীন বলে আল্লাহ অবশ্যই তাদের দোয়া কবুল করেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম]

এই হাদিস সম্পর্কে আল-হাইছামী বলেন,

ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث

এই হাদীসের রাবীরা সহীহ হাদীসের রাবী শুধু ইবেন লাহিয়া ছাড়া তবে সেও হাসান রাবী।

[মাজমায়ে যাওয়ায়েদ]

শায়েখ আলবানী অবশ্য হাদিসটিকে দূর্বল বলেছেন। তবে সামগ্রিকভাবে হাদিসটি অন্যান্য হাদীসের সাথে সমার্থপূর্ন। তাছাড়া এটা কোনো সহীহ হাদীসের বিপরীত নয়। যেহেতু

সম্মিলিতভাবে দোয়া করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। উপরন্তু বৃষ্টি প্রার্থনা ও অন্যান্য কিছু উপলক্ষে সম্মিলিতভাবে দোয়া করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এধরনের বিষয়ে দূর্বল হাদীসও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়।

এখন প্রশ্ন হলো- যদি মাদ্রাসা শিক্ষা বৈধ হয় তবে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর মোনাজাত করা কি কারণে বিদয়াত বলে গণ্য হবে? এটা কি সুবিবেচনা হতে পারে!

অনেকে অবশ্য এখানে একটি কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তারা মাসালেহে মুরসালা (مصالح مرسلة) নামে নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করতে চায়। তারা বলে মাদ্রাসা নির্মাণ, কুরআন সংকলন, পবিত্র কুরআনে যের যবর সংযোজন ইত্যাদি বিষয় মাসালেহে মুরসালার মধ্যে গণ্য কিন্তু মোনাজাত, রাসুলের জন্ম দিন পালন ইত্যাদি বিষয় বিদয়াত হিসেবে গণ্য। এখন প্রশ্ন হলো মাসালেহে মুরসালার সাথে বিদয়াতের পার্থক্য কি? কি কারণে মাদ্রাসা মাসালেহে মুরসালার মধ্যে গণ্য হবে আর মুনাজাত বিদয়াত বলে গন্য হবে? এভাবে পার্থক্য করার বিষয়টি নিজেই একটি নতুন সৃষ্ট বিষয় বা বিদয়াত নয়তো! এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিতে হলে আমাদের মাসালেহে মুরসালা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।

মাসালেহে মুরসালা (مصالح مرسلة)

মাসালেহ (مصالح) হলো, মাসলাহাত (مصلحة) শব্দের বহু বচন যার অর্থ কল্যাণময় ও উত্তম বিষয়। উসুলের পরিভাষায় মাসলাহাত বলতে বোঝায় এমন কিছু বিষয় যা মানুষ স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিতে কল্যানময় ও উত্তম হিসেবে মনে করে। আল্লাহ ﷻ মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মতো একটা বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন। তিনি মানুষকে জন্মগতভাবে কিছু নীতি-নৈতিকতা ও যুক্তি শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে সে অনেক বিষয়ে সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। একারণে দেখা যায় স্বাভাবিক বিবেক সম্পন্ন মানুষ সত্য কথা বলা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা, অসহায়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ইত্যাদি বিষয়কে উত্তম কাজ হিসেবে জানে। বিপরীত দিকে চুরি-ডাকাতি, ধোঁকা-প্রতারণা, হানাহানি-খুনোখুনি, জেনা-ব্যাভিচার ইত্যাদি বিষয়কে মানুষ স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমেই নিকৃষ্ট কাজ হিসেবে জানে। এই স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষের নিকট যা কিছু উত্তম বা অনুত্তম মনে হয় সেটাকেই উসুলের পরিভাষায় মাসলাহাত বা মাসালেহ বলা হয়। এক কথায় বলা যায় মাসালেহ অর্থ মানুষের অন্তরে সৃষ্ট স্বভাবিক যুক্তি।

এ বিষয়ে সকল ওলামায়ে কিরাম একমত যে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধির আলোকে চুড়ান্ত সিন্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক পন্থা নয় বরং আল্লাহর নাযিল করা শরীয়তের আলোকেই ভাল-মন্দ বিচার

করা হবে। কারণ অনেক সময় মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে কোনো কিছু উত্তম মনে হতে পারে কিন্তু শরীয়তে সেটা অনুত্তম হতে পারে আবার উল্টোও হতে পারে। আল্লাহ বলেন,

{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

এমন হতে পারে যে তোমরা কোনো বিষয়কে অপছন্দ করবে অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর কোনো বিষয়কে পছন্দ করবে অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না। [বাকারা/২১৬]

মোট কথা যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করে আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিধান অস্বীকার বা অপছন্দ করা যাবে না বরং বুঝে হোক বা না বুঝে হোক আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উদহারণস্বরুপ মানুষের যুক্তিতে মনে হয়, সুদ আর ব্যবসা একই বিষয় যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে মুলধনের তুলনায় অতিরিক্ত লাভ পাওয়া যায়। স্বাভাবিক যুক্তি ব্যবহার করে কেউ কেউ বলে, ডাক্তার সামান্য কিছু পরামর্শ দিয়ে রোগীর উপকার করলে তার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হয় তবে হাজার হাজার টাকা ঋণ দিয়ে উপকার করলে তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা অবৈধ হবে কেনো? এর সহজ উত্তর হলো আল্লাহ প্রথম প্রকারের উপকারের বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ করেছেন আর দ্বিতীয়

প্রকারের উপকারের বিনিময় গ্রহণ করা হারাম করেছেন। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কোনো যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করা যাবে না।

শরীয়তের এমন কিছু বিধানও রয়েছে যা স্বাভাবিক যুক্তির সাথে মিলে যায়। যেমন, মিথ্যা না বলা, চুরি-ডাকাতি না করা ইত্যাদি। সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে এসব ক্ষেত্রে যদিও শরীয়তের বিধান স্বাভাবিক যুক্তির সাথে মিলে যাচ্ছে তবু বিধানটি মুলত শরীয়তের নির্দেশের মাধ্যমেই প্রমাণিত হচ্ছে যুক্তির মাধ্যমে নয়। তবে সাধারনভাবে বলা যায় মানুষের স্বাভাবিক যুক্তি যখন শরীয়তের নির্দেশের সাথে মিলে যায় তখন তার উপর আমল করাতে দোষ নেই কিন্তু যখন তা শরীয়তের নির্দেশের বিপরীত হয় তখন তার উপর কোনোভাবেই আমল করা যাবে না

এই দুটি প্রকারের বাইরে এক প্রকার যুক্তি রয়েছে যার পক্ষে বা বিপক্ষে শরীয়তে কোনো প্রমাণ নেই। সেটা একদিকে যেমন শরীয়তের বিধানের বিপরীত নয় অন্যদিকে শরীয়তের বিধানে তার পক্ষে কোনো সমর্থনও নেই। এসব বিষয়ে সরাসরি তো নয়ই এমন কি কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমেও শরিয়তে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই ধরণের যুক্তিকে বলা হয় মুরসালা (مرسلة) বা মুতলাকা (مطلقة) অর্থাৎ ‘মুক্ত’ যুক্তি। ‘মুক্ত’ বলতে এখানে বোঝানো হয় শরীয়তের সাথে সম্পর্কহীন যুক্তি প্রমাণ। শরীয়তে এসব যুক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো উল্লেখ

পাওয়া যায় না বলে এগুলোকে মুক্ত যুক্তি বলা হয়। এর উদহারণে একটি প্রশিদ্ধ মাসয়ালার কথা উল্লেখ করা যায়। যদি কাফিররা যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বন্দিদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং অবস্থা এমন দাড়ায় যে, কাফিরদের দিকে তীর নিক্ষেপ করা হলে মুসলিমরা নিহত হবে আর তীর নিক্ষেপ না করলে কাফিররা মুসলিমদের উপর বিজয়ী হবে এবং ব্যাপক রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা ঘটাবে তবে বেশিরভাগ ফুকাহায়ে কিরাম তীর নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো যদি এই সকল বন্দি মুসলিমদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ না করা হয় তবে এর ফলস্রুতিতে কাফিররা মুসলিমদের উপর বিজয়ী হবে এবং ঐ সকল বন্দি মুসলিমদের সহ অন্যান্য মুসলিমদের হত্যা করবে এই অবস্থাটি হবে অধিক ক্ষতিকর। এই যুক্তিটি তথা অধিক সংখ্যক মুসলিমকে নিহত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য অল্প কিছু মুসলিমকে নিজে হাতে হত্যা করা যাবে কিনা এই যুক্তিটির স্বপক্ষে শরীয়তে স্পষ্টভাবে কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না আবার এটা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারেও শরীয়তে স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তবে অধিকতর ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য তুলনামূলকভাবে কম পরিমান ক্ষতিকে মেনে নেওয়া উত্তম এই যুক্তি অনুসরণ করে বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম এটার অনুমতি দিয়েছেন।

মোট কথা মাসালেহ অর্থ হচ্ছে স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি তথা

মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি আর মুরসালা অর্থ হচ্ছে ‘মুক্ত’ অর্থাৎ শরীয়তে তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং মাসালেহে মুরসালাহ (مصالح مرسلة) অর্থ এমন কিছু স্বাভাবিক যুক্তি যা শরীয়তের বিধানের বিপরীত নয় আবার শরীয়তের কোনো বিধানের মাধ্যমে সরাসরি বা কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রমাণিতও নয়। অর্থাৎ যেসব যুক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে শরীয়তে কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। মাসালেহে মুরসালা তথা সাধারন বিচার বুদ্ধিকে কোন বিধান প্রমাণের জন্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মাঝে ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে। এখানে সেসবের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয় তবে সংক্ষেপে বলা যায়, সাধারন অবস্থায় এ ধরণের যুক্তির উপর নির্ভর করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না যেহেতু মস্তিষ্ক-প্রসূত যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে নিশ্চিত কিছু প্রমাণিত হয় না। কিন্তু উপরে উল্লেখিত অবস্থার মতো জরুরী অবস্থায় অনেক সময় এধরণের যুক্তি প্রমাণের উপর নির্ভর করে অনেক গুরুতর বিষয়ের সমাধান করতে হয়।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয়টি হলো নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয়ে কিয়াস ও ইজতিহাদের মতো মাসালেহে মুরসালা তথা স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তবে কিয়াস ও ইজতিহাদের সাথে মাসালেহে মুরাসালার মৌলিক পার্থক্য হলো কিয়াস ও ইজতিহাদ কেবল তখন প্রযোজ্য হয় যখন

কোনো বিষয়ে শরীয়তের মুলনীতি পাওয়া যায়। যেমন সকল প্রকার নেশাদ্রব্য হারাম এই মুলনীতির আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল মাদক দ্রব্য হারাম প্রমাণিত হওয়া বা জেনা ব্যাভিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল প্রমাণের উপর গবেষণা করে পর পুরুষের বীর্য গ্রহণ করে সন্তান ধারন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। এসব বিষয় যদিও নতুন সৃষ্ট কিন্তু এগুলোর সমাধান মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তির আলোকে নয় বরং শরীয়তে বর্ণিত মুলনীতির আলোকেই করা হয়। কিন্তু মাসালেহে মুরাসালা বলতে বোঝায় এমন বিষয় যে সম্পর্কে শরীয়তে কোনো মুলনীতিই পাওয়া যায় না তাই সেখানে কিয়াস বা ইজতিহাদ প্রযোজ্য নয় বরং কেবলমাত্র স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধির আলোকে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অন্য কথায় বলা যায় কিয়াস ও ইজতিহাদ আসলে শরীয়তের বিধানের ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ আর মাসালেহে মুরসালা হলো শরীয়তের বিধানের অনুপস্থিতিতে মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি ব্যাবহার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। একারণে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া উম্মতে মুসলিমার সকল ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন। আর মাসালেহে মুরসালার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিকে বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম অপছন্দ করেছেন। যারা এটার অনুমতি দিয়েছেন তারাও বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে জরুরী অবস্থায় এর উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের

অনুমতি দিয়েছেন।

এতটুকু জেনে নেওয়ার পর তাদের কার্যকলাপে অবাক না হয়ে পারা যায় না যারা বিদয়াতের আলোচনাতে বারবার মাসালেহে মুরসালার বিষয়টি টেনে এনে পানি ঘোলা করার চেষ্টা করে। যখনই বলা হয় মোনাজাত বিদয়াত হলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বিদয়াত নয় কেনো? তারা বলে, মাদ্রাসা তো মাসালেহে মুরসালা। এভাবে তারা কুরআন সংকলন, হাদীসের গ্রন্থ প্রণয়ন, হাদীসের সহীহ জঈফ নির্ণয় করার মুলনীতি ইত্যাদি বিষয়াবলীকে মাসালেহে মুরসালা নামকরণ করে বিদয়াত থেকে আলাদা করার চেষ্টা করে। এদের বেশিরভাগই মাসালেহে মুরসালা কি জিনিস সে সম্পর্কে জানে না। উপরে আমরা বলেছি উসুলের পরীভাষায় মাসালেহে মুরসালা হলো ঐ সকল বিষয় যে সম্পর্কে শরীয়তে কোনো মুলনীতি পাওয়া যায় না। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থা, হাদীস শাস্ত্র, ফিকাহ শাস্ত্র, কুরআন সংকলন ইত্যাদি সকল বিষয় শরীয়তের মুলনীতির আলোকেই প্রমাণিত সুতরাং এগুলো মাসালেহে মুরসালার মধ্যে গণ্য করা স্পষ্ট বোকামী ছাড়া কিছু নয়। এসব বিষয় যদি মাসালেহে মুরসালার মধ্যে গণ্য হবে তবে কিয়াস ও ইজতিহাদের সাথে মাসালেহে মুরসালার কি পার্থক্য থাকে? কেনোই বা উম্মতে মুসলিমার ওলামায়ে কিরাম কিয়াস ও ইজতিহাদের ব্যাপারে একমত হওয়ার পরও মাসালেহে মুরসালার ব্যাপারে দ্বিমত করলেন?

তাছাড়া এসব বিষয়কে যদি মাসালেহে মুরসালার মধ্যে গণ্য করা হয় তবে তো প্রমাণিত হয় রাসুলের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর যত নতুন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সবই মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে, শরীয়তের মূলনীতির আলোকে নয়। আর এর মাধ্যমে আসলে ইসলামী শরীয়তকেই খাটো করা হয়। যেহেতু আল্লাহ ﷻ দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এর অর্থ কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে তার সমাধান এ দ্বীনের মধ্যে পাওয়া যাবে। একারণে বহু সংখ্যক আলেম শরীয়তের মুলনীতির বাইরে সাধারন যুক্তি প্রয়োগ করে তথা মাসালেহে মুরসালার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে বিধান নির্ণয় করার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেছেন। যারা এটার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তারাও সাধারন ভাবে এটা প্রয়োগের অনুমতি দেননি বরং জরুরী অবস্থায় এটার উপর নির্ভর করার অনুমতি দিয়েছেন। তাছাড়া আলেমদের কেউ কেউ এটাও বলেছেন যে আসলে এমন বিষয় খুঁজে পাওয়া অসম্ভব যে সম্পর্কে শরিয়তের কোনো মুলনীতিই নেই। কোনো একটি বিষয় নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যে কোনো ভাবে শরীয়তের সাথে সম্পর্কিত হবে। শরীয়তের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন বিষয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। উসুলবিদ ওলামায়ে কিরাম মাসায়েলে মুরসালার আলোচনায় যেসব উদহারণ উল্লেখ করেছেন গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সেগুলো শরীয়তের মুলনীতির

সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন নয়। কাফিররা যেসব মুসলিমকে ঢাল হিসেব ব্যবহার করে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপের ঘটনার উপর চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে শরীয়তের মুলনীতি পুরোপুরি অনুপস্থিত নয়। এখানে যদিও নির্দোষ মুসলিমকে লক্ষ্য করে তীর ছোড়া হচ্ছে যা হারাম কিন্তু এটা করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে যেহেতু তীর নিক্ষেপ না করলে কাফিররা মুসলিমদের উপর বিজয়ী হবে এবং বন্দি মুসলিমরা সহ অন্য সকল মুসলিমকে হত্যা করবে আর বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এধরণের জরুরী অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার বিধান ইসলামে রয়েছে। এ হিসেবে এ বিষয়ে একটি মূলনীতি শরীয়তে পাওয়া যায়। একারণে বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম মাসালেহে মুরসালাকে দলিল মনে না করা সত্ত্বেও এই মাসয়ালায় তীর নিক্ষেপ করা বৈধ বলেছেন। অর্থাৎ তারা কেবল মস্তিষ্কপ্রসূত বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে নয় বরং শরীয়তের মূলনীতির আলোকেই বিষয়টিকে বৈধ বলেছেন।

মোট কথা শরীয়তের মুলনীতির আলোকে প্রমাণিত কোনো বিষয় উসূলের পরিভাষায় মাসালেহে মুরসালা হিসেবে গণ্য নয়। তেমনটি হলে আল্লাহর রাসুলের ওফাতের পর শরীয়তের মূলনীতির আলোকে মুজতাহিদীনে কিরাম যত নতুন সমস্যার সমাধান করেছেন সবই মাসালেহে মুরসালা বলে গণ্য হতো। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। বরং মাসালেহে মুরসালার উদহারণ

খুবই কম। এর উদাহরণ হিসেবে যেসব বিষয়কে উপস্থাপণ করা হয় গভীর বিশ্লেষণ করলে সেসব ব্যাপারেও শরীয়তের মুলনীতি প্রমাণ করা যায়। এভাবে চিন্তা করলে মাসালেহে মুরসালার অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। একারণে বেশিরভাগ আলেম মাসালেহে মুরসালাকে স্বীকার করেন নি।

যাই হোক, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, কুরআন সংকলন, হাদীসের সহীহ জঈফ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়কে উসুলের পরিভাষায় মাসালেহে মুরসালা বলা সঠিক নয়।

এরপরও যদি এসব বিষয়কে মাসালেহে মুরসালা হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তবু এর মাধ্যমে কেবল এটাই প্রমাণিত হয় যে রাসুলুল্লাহ ﷺ করেন নি বা তার যুগে ছিল না এমন বিষয় স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিতে গ্রহণযোগ্য হলে তার উপর আমল করা যায়। সুতরাং এর মাধ্যমে দোয়া-মোনাজাত বা নবীর জন্মদিন পালন করার মতো বিষয়ের বৈধতাই প্রমাণিত হয়। য়েহেতু স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিতে যে কোনো মুসলিমের নিকট এগুলো উত্তম কাজ হিসেবেই গণ্য।

কেউ কেউ অবশ্য মাসালেহে মুরসালাকে একটু ভিন্নভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করে। আর এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ও দোয়া-মোনাজাত উভয় প্রকারের কর্মকান্ডের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনের চেষ্টা করে। তারা বলে, মাসালেহে মুরসালা ওসায়িল (وسائل) বা

মাধ্যম হিসেবে গন্য মাকাসিদ (مقاصد) তথা উদ্দীষ্ট বিষয় হিসেবে নয়। উদাহরণস্বরুপ আজান দেওয়াটা উদ্দেশ্য আর মাইক ব্যবহার করাটা হলো মাধ্যম। ইলম অর্জন করা হলো উদ্দেশ্য আর মাদ্রাসা হলো এর মাধ্যম বা পদ্ধতি। মাধ্যমের মধ্যে নতুন পদ্ধতি আসতে পারে কিন্তু উদ্দীষ্ট বিষয় তথা দ্বীনী বিধানটির মধ্যে কোনো নতুনত্ব আসবে না। পাঠক চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন একই কথা দোয়া-মোনাজাত বা রাসুলের জন্মদিন পালন করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেহেতু এখানে মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা বা রাসুলের আগমনে আনন্দিত হওয়া। এ উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠান করাকে পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নয়। একারণে দেখা যায় রাসুলের জন্ম দিনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। কোথাও হামদ বা নাত গেয়ে, কোথাও সীরাত সম্পর্কে আলোচনা করে, কোথাও হয়তো মানুষকে খাবার খাইয়ে ইত্যাদি। তাহলে মাসালেহে মুরসালার সূত্র অনুযায়ী রাসুলের জন্মদিনে খুশি হওয়া যদি উত্তম কাজ হয় তবে সে উদ্দেশ্যে যে কোনো বৈধ পদ্ধতি অবলম্বন দোষের কিছু হতে পারে না। একইভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের শেষে মোনাজাত করা সম্পর্কে কথা হলো এখানে আল্লাহর নিকট দোয়া করাই মূল উদ্দেশ্য। একজন দোয়া করা আর বাকিরা আমিন আমিন বলা একটা পদ্ধিত মাত্র। যদি কেউ বাড়ি ফিরে

এককী মোনাজাত করে বা মসজিদে বসেই অন্যান্য মানুষের সাথে মোনাজাতে শরীক না হয়ে আল্লাহর দরবারে নিজেই হাত তুলে মোনাজাত করে তবে তাকে তো কেউ নিষেধ করে না বরং সবাই বিশ্বাস করে এই ব্যক্তিও মোনাজাত করার সওয়াব পেয়ে গেছে। কারণ মানুষ এখানে মোনাজাত করার বিষয়টিকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করে মোনাজাত করার পদ্ধতিটি নয়। সুতরাং মাসালেহে মুরসালার সূত্র অনুযায়ী এটা বৈধ হওয়া উচিৎ। কিন্তু যারা মাসালেহে মুরসালার সূত্র প্রয়োগ করে এসব বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় তারা নিরোপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণে অভ্যস্ত নয় বরং নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো কোনো একটি বিষয়কে মাসালেহে মুরসালা নাম করণ করে বিদয়াত থেকে অব্যহতি প্রদান করা আর অন্য আরেকটি বিষয়কে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে সাধারন মুসলিমদের বিভ্রান্ত করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তারা মাসালেহে মুরসালাকে একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে মাত্র। যদি দেখা যায় মাসালেহে মুরসালার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না তবে তারা ভিন্ন কোনো পন্থা-পদ্ধতিতে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করবে। হয়তো বলবে, দ্বীনী কাজ তথা ইবাদত নতুন কোনো পন্থায় করা যাবে না তবে মুয়ামালাত ও আদাত তথা দুনিয়ায়ী বিষয় সমূহ নতুন নতুন পন্থায় করা যেতে পারে। পূর্বে আমরা

দ্বীন বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি আসলে প্রত্যেকটি বিষয় দ্বীনের বিধি-বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট। এমন কি বাস-ট্রাক, মোবাইল-কম্পিউটার ইত্যাদি আধুনিক সৃষ্ট বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহর দ্বীনে বিধি-বিধান রয়েছে অতএব এগুলো দ্বীনের বাইরে এমন মন্তব্য সঠিক নয়। এরপরও যদি মেনে নিই এগুলো দ্বীনের বাইরে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা কি দ্বীনী বিষয় নয়! তবে এক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন কেনো বিদয়াত হচ্ছে না? পবিত্র কুরআন কি দ্বীনী বিষয় নয়! তবে নতুন পদ্ধতিতে তথা কুরআনের মধ্যে নুকতা ও যের-যবর সংযোজন করে লেখা বিদয়াত হিসেবে গণ্য নয় কেনো? এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর তাদের নিকট নেই। তাদের চিন্তা-দর্শন অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। তারা কেবলই বলে, অমুক জিনিস আল্লাহর রাসুলের যুগে ছিল না সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল না। এসব যুক্তি ভূলভাবে উত্থাপন করে নানা রকম উত্তম ও পছন্দনীয় কার্যকলাপকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে। অথচ তারাই মাসালেহে মুরসালার নামে কিছু বিষয়কে বৈধ করে নেয়। এই দুটি প্রকারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে কোনো পার্থক্য বর্ণনা করতে তারা সক্ষম নয়। তবে তারা কিছু জটিল যুক্তি-তর্কের অবতারনা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে পারদর্শী।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে প্রমাণিত হয় মাসালেহে

মুরসালার নামে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, কুরআন সংকলন, হাদীস ও ফিকহের মূলনীতি প্রণয়ন, দোয়া-মোনাজাত, রাসুলের জন্মদিন পালন ইত্যাদি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য নিরূপন করা সম্ভব নয়। বরং চিন্তা করলে দেখা যাবে শরীয়তের মূলনীতির আলোকে এসব বিষয়ের বিধান একই। শরীয়তের মূলনীতিতে মাদ্রাসা, কুরআন সংকলন ইত্যাদি বিষয়ের মতোই দোয়া-মোনাজাত বা রাসুলের জন্ম দিন পালনও বৈধ প্রমাণিত হয়। যেহেতু উভয় প্রকারই শরীয়তের মুলনীতির আলোকে প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য। আর শরীয়তের মূলনীতির আলোকে গ্রহণযোগ্য কোনো বিষয় নতুন হলেও বর্জনীয় হবে না এটাই সঠিক কর্মপন্থা। রাসুলূল্লাহ ﷺ নিজে এবং তার সাহাবায়ে কিরাম এই মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের অনুসারী পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীনের পন্থাও ছিল এটা। রাসুলুল্লাহর সাহাবারা এমন অনেক নতুন বিষয়ের উপর আমল করেছেন যে ব্যাপারে সরাসরি রাসুল্লাহর নির্দেশ ছিল না। পরবর্তী যুগের ওলামায়ে দ্বীনও এমন অনেক বিষয়ের উপর আমল করেছেন যা আল্লাহর রাসুল করেন নি এবং সাহাবায়ে কিরাম করেন নি। এধরণের ঘটনার উদহারণ অনেক। আমরা এখানে তার কিছু অংশ উল্লেখ করবো যাতে পাঠক এবিষয়ে সঠিক মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম নিজ

উদ্যোগে যেসব কাজ করেছেন এবং পর্বর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলোর প্রশংসা করেছেন।

১. বেলাল ؓ এর প্রতিবার ওজু ছুটে গেলে ওজু করা এবং ওজুর পর সলাত আদায় করা।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বেলাল ؓ কে বললেন,

يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّة

হে বেলাল আমাকে বলো তুমি এমন কি আমল করো যার কারণে আমি জান্নাতে তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম?

এটা শুনে বেলাল ؓ বলেন, আমি যখনই ওযু করি ঐ ওযু দ্বারা যতটুকু সম্ভব নফল সলাত আদায়ের চেষ্টা করি।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে এসেছে, বেলাল ؓ বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ

হে আল্লাহর রাসুল আমি যখনই আজান দিই দু'রাকাত সলাত আদায় করি আর যখনই আমার ওযু ছুটে যায় তখনই ওযু করে নিই এবং আমি মনে করি (ওজু করার পর) আল্লাহর ওয়াস্তে দু'রাকাত সলাত আদায় করা একান্ত জরুরী।

একথা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (فبهما) তাহলে এদুটি কারণেই তুমি এমন মর্যাদা পেয়েছো।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাসান সহীহ গরীব। শায়েখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [মিশকাত/১৩২৬]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী বলেন,

ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي صلى الله عليه و سلم

এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে চিন্তা-গবেষণা করে ইবাদতের সময় নির্ধারন করে নেওয়া বৈধ যেহেতু উপরে যা বলা হয়েছে বেলাল ؓ সেটা নিজে চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করে নিয়েছিলেন পরে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার কাজকে সমর্থন করেছেন। [ফাতহুল বারী]

২. খুবাইব ؓ মৃত্যুর পূর্বে দু'রাকাত নফল সলাত আদায় করার রেওয়াজ চালু করেন।

উপরে আমরা দেখেছি খুবাইব ؓ সর্বপ্রথম বন্দি অবস্থায় নিহত মুসলিমদের জন্য দু'রাকাত সলাত আদায় করার রীতি চালু করেন । [সহীহ বুখারী]

৩. প্রতি রাকাতে কেরাতের শেষে সূরা ইখলাস পাঠ করা।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি কাহিনীতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ একজনকে আমীর করে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। উক্ত অভিযানের আমীর অন্যান্য লোকদের ইমাম হয়ে সলাত আদায় করার সময় প্রতিবার সূরা ইখলাস দিয়ে কিরাত শেষ করতেন। অর্থাৎ প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহা ও অন্য আরেকটি সূরা পড়ার পর সুরা ইখলাস পাঠ করতেন। পরে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে এমন করার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, (لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا) "এই সূরাটিতে রাহমানের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তাই আমি এটা (বারবার) তিলোয়াত করতে ভালোবাসি। এটা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ) "তাকে বলে দাও আল্লাহও তাকে ভালবাসেন"

৪. প্রতি রাকাতে কেরাতের শুরুতে সূরা ইখলাস পাঠ করা।

প্রাই একইধরণের ভিন্ন আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। আনাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, একজন আনসারী সাহাবী মসজিদে কুবাতে ইমামতি করতেন। তিনি (সূরা ফাতিহার পর) প্রথমেই সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। পরে তার সাথে আরো একটি সূরা

মিলিয়ে পড়তেন। অন্যান্য সাহাবারা তার উপর আপত্তি উত্থাপন করে বললেন,

إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا، وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى

তুমি প্রতিবার এই সূরাটি পাঠ করো কিন্তু এটাকে যথেষ্ট মনে না করে তার সাথে আরও একটা সূরা পাঠ করো। তুমি হয় শুধু এই সূরাটি তেলোয়াত করবে অথবা এটা বাদ দিয়ে অন্য একটা সূরা পাঠ করবে।

এটা শুনে উক্ত সাহাবী বলেন, (مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ) "আমি এই সূরা পাঠ করা পরিত্যাগ করবো না। তোমারা অপছন্দ করলে আমি তোমাদের ইমামতি করা বাদ দিয়ে দেবো।"

আনাস ﷺ বলেন,

وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُه

ঐ সকল লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি মনে করতেন বিধায় তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাদের ইমাম হোক তা পছন্দ করতেন না।

পরে রাসুলুল্লাহ ﷺ এ খবর শুনে উক্ত ব্যক্তিকে বলেন, "তোমার বন্ধুরা যা বলছে তা করতে তোমার সমস্যা কি? তিনি বলেন,

“আমি এই সূরাটিকে ভালবাসি”। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (حبك إياها أدخلك الجنة) “এই ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে” [সহীহ বুখারী]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাযার আল-আসক্কালানী বলেন,

يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي صلى الله عليه و سلم

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ ﷺ কে এমন করতে দেখেন নি একারণে তারা এই ব্যক্তির উপর আপত্তি উত্থাপন করেন।

তিনি আরো বলেন,

وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانا لغيره

এই হদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়- নিজের মন মতো কুরআনের কোনো অংশকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং সেটা বেশি-বেশি তিলাওয়াত করাতে দোষের কিছু নেই। এর মাধ্যমে অন্যান্য সূরা গুলোকে পরিত্যাগ (অপছন্দ) করা হচ্ছে বলে গণ্য হবে না। [ফাতহুল বারী]

*** রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে করেন নি কিন্তু করতে নিষেধ করেন নি এমন কাজ সুন্নাত হিসেবে গণ্য নয় আবার**

নিষিদ্ধও নয়। অর্থাৎ তাতে লিপ্ত হওয়া বৈধ কিন্তু রাসূলের সুন্নাতের উপর টিকে থাকাই উত্তম।

এই হাদীসের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, প্রথমত এই হাদিস প্রমাণ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করেন নি কেবল না করার কারণে সেটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না যদি সে বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা পাওয়া না যায়। এ ধরণের কাজে লিপ্ত হওয়া বৈধ তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমলের উপর টিকে থাকাই অধিক উত্তম। একারণে যে সাহাবা প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম তাকে নিবৃত করার চেষ্টা করেন কিন্তু যখন তিনি জিদ ধরে বসেন এবং প্রয়োজনে ইমামতি ছেড়ে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তখন তারা তাকে আর ঘাটান নি। তাকে বিদয়াতী আখ্যায়িত করে মসজিদ থেকে তাড়িয়েও দেন নি। বরং হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে তাকে তারা নিজেদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি মনে করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও তার এই কাজকে বিদয়াত বলেন নি বরং সওয়াবের কাজ হিসেবে অনুমতি প্রদান করেছেন। এই অনুমতি প্রদান সত্ত্বেও বিষয়টি কিন্তু সুন্নত হিসেব গণ্য নয় যেহেতু এটা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমল নয়। একারণে প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করার তুলনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বিভিন্ন রাকাতে বিভিন্ন সূরা পাঠ করতেন সেটাই উত্তম। কিন্তু প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করাও বৈধ।

ইবনে রজব আল-হাম্বালী বলেন,

وقد دل حديث أنس وعائشة على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينهه عن ذلك .ويدل على أنه ليس هو الأفضل ؛ لأن أصحابه استنكروا فعله وإنما استنكروه لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في صلاتهم

আনাস ﵁ এর এই হাদিসটি প্রমাণ করে সূরা ফাতেহার পরও ফরজ সলাতেও একই রাকাতে দুটি সূরা পাঠ করা বৈধ। যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ এই ব্যক্তিকে নিষেধ করেন নি। এই হাদীস এটাও প্রমাণ করে যে এই বিষয়টি অধিক উত্তম নয়। যেহেতু এটা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিয়মিত আমলের বিপরীত হওয়ার কারণে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম এর উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। [ফাতহুল বারী]

রাসুলুল্লাহ ﷺ যা কিছু করেন নি সেটাকে সুন্নাত বলা যাবে না কিন্তু যদি তিনি তা করতে নিষেধ না করেন তবে সেটাকে হারাম বা নিষিদ্ধও বলা যাবে না। বরং বলতে হবে বিষয়টি বৈধ কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমলের উপর টিকে থাকাই উত্তম। এই মূলনীতি সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষ গাফেল। তারা কেবল রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন নি বা সাহাবায়ে কিরাম করেন নি এই স্লোগান তুলে বিভিন্ন বিষয়কে নিষিদ্ধ বিদয়াতের আওভূক্ত করে সাধারন মুসলিমদের সাথে গন্ডোগোল সৃষ্টি করে থাকে। যারা

পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের শেষে মোনাজাত করে আমরা তাদের বলবো, এটা সলাতের অংশ নয় এমনকি সুন্নাতও নয় তবে এটা বৈধ। যদি কেউ মোনাজাতকে সলাতের অংশ মনে করে বা সুন্নাত মনে করে তাহলে এটা বিদয়াত হবে একইভাবে যদি কেউ সলাতের পর মোনাজাতকে নিষিদ্ধ মনে করে তবে এটা বৈধ বিষয়কে হারাম করা তথা দ্বীনের ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কারণে বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা স্বীকার করে মোনাজাত ফরজ নয়, সুন্নতও নয় আবার নিষিদ্ধও নয় তারা কখনও বিদয়াতী হিসেবে গণ্য হতে পারে না যেহেতু তারা এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের উপরই রয়েছে। এখন যদি এসব স্বীকার করে নেওয়ার পরও কেউ মোনাজাত পরিত্যাগ করতে না চায় তবে তাকে বিদয়াতী আখ্যা দেওয়া যাবে না। এমন বলা যাবে না যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয় মোনাজাতকে ফরজ মনে করে তা না হলে এটা পরিত্যাগ করতে রাজি হচ্ছে না কেনো। যেহতু উক্ত সাহাবীও নিজের আমলের উপর জিদ ধরে টিকে ছিলেন। তিনি ইমামতি পরিত্যাগ করতে রাজি ছিলেন কিন্তু সূরা ইখলাস পাঠ করা পরিত্যাগ করতে চান নি। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও তাকে বিদয়াতী আখ্যায়িত করে মসজিদ থেকে বের করে দেন নি। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও তাকে সূরা ইখলাস পাঠ করা বন্ধ করতে আদেশ করেননি।

কোনো কোনো এলাকাতে জুমুয়ার দিন (আজানের পর) বিভিন্ন

রকম দোয়া-দরুদ পাঠ করে মানুষকে জুময়ার নামায সম্পর্কে সতর্ক করার রেওয়াজ ছিল। এ ঘটনা উল্লেখ করে ইবনে হাযার আসক্বালানী বলেন, (واتباع السلف الصالح أولي) “এ বিষয় পূর্ববর্তী নেককার লোকেরা যা করতো সেটা করায় উত্তম।” [ফাতহুল বারী] অর্থাৎ এভাবে দোয়া ও যিকিরের মাধ্যেম ডাকা-ডাকি না করে কেবল আজানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই উত্তম। এ ফতোয়াটিও পূর্বে আমরা যা কিছু বলেছি তার সাথে সমার্থপূর্ণ যেহেতু তিনি বিষয়টিকে নিষিদ্ধ বলেন নি আবার এটাকে অধিক উত্তমও মনে করেন নি।

৫. রুকু থেকে উঠে দাড়িয়ে অতিরিক্ত দোয়া করা।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। রুকু থেকে মাথা তোলার পর পর পিছন থেকে একজন- রব্বানা লাকাল হামদ বলে একটু বাড়িয়ে বলে, হামদান কাছিরান তায়্যিবান মুবারাকান ফিহি। সলাত শেষ করে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, একথা কে বলল? সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে এসেছে এ প্রশ্নের কেউ কোনো উত্তর দিলো না। রসুলুল্লাহ ﷺ আবার বলেন, কে একথা বলল? এটা কোনো খারাপ কথা নয়। এবার একজন ব্যাক্তি বলল, আমি একথা বলেছি হে আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّل

আমি দেখলাম ত্রিশের অধিক ফেরেশতা প্রতিযোগিতা করছে কে আগে এই কথার সওয়াব লিখতে পারে।

এটা স্পষ্ট যে, রব্বানা লাকাল হামদ এর পরের অংশটুকু উক্ত সাহাবী নিজ থেকে বলেছিলেন। তা সত্ত্বেও সেটা আল্লাহর নিকট এমন উত্তম আমল হিসেবে গণ্য হয়েছে যা ফেরেশতারা দ্রুত লিখে নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। যেহেতু সে যা বলেছে তা হুবহু কুরআন-হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও শরীয়তের মানদন্ডে উত্তম হিসেবে বিবেচিত।

৬. তাকবীরে তাহরিমার পর কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলা।

উপরের ঘটনাটির অনুরুপ একটি ঘটনা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। রসুলুল্লাহ ﷺ জামাতে সলাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি হাজির হয়ে সলাতে শরীক হয়। তাকবীরে তাহরীমার সময় সে কেবল আল্লাহ আকবার না বলে একটু বাড়িয়ে বলে, (اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাছিরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসিলা।

পরে রাসুলুল্লাহ ﷺ উক্ত ব্যক্তিকে প্রশংসা করে বলেন, (عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ) "এই কথাটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এর জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আহমাদ ও তিবরানীর বর্ণনাতে এসেছে উপস্থিত জনতা বিষয়টি দারুন অপছন্দ করে এবং বলে, কে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কথার তুলনায় উঁচু গলায় কথা বলল? কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রশংসা করে উক্ত কথা বলেন।

এই বর্ণনাটি সম্পর্কে আল-হাইছামী বলেন, (رجاله ثقات) "এর রাবীরা বিশ্বস্ত" শায়েখ আলবানীও বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন [সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব-৫১৮]

৭. হজের তালবিয়াতে অতিরিক্ত শব্দ যোগ করা।

আবু দাউদ শরীফের একটি বর্ণনাতে এসেছে, জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ رضي الله عنه বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের হজ্জের তালবিয়া পাঠ শিক্ষা দেন। এরপর তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর শেখানো তালবিয়াটি উল্লেখ করেন এবং বলেন, মানুষ তার মধ্যে জাল মায়ারিজ (ذا المعارج) বা এই জাতীয় যে কোনো শব্দ যোগ করে নিচ্ছিল আর রসুলুল্লাহ ﷺ শুনছিলেন কিন্তু কিছুই বলছিলেন না।

শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, [সহীহু আবি দাউদ-১৫৯৮]

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর তালিবয়া উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে,

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا: " لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ،

وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ এর মধ্যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে বলতেন, লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক ওয়াল খায়রু বিইয়াদাইদ, লাব্বাইক ওয়ার রাগবা ইলাইক ওয়াল আমাল''

৮. হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলে অতিরিক্ত দোয়া করা।

একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে সলাতে থাকা অবস্থায় হাঁচি দিয়ে শুধুমাত্র আলহামদু লিল্লাহ না বলে একটু বৃদ্ধি করে বলে, (الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى) আলহামদু লিল্লাহি হামাদান কাছিরান, তায়্যিবান মুবারাকান ফিহি আলাইহি কামা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা। এটা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, কে এটা বলল? প্রথমবার কেউ কোনো কথা বললো না পরে তিনি আবার প্রশ্ন করলে উক্ত ব্যক্তি বলল, আমি। রসুলুল্লাহ ﷺ উক্ত ব্যক্তির প্রশংসা করে বলেন, আমি দেখলাম ত্রিশের কিছু অধিক ফেরেশতা প্রতিযোগিতা করছে কে এটা নিয়ে আকাশে উঠতে পারে। [আবু দাউদ, তিরমিযী]

তিরমিযী বলেন, হাদিসটি হাসান। ইবনে হাযার আসক্কালানী ফাতহুল বারীতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন, (سنده لا بأس به) এর সনদে কোনো সমস্যা নেই। শায়েখ আলবানীও হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন [মিশকাত/৯৯২]

৯. নিজ থেকে বানিয়ে উত্তম ভাষায় দোয়া করা।

তিরবানী বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন গ্রাম্য লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে সলাত আদায় করছিলো। সে আল্লাহর প্রশংসা করে বলছিল,

يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه

হে সেই সত্তা যাকে চোখে দেখা যায় না কল্পণায় ধারন করা যায় না। তার বৈশিষ্ট বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। সময়ের আবর্তনে তার মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। কখনও তিনি কোনো সমস্যায় পতিত হওয়ার ভয় করেন না। তিনি পাহাড়ের বড়ত্ব ও সমূদ্রের সীমানা সম্পর্কে অবহিত। তিনি বৃষ্টির পানির ফোটার সংখ্যা, গাছের পাতার সংখ্যা আর রাত যত বস্তুকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে ফেলে আর দিবস যত বস্তুকে আলোকিত করে সে সম্পর্কে অবহিত। একটি আকাশ তার সামনে অন্য আকাশকে আড়াল করে না। মাটির একটি স্তর তার নিকট অন্য স্তরকে আড়াল করতে পারে না। সমূদ্র তার গভীরে যা আছে সেটা তার নিকট গোপন করতে পারে না, পাহাড় তার দূর্গম এলাকাতে কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না। তুমি আমার

জীবনের শেষ অংশকে সর্বোত্তম করো, এবং জীবনের শেষ ভাগে আমার আমলকে সুন্দর করো আর আমার জন্য তোমার সাক্ষাতের দিনটিকে সর্বোত্তম করো।

রসুলুল্লাহ ﷺ এ দোয়া শুনে মুগ্ধ হন। তিনি এই ব্যক্তিকে কিছু দিনার উপহার দেন এবং বলেন, বলো তো আমি তোমাকে এই দিনারগুলো কেনো উপহার দিলাম? ঐ ব্যাক্তি বলে, আমি আপনার আত্মীয় তাই। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إن للرحم حقا ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز و جل

আত্মীয়তার হক তো রয়েছেই তবে তুমি যে আল্লাহকে অতি উত্তমভাবে প্রশংসা করেছো সে কারণে আমি তোমাকে উপহার দিয়েছি।

হাদিসটি ইমাম তিবরানী মু'জামে আওসাতে বর্ণনা করেছেন। আল-হাইছামী বলেন,

ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد أبي عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة

এই হাদিসের রাবীরা সহীহ হাদিসের রাবী শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ছাড়া তবে সেও বিশ্বস্ত।

এই সকল হাদিস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সলাতের ভিতরে বা বাইরে তাকবিরে তাহরিমা, রুকু থেকে উঠে বা হাঁচি দেওয়া ইত্যাদি উপলক্ষ্যে অথবা সাধারনভাবে দোয়া ও যিকির হিসেবে

নিজে থেকে কিছু উত্তম কথা ব্যাবহার করা বা রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত মা'ছুর দোয়ার মধ্যে কিছু উত্তম শব্দ যোগ করা দোষনীয় নয়।

রকু থেকে উঠে দোয়া করা সংক্রান্ত হাদিসটির ব্যাখ্যায় ইবনে হাযার আল-আসক্কালানী বলেন,

واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير ماثور إذا كان غير مخالف للمأثور وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه

এই হাদিস প্রমাণ করে, সলাতের মধ্যেও রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়নি এমন যিকির রচনা করা বৈধ এবং উঁচু স্বরে যিকির করা বৈধ যদি অন্যদের ইবাদতে সমস্যা সৃষ্টি না হয়। [ফাতহুল বারী]

* নিজ থেকে দোয়া ও যিকিরের কিছু যোগ করা যারা বিদয়াত বলে তারা নিজেদের পক্ষে যেসব দলিল পেশ করে সেগুলোর জবাব।

উপরে আমরা যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি সেগুলো ঐ সকল লোকদের বিপক্ষে দলীল যারা হাদীসে বর্ণিত নেই এমন কোনো দোয়া বা যিকির মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা বিদয়াত মনে করে। আজানের দোয়াতে (إنك لا تخلف الميعاد) "নিশ্চয় আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।" দরুদ পাঠ করার সময় সায়্যিদানা ওয়া মাওলানা

যোগ করা, এমনকি সাধারনভাবে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করাও এদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত বিদয়াত হিসেবে গণ্য। তাদের মতে কুরআন-হাদীসে এসব বিষয় সরাসরি উল্লেখ নেই তাই এগুলো বিদয়াত। এ বিষয়ে তারা একটি হাদিস গুরুত্ব সহকারে উত্থাপন করে থাকে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে পাঠ করার জন্য একটি দোয়া শিক্ষা দেন। তার একটি অংশ এমন,

اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْت

হে আল্লাহ আপনি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার উপর আমি বিশ্বাস স্থাপণ করেছি এবং যে নবীকে আপনি প্রেরণ করেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপণ করেছি।

পরে উক্ত ব্যক্তি একটু পরিবর্তন করে যে নবীকে আপনি প্রেরণ করেছেন এভাবে না বলে, যে রাসূলকে আপনি প্রেরণ করেছেন এভাবে বললে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলেন, এভাবে নয় বরং বলো, যে নবীকে আপনি প্রেরণ করেছেন।

এই হাদিসটি উল্লেখ করে তারা বলেন, অতএব বোঝা গেলো নিজ থেকে কোনো দোয়া বা যিকির তৈরী করা যাবে না।

এসব লোকদের সমস্যা হলো এরা নিজেদের মতের স্বপক্ষে কোনো হাদিস পেয়ে গেলে রাতদিন কেবল সেই হাদিসের যিকির করে। অবস্থা দেখে মনে হয় এই হাদিসটি ছাড়া হাদিসের

গ্রন্থসমূহে আর কিছু বর্ণিত হয় নি। তবে কি উপরে যেসব হাদিস আমরা বর্ণনা করেছি সেগুলো সব বানোয়াট? কোনো সত্যান্বেষী ব্যক্তি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে এধরণে নীতি অবলম্বন করেন না। দু-একটি হাদীসকে নিজের মতের স্বপক্ষে ব্যবহার করে অন্যান্য হাদিসগুলো গোপন করা তাদের অভ্যাস নয় বরং তারা বিভিন্ন প্রকার হাদিস একত্রিত করে সেগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধানের চেষ্টা করেন। এখন আমরা দেখবো শেষোক্ত হাদিসটির সাথে উপরের হাদিসগুলোর সমন্বয় কিভাবে হতে পারে। এটা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়। প্রকৃত ব্যাপার হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ যখন যিকির বা দোয়া হিসেবে কোনো শব্দ শিক্ষা দেন তখন উক্ত শব্দ পরিবর্তন করা উচিৎ নয়। যেহেতু ঐ বিষয়টির পরিপূর্ণ সওয়াব ঐ শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আসক্বালানী এমন কথাই বলেছেন। ইমাম নাব্বীও অনুরূপ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য ওলামায়ে কিরামও দোয়া ও যিকিরের শব্দ পরিবর্তন করা অপছন্দ করেছেন। কিন্তু মুল দোয়াটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন না করে বাড়তি কিছু যোগ করা হলে তাতে কোনো সমস্যা নেই যেহেতু এতে এক দিকে উক্ত দোয়াটির সওয়াব হাসিল হচ্ছে বিপরীত দিকে বাড়তি কথাগুলোর সওয়াব পাওয়া যাচ্ছে। উপরে আমরা যতগুলো উদাহরণ উল্লেখ করেছি তার কোথাও রসুলুল্লাহ ﷺ এর শেখানো মূল দোয়াটি পরিবর্তন করা হয়নি বরং তার সাথে বাড়তি কিছু

উত্তম কথা যোগ করা হয়েছে তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেন নি উপরন্তু এগুলোর প্রশংসা করেছেন। শেষোক্ত ঘটনটিতে ভিন্ন অবস্থা দেখা যায়। এই ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ এর শেখানো শব্দ "যে নাবীকে আপনি প্রেরণ করেছেন" এটা পরিবর্তন করে "যে রাসূলকে আপনি প্রেরণ করেছেন" এভাবে বলেছে তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে সংশোধন করে দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যার পর এ বিষয়ে আর কোনো জটিলতা অবশিষ্ট থাকে না।

কিছু কিছু সাহাবায়ে কিরাম থেকে মাওকুফভাবে এমন বর্ণনা রয়েছে যা বাহ্যত উপরের বর্ণনাগুলোর বিপরীত মনে হয়। যেমন,

ক. আবু মুসা আল-আশয়ারী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মানুষদের নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। এমন সময় পিছন থেকে কোনো একজন ব্যক্তি বলে ওঠে, (أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ) "পবিত্রতা ও পূন্য দ্বারা সলাতকে শীতল করা হয়েছে" [সহীহ মুসলিম] আবু মুসা আল আশয়ারী পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলেন, সলাতে কি বলতে হয় তা কি তোমরা জানো না? রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের সলাত শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ সলাতে কি বলতে বা করতে আদেশ করেছেন তা বর্ণনা করেন।

খ. আবু দাউদ শরীফের একটি বর্ণনাতে এসেছে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه তার ছেলেকে বলতে শোনেন, "হে আল্লাহ

আমি আপনার নিকট জান্নাত এবং তার নেয়ামত ও সুখ-শান্তি কামনা করছি আর জাহান্নাম ও তার শিকল, বেড়ি ইত্যাদি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটা শুনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﵁ বলেন,

سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ، وَإِنْ أُعِذْتَ مِنَ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا، وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّر

আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি শীঘ্রই এমন কিছু লোক হবে যারা দোয়ার মধ্যে বাড়া-বাড়ি করবে। তুমি যেনো তাদের মতো হয়ো না। যদি তোমাকে জান্নাত দেওয়াই হয় তবে তো তার মধ্যে যা কিছু নেয়ামত আছে তা তুমি প্রাপ্ত হবে আর যদি জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দেওয়া হয় তবে তো তোমাকে তার সকল ক্ষতিকর বস্তু থেকে আশ্রয় দেওয়া হবে।

অর্থাৎ কেবল জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রই প্রার্থনা করাই যথেষ্ট। নাম ধরে জান্নাতের প্রতিটি বস্তু প্রার্থনা করা বা জাহান্নামের প্রতিটি বস্তু থেকে আশ্রই চাওয়া জরুরী নয়।

ইবেন মাযার একটি বর্ণনাতে আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল ﵁ থেকে বর্ণিত আছে তিনি তার ছেলেকে বলতে শুনলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ

হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট জান্নাতের ডান পাশে একটি

সাদা প্রাসাদ প্রার্থনা করছি।

এটা শুনে তিনি তাকে নিষেধ করেন এবং উপরোক্ত হাদিসটি শুনিয়ে দেন।

গ. আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল رضي الله عنه থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি তার ছেলেকে সলাতে সশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ করতে শুনে নিষেধ করে বলেন, এটা নতুন সৃষ্ট বিষয়। আমি আল্লাহর রাসুল, আবু বকর, উমর ও উসমানের পিছনে সলাত আদায় করেছি। আমি তাদের কাউকে এভাবে পড়তে শুনি নি। তুমিও তা পাঠ করো না।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদিসটি হাসান তবে শায়েখ আলবানী এটিকে দূর্বল বলেছেন।

ঘ. তিবরানী মু'জামে কাবীরে এবং আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেন, ইবেন মাসউদ رضي الله عنه একবার কিছু লোককে মসজিদে বসে বিভিন্ন রকম যিকির করতে শোনেন। তিনি তাদের বলেন, তোমরা কি রসুলের সাহাবাদের চেয়ে বেশি জেনে ফেলেছো? এরপর তিনি তাদের মজলিস ভেঙে দেন।

অনেকে এই সকল বর্ণনা উল্লেখ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু শরীয়তের মূলনীতি সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদের নিকট এই বিভ্রান্তির সুপষ্ট জবাব রয়েছে।

এ বিষয়ে প্রথমেই আমরা বলবো, যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে কোনো বিষয়ের অনুমতি প্রদান করার কথা বর্ণিত হয় আর তার বিপরীতে কোনো কোনো সাহাবার একক বর্ণনা পাওয়া যায় তবে কোনটি অগ্রাধিকার পাওয়ার বেশি যোগ্য? এ প্রশ্নের সহজ ও সঠিক উত্তর হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত বিধানই এখানে অগ্রাধিকার পাবে। আর যে সাহাবা থেকে ভিন্ন মত পাওয়া যাচ্ছে তা পরিত্যাগ করতে হবে। ধরে নিতে হবে উক্ত সাহাবা এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসুলের নির্দেশ সম্পর্কে জানতেন না। এটা মোটেও অসম্ভব নয় যে কোনো একজন সাহাবী রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কোনো একটি নির্দেশ সম্পর্কে জানবেন না। যেহেতু এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যাতে দেখা যায় আবু বকর বা উমর رضي الله عنه এর মতো সাহাবী কোনো কোনো বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ জানতেন না। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম সে সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। উপরে একটি হাদীসে আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে যে তালবিয়া পাঠ করতে বলেছিলেন তারা তার তুলনায় কিছু অতিরিক্ত পাঠ করতেন। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। সেখানে বলা হচ্ছে মানুষ ‘‘জাল মায়ারিজ’’ শব্দ যোগ করছিল আর রসুলুল্লাহ ﷺ শুনছিলেন কিন্তু কিছুই বলছিলেন না। বাইহাকী ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থকার বর্ণনা করেন, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের

সামনে একদল লোক তালবিয়ার সময় যাল মায়ারিজ শব্দ উচ্চারণ করলে তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের যুগে এভাবে তালবিয়া পাঠ করতাম না। ইবনে খুযাইমা বলেন, এটা প্রমাণ করে অনেক সময় প্রথম যুগের কোনো সম্মানিত সাহাবার নিকট আল্লাহর রাসূলের কোনো আমল অজানা থাকতে পারে। যেহেতু জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বয়সে ও ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে সাদ ইবেন আবি ওয়াক্কাস ﷛ অপেক্ষা ছোট হওয়া সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ ﷺ এর সামনে তালবিয়াতে যাল মায়ারিজ শব্দ উল্লেখ করার কথা বর্ণনা করেছেন কিন্তু সা'দ ﷛ এটা জানতেন না। এখন প্রশ্ন হলো, সত্যান্বেসী গবেষকের জন্য কোনটি অধিক শ্রেয় আল্লাহর রাসূল থেকে প্রমাণিত বিষয়টি অনুসরণ করা নাকি সা'দ ﷛ এর মত অনুসরণ করে তালিবয়ার মধ্যে "যাল-মায়ারিজ" শব্দ ব্যাবহার করা বিদয়াত মনে করা! তিরমিযী বর্ণনা করেন, ইবনে উমর ﷛ একজন ব্যক্তিকে হাঁচি দেওয়ার পর বলতে শোনেন, আলহামদু লিল্লাহি ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ। এটা শুনে তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের এমন শেখান নি তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, আল-হামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। যদি এই হাদিসটির উপর ভিত্তি করে কেউ বলে, হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদু লিল্লাহ বলে নিজ থেকে কিছু যোগ করা বিদয়াত তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত ঐ হাদিসটির ব্যাখ্যা কি হবে যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসুলের সামনে

একজন ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলে, আলহামদু লিল্লাহি হামাদান কাছিরান, তায়্যিবান মুবারাকান ফিহি আলাইহি কামা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা। এটা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ তার প্রশংসা করেন। একইভাবে আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে প্রমাণ পেয়েছি যে, তিনি সলাতের ভিতরে বা বাইরে যে কোনো উত্তম কথা উচ্চারণ করার কারণে তিরষ্কার করেন নি। কিন্তু আবু মুসা আল আশয়ারী رضي الله عنه একজন ব্যক্তিকে এ থেকে নিষেধ করেন। একারণে কি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশনা পরিত্যাগ করে বিষয়টিকে বিদয়াত ও পথভ্রষ্টতা বলা সঠিক হবে? রসুলুল্লাহ ﷺ দোয়ার মধ্যে অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করেছেন। এর উপর ভিত্তি করে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه তার ছেলেকে জান্নাত, জান্নাতের নেয়ামত, জান্নাতের সুখ শান্তি প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম, জাহান্নামের বেড়ি ও শিকল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এভাবে দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। একারণে যদি কেউ মনে করে নিজ থেকে বানিয়ে বানিয়ে উত্তম দোয়া করা নিষিদ্ধ তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ যে গ্রাম্য লোককে নিজ থেকে বানিয়ে সুন্দর ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা করা এবং নিজের জন্য দোয়া প্রার্থনা করার বিনিময়ে কিছু দিনার উপহার দিয়েছিলেন তার কি ব্যাখ্যা হবে! আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল رضي الله عنه তো জান্নাতের ডান দিকে একটি প্রসাদ নির্মাণ করার ব্যাপারটিকে অপছন্দ করেছেন। অথচ ফেরাউনের স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ سبحانه وتعالى নিজেই

বলেন,

{إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}

যখন সে বলেছিল, হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য জান্নাতের ভিতরে আপনার নিকটে একটি বাড়ি নির্মাণ করুন আর আমাকে ফিরআউন থেকে এবং তার সকল কার্যাবলী থেকে পরিত্রাণ দিন। আপনি আমাকে জালেম সম্প্রদায় হতে পরিত্রাণ দিন। [তাহরীম/১১]

একথা বলা কি যৌক্তিক হবে যে, এই নেককার মহিলার জান্নাতের মধ্যে একটি প্রাসাদ নির্মাণের জন্য দোয়া করাটা অতিরঞ্জন বলে গণ্য? একইভাবে ফিরাউনের থেকে, তার কার্যাবলী থেকে এবং সকল জালেম সম্প্রদায় থেকে আমাকে পরিত্রাণ দিন এভাবে বলাটা কি অতিরঞ্জন বলে গণ্য হবে? এতটকু বললেই তো যথেষ্ট হতো যে আমাকে সকল জালেমের হাত থেকে রক্ষা করুন।

মোট কথা কোনো সাহাবার একক মন্তব্য পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে বিপরীত মনে হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটিই সর্বসম্মত মূলনীতি।

ইবনে মাসউদ ﵁ এর হাদিসটির অবস্থাও অনুরূপ। যদি

হাদিসটি সহীহ হয় এবং ধরে নেওয়া হয় কেবলমাত্র মসজিদে বসে সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ ইত্যাদি যিকির করার কারণে তিনি ঐ সকল লোকদের মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছিলেন তবে এটা রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত একাধিক হাদীসের বিপরীতে যায় যেখানে একত্রিত হয়ে যিকির-আযকার করার অনুমতিই শুধু দেওয়া হয় নি বরং বিষয়টির সুউঁচ্চ সম্মান বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ

আল্লাহর এমন কিছু ফেরেশতা রয়েছে যারা রাস্তা-ঘাটে ঘুরে ঘুরে যিকিরের মজলিস তালাশ করে। যখন তারা একদল লোককে আল্লাহর যিকির করতে দেখে একে অপরকে ডেকে বলে, এদিকে এসো তোমরা তো এই জিনিসই খুঁজছিলে।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন এরপর ফেরেশতারা ডানামেলে এ যিকিরের মজলিসকে ঘিরে ধরে এবং স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌছে যায়।

এরপর ফেরেশতারা যখন আল্লাহর নিকট ফিরে যায় আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করেন, আমার বান্দারা কি করছিল? তারা বলেন,

يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ

তারা আপনার উদ্দেশ্যে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহ আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাহ) হামদ (আল হামদু লিল্লাহ) বলছিল।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم

তোমরা সাক্ষী থাকো যে আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

ফেরেশতরা তখন বলবেন, অমুক ব্যক্তি তো আসলে যিকিরের উদ্দেশ্যে ওখানে বসে নি। সে একটা (দুনিয়াবী) কাজে এসে আটকা পড়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতারা জানতে চাইবেন যিকিরের নিয়তে না থাকা সত্ত্বেও কি এই ব্যক্তি ক্ষমা পাবে? আল্লাহ ﷻ বলবেন,

هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُم

ওরা তো এমন সম্প্রদায় যাদের সাথে বসলেও কেউ বঞ্চিত হয় না। [বুখারী ও মুসলিম]

এ বিষয়ে এই হাদীসটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই হাদীস একাকী আল্লাহকে স্বরণ করার তুলনায় কোনো একটি দ্বীনী মজলিসে আল্লাহকে স্বরণ করার একটি বিশেষ ফজিলত প্রমাণ করে। যার নিয়তের মধ্যে ত্রুটি আছে বা দ্বীনী কর্মকান্ড তথা নেক

আমলে মন বসে না এমন ব্যক্তি যদি অন্যান্য নেককার লোকদের সাথে সম্মিলিত হয় তবে তাদের ওসীলায় তার আমলও কবুল হয়ে যায় এবং সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। এরচেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে! এ ধরনের কাজ থেকে মানুষকে কিভাবে নিষেধ করা যেতে পারে?

এছাড়া উপরে আমরা একটি হাদীসে কুদসী উল্লেখ করেছি যেখানে আল্লাহ বলেন, “যে আমাকে নির্জনে স্মরণ করে আমিও তাকে নির্জনে স্মরণ করি আর যে আমাকে কোনো মজলিসে স্মরণ করে আমি তাকে তদাপেক্ষা উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। [সহীহ বুখারী]

সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনাতে এসেছে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَه

যখন একদল লোক আল্লাহর ঘর সমূহের মধ্যে কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লহরক কিতাব তিলওয়াত করে এবং নিজেদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহর রহমত তাদের বেষ্টন করে আর ফেরেশতারা তাদের ঘিরে ধরে এছাড়া মহান রব তার নিকট যেসব ফেরেশতা আছে তাদের সাথে ঐ সকল লোকদের নিয়ে আলোচনা করেন।

[সহীহ মুসলিম]

সহীহ মুসলিমের আরেকটি বর্ণনাতে এসেছে, মুয়াবিয়া ﵁ একদিন বাইরে বের হয়ে দেখলেন মসজিদের মধে একটি হালাকা (বৈঠক)। তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমরা এখানে কি জন্য বসেছো? তারা বললেন, (جلسنا نذكر الله) "আমরা আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য বসেছি"

মুয়াবিয়া ﵁ বললেন, "আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের প্রশ্ন করছি এছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নেই তো!" তারা বললেন, আল্লাহর কসম এছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই। মুয়াবিয়া ﵁ বললেন, "আমি তোমাদের কথা অবিশ্বাস করার কারণে কসম করতে বলি নি। আসল ঘটনা হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন তার কিছু সাহাবাকে একটি বৈঠকে বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করেন তোমরা এখানে কেনো বসেছো? তারা বলেন, আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য এবং তিনি যে আমাদের ইসলামের বুঝ দিয়েছেন সেকারণে তার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি এ ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নেই তো! তারা বললেন, আল্লাহর কসম এ ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নেই। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ

আমি তোমাদের কথাকে অবিশ্বাস করার কারণে কসম করতে বলিনি। বরং জিব্রাইল ﷺ এই মুহূর্তে আমাকে বলে গেলেন যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করছেন।

[সহীহ মুসলিম]

আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فارتعوا في رياض الجنة قالوا و أين رياض الجنة قال مجالس الذكر

তোমরা জান্নাতের বাগানে বিচরণ করো। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, জান্নাতের বাগান কোথায়? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, যিকিরের মজলিসসমূহ। [মুস্তাদরাকে হাকিম]

হাকেম বলেন, হাদিসটি বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ। আল-হাইছামী বলেন, এই হাদীসের রাবী আমর ইবনে আব্দুল্লাহকে কেউ বিশ্বস্ত বলেছেন কেউ দূর্বল বলেছেন, অন্যান্য রাবীরা বিশ্বস্ত।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

غنيمة مجالس الذكر الجنة

যিকিরের মজলিসের গনিমত (পুরষ্কার) হলো জান্নাত।

আল-হাইছামী এই হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন। শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [সহীহা/৩৩৩৫]

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইবনে মাসউদ ﵁ কেবল মাত্র একত্রিত হয়ে যিকির করার কারণে এই সকল লোকদের মসজিদ থেকে বের করে দেন নি। এখানে অন্য কোনো কারণ ছিল। বেশ কিছু রেওয়ায়েতে এ বিষয়ে প্রমাণও পাওয়া যায়। ইমাম নাব্বীর শায়েখ আবু শামা তার গ্রন্থ 'আল-বায়িছ আলা ইনকারীল বিদায়ি ওয়াল হাওয়াদিস' এ বর্ণনা করেন। কিছু লোক মুসলিমদের সমাজ পরিত্যাগ করে একটি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে যিকির আযকার ও তাসবীহ তাহলীলে লিপ্ত হয়। এভাবে তারা জগৎ সংসার পরিত্যাগ করে সন্নাসব্রত অবলম্বন করে। ইবনে মাসউদ ﵁ সেখানে গমণ করে তাদের বলেন, তোমরা কি রাসুলের সাহাবাদের তুলনায় বেশি জেনে ফেলেছো? যদি তোমাদের মতো সকল মুসলিম এমন করে (সন্যাসব্রত গ্রহণ করে) তবে জুময়া, জামাত ইত্যাদি কিভাবে হবে? অসুস্থকে দেখাশোনা করবে কে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করবে কে? এরপর তিনি তাদের মানব সমাজে ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের তৈরী মসজিদটি ভেঙে দেন।

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে এই সকল লোকেরা মুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করে নির্জনে সন্যাসব্রত পালনের ইচ্ছা করলে ইবনে মাসউদ ﵁ তাদের নিষেধ করেছেন। কেবল যিকির করার

কারণে নয়। সম্ভবত এটিই প্রকৃত ঘটনা।

এর পরও যারা মানুষকে যিকিররের মজলিস থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং নেক উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে বাঁধা সৃষ্টি করে তাদের আমরা আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ}

আপনি ঐ সকল লোকদের তাড়িয়ে দেবেন না যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের রবকে ডাকে। তাদের হিসাব আপনার উপর নয় আর আপনার হিসাব তাদের উপর নয়। আপনি যদি তাদের তাড়িয়ে দেন তবে ভীষণ পাপী হবেন। [আনয়াম/৫২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

{أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى}

আপনি কি তাকে দেখেন নি যে আমার এক বান্দাকে সলাত আদায় করতে নিষেধ করে! [আলাক/৯,১০]

মোট কথা শরীয়তের মূলনীতিতে গৃহীত কোনো ভাল কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে

পারে না। যেসব সাহবায়ে কিরাম হতে এর বিপরীত বর্ণিত আছে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে তারা এব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতি প্রদানের বিষয়টি জানতেন না। অথবা তারা হয়তো এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তবে ভিন্ন কোনো কারণে এ থেকে নিষেধ করেছেন। হয়তো ভালর সাথে খারাপ মিশ্রিত হওয়ার কারণে তারা নিষেধ করেছেন যেমনটি ইবনে মাসউদ رضي الله عنه এর ঘটনায় আমরা দেখেছি অথবা মানুষ এসব বিষয়কে সুন্নাত বা ফরজ মনে করবে এমন আশঙ্কার কারণে তারা নিষেধ করতেন।

এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ব্যাখ্যাটি হলো, আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি প্রমাণিত নয় কিন্তু শরীয়তের মূলনীতিতে গৃহীত এমন কোনো নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা নিষিদ্ধ নয় বরং বৈধ। তবে বিশেষ প্রয়োজন না হলে, এ থেকে দূরে থাকা এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি প্রমাণিত পদ্ধতির উপর টিকে থাকা উত্তম। যেমনটি প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করা সম্পর্কিত ঘটনাতে আমরা দেখেছি। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি নতুন পদ্ধতিটির উপর আমল করে তাকে মৃদুভাবে নিষেধ করা যেতে পারে এবং এটা পরিত্যাগ করে যতদূর সম্ভব রসুলুল্লাহ ﷺ এর আমলের সাথে নিজের আমলের মিল রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করা যেতে পারে। তবে নিষেধ করার পরও যদি সে না ফেরে তাকে বিদয়াতী আখ্যা দেওয়া যাবে না, তার

সাথে গন্ডগোল সৃষ্টি করা যাবে না একারণে তাকে পাপী বা অপরাধীও মনে করা যাবে না। বরং তার মর্যাদা ও অবস্থান আগের মতোই বজায় থাকবে। যেহেতু সে যা করছে মূলত বিষয়টি বৈধ। সেই সাথে এটাও স্মরণ রাকতে হবে যে, যদি কোনো সময় নতুন সৃষ্ট বিষয়টি প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়ায় তবে তার উপর আমল করাই উত্তম হবে। সেক্ষেত্রে তা পরিত্যাগ করা নয় বরং তাতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারেই উৎসাহ দিতে হবে। যেমন, দ্বীনী শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা নির্মাণ করা, পবিত্র কুরআনে জের-যবর সংযুক্ত করা ইত্যাদি। যাই হোক সাধারন অবস্থায় যেহেতু নতুন সৃষ্ট বিষয়টি পরিত্যাগ করাই উত্তম তাই সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিলো মানুষকে এসব ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা। তবে যেহেতু এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে সাধারন অনুমতি ছিল তাই সাহাবায়ে কিরাম এতে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর কড়াকড়ি করতেন না। যেসব বিষয়ে কোনো কোনো সাহাবায়ে কিরাম থেকে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে সম্ভবত তাদের উদ্দেশ্যও ছিল কেবল নিরুৎসাহিত করা বিষয়টি নিষিদ্ধ প্রমাণ করা নয়। আর যদি কোনো কোনো সাহাবা থেকে এসব ব্যাপারে অতিরিক্ত কড়াকড়ি করার কথা বর্ণিত হয় তবে সেটা তার একক আমল হিসেবে গণ্য যা উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের বিপরীত হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

১০. একজন সাহাবীর নিজ ইচ্ছায় সুরা ফাতিহা পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করার ঘটনা।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে একদল সাহাবা কোনো এক এলাকাতে গমণ করেন। উক্ত এলাকার সর্দার অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা ঝাড়-ফুক করার জন্য ঐ সকল সাহাবাদের অনুরোধ করেন। তাদের মধ্যে একজন ঐ ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়-ফূঁক করলে উক্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায়। এর বিনিময়ে তারা কিছু ছাগল গ্রহণ করেন। পরে রসুলুল্লাহ ﷺ এটা শূনে খুশি হোন এবং মুচকি হেসে বলেন, (وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ) ‘‘তুমি কিভাবে জানলে যে এটা মন্ত্র হিসেবে কাজ করবে?’’ পরে তিনি বলেন, তোমরা এসব ছাগল ভাগ করে নাও আমাকেও একটা অংশ দিয়ো।

রসুলুল্লাহ ﷺ যে বললেন, ‘‘তুমি কিভাবে জানলে?’’ এটা প্রমাণ করে উক্ত বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পূর্ব নির্দেশনা ছিল না।

১১. ইবনে মাসউদ رضي الله عنه নিজ ইচ্ছামত একটি আয়াত ব্যবহার করে ঝাড়-ফুঁক করেন।

ইবনে হাযার আল-আসক্কালানী رحمه الله মাতালেবে আলিয়াতে বর্ণনা করেন। ইবনে মাসউদ رضي الله عنه জিনে পাওয়া রোগীর কানের নিকট কিছু একটা তিলওয়াত করলে সে সুস্থ হয়ে যায়। পরে রসুলুল্লাহ

ﷺ তিনি কি পাঠ করেছেন তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি তার কানের নিকট এই আয়াত তিলওয়াত করেছি, ‘‘তোমরা কি মনে করেছো তোমাদের তামাশার ছলে সৃষ্টি করা হয়েছে আর কখনও তোমাদের আমার নিকট ফিরে আসতে হবে না?’’ [মু’মিনুন/১১৫] রসুলুল্লাহ ﷺ এটা শুনে বলেন, কোনো মুমিন বান্দা এটা পাঠ করলে পাহাড় পর্যন্ত টলে যেতে বাধ্য।

আল-হাইছামী এই হাদিসটিকে হাসান পর্যায়ে গণ্য করেছেন। শায়েখ আলবানী অবশ্য হাদিসটিকে দূর্বল বলেছেন। তবে হাদিসটির মুলভাব উপরের সহীহ হাদিসটির সাথে সমার্থপূর্ণ।

এসব হাদিস প্রমাণ করে, রোগাগ্রস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের আশায় ঝাড়-ফুক বা অন্য কোনো মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের যে কোনো আয়াত বা অন্য কোনো উত্তম কথা ব্যবহার করতে দোষ নেই। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সাধারন অনুমতিও রয়েছে। আওফ ইবনে মালিক رضي الله عنه বলেন আমরা জাহেলিয়াতের যুগে ঝাড়-ফুঁক করতাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন,

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

তোমরা কি মন্ত্র পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করো তা আমাকে শোনাও। যে মন্ত্রে শিরকী কথা নেই তাতে কোনো সমস্যা নেই। [সহীহ মুসলিম]

দেখা যাচ্ছে শিরকী কথা না থাকলে রসুলুল্লাহ ﷺ এমন কি জাহেলী যুগের মন্ত্রকেও বৈধ বলছেন। অথচ বর্তমানে কিছু লোক রয়েছে যারা নির্দিষ্ট কোনো কুরআনের আয়াত বা হাদিস ব্যাবহার করে ঝাড়-ফুঁক করলে প্রশ্ন করেন ঠিক এই রোগের জন্য এই আয়াত বা হাদিসটি ব্যাবহার করে আল্লাহর রাসুল ঝাড়-ফুঁক করেছেন এমন প্রমাণ আছে কিনা। এমন সরাসরি প্রমাণ না পেলে তারা এ কাজকে বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করেন। যদি কেউ নিজ থেকে কোনো উত্তম দোয়া রচনা করে তার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করে তবে তো দফা রফা! ঐ ব্যক্তির ঈমান থাকবে কিনা সেটাও প্রশ্ন বিদ্ধ হয়ে যাবে। অথচ রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শিরকী কথা নেই এমন যে কোনো দোয়া-মন্ত্রে সমস্যা নেই। সাধারনভাবে এটা সকল প্রকার দোয়া মন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটা পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত বা হাদীস থেকে সংগৃহিত হোক বা নিজে থেকে উত্তম শব্দ ব্যবহার করে হোক। এমনকি যদি সেটা জাহেলী যুগের মন্ত্রও হয়। আমরা আল্লাহর নিকট যে কোনো প্রকার কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি থেকে আশ্রয় চাই।

১২. স্বপ্নের মাধ্যমে শবে কদরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে সাহাবায়ে কিরাম বারবার স্বপ্ন দেখছিলেন, শবে কদর রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে। এর

পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ

আমি তো দেখছি তোমাদের সবার স্বপ্ন মিলে যাচ্ছে তাহলে যে ব্যক্তি সবে কদরের সওয়াব পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে চায় সে রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যেই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করুক।

এই হাদিসে দেখা যাচ্ছে মুমিনদের স্বপ্নের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ শবে কদরের সময় নির্ধারন করেছেন। বিভিন্ন হাদিসে নেক স্বপ্নের মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

নেক স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। [বুখারী ও মুসলিম]

স্বপ্নের মাধ্যমে গায়েবের কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কথাও বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে একজন ব্যক্তি নিজের হাত কেটে আত্মহত্যা করে। পরে অন্য একজন সাহাবী এই ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ঐ ব্যক্তি বলেন, আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে তবে আমার হাত আগের অবস্থায় (কাটা অবস্থায়) রেখে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তুমি নিজে হাতে যা নষ্ট করেছো তা ঠিক

করে দেওয়া হবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা শুনে বলেন, (للهم وليديه فاغفر) "হে আল্লাহ তার হাতদুটিকেও ক্ষমা করে দাও।" এসকল হাদিস নেক স্বপ্নের অত্যাধিক গুরুত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নেক স্বপ্নের সর্বাপেক্ষা বড় গুরুত্বটি হলো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক ধরনের পরামর্শস্বরূপ। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (الرؤيا من الله) "নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে" [বুখারী ও মুসলিম]

যে হাদীসে বলা হয়েছে নেক স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ সে হাদিসটির ব্যাখ্যায় ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন,

أنه يجب أن نعلم مامعنى كون الرؤيا جزءًا من أجزاء النبوة فلو كانت جزءًا من الف جزء منها لكان ذلك كثيرًا

স্বপ্ন যে নবুয়তের একটি অংশ এর অর্থ কি সেটা আগে বুঝতে হবে। তাহলে এক হাজার ভাগের এক ভাগ হলেও যথেষ্ট মনে হবে।

এর পর তিনি এর অর্থ সম্পর্কে বলেন,

إن لفظ النبوة مأخوذ من النبأ والإنباء، وهو الإعلام فى اللغة والمعنى أن الرؤيا إنباء صادق من الله، لاكذب فيه كما أن معنى النبوة الإنباء الصادق من الله الذى لايجوز عليه الكذب فتشاهبهت الؤيا النبوة فى صدق الخبر عن الغيب

নবুয়ত শব্দটি খবর থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আরবী ভাষায়

এর অর্থ হলো কাউকে কোনো বিষয়ে খবর দেওয়া। সুতরাং (স্বপ্ন নবুয়তের অংশ) এর অর্থ স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য সংবাদ যেমন নবুয়ত মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য সংবাদ যিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। সুতরাং গায়েব সম্পর্কে সত্য সংবাদ পাওয়ার ব্যাপারে নবুয়ত ও স্বপ্নের মধ্যে মিল পাওয়া যায়। [শারহে সহীহ বুখারী]

মোট কথা স্বপ্নের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং কোনো বিষয়ে দিক নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব। তবে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বপ্ন কখনও আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় কখনও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। এটাও হাদিসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং শরীয়তের নির্দেশের বিপরীতে স্বপ্নকে অনুসরণ করা যাবে না। স্বপ্নকে স্বতন্ত্রভাবে কোনো মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। স্বপ্নের মাধ্যম শরীয়তের কোনো বিধানও প্রমাণিত হবে না। যেসব ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত বর্ণিত আছে সেখানে স্বপ্নের কোনো ভূমিকা নেই। তবে যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দিষ্ট কোনো ভাষ্য বিদ্যমান নেই বরং চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ আছে সেসব ক্ষেত্রে স্বপ্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উপরের হাদিসটিতে আমরা দেখেছি, শবে কদর সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ﷺ মুমিনদের স্বপ্নের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যেহেতু এ সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হয় নি। আরো

কিছু হাদিসে স্বপ্নের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বর্ণিত আছে।

১৩. স্বপ্নে দেখা দোয়া পাঠ করা।

ইবনে আব্বাস ﵁ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমি গত রাতে স্বপ্ন দেখেছি আমি একটি গাছের আড়ালে সলাত আদায় করছি। এরপর আমি সাজাদায় পতীত হলে গাছটিও আমার সাথে সাজদায় পড়ে গেলো এবং এই দোয়াটি পড়লো .... এরপর তিনি চমৎকার একটি দোয়া উল্লেখ করেন। ইবনে আব্বাস বলেন, পরে রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি সাজদার আয়াত তেলোয়াত করে সাজদায় পতিত হলেন। আমি শুনলাম তিনি উক্ত দোয়া পাঠ করছেন। [আবু দাউদ]

ইমাম আজ-জাহাবী আততালখিসে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

এটা জেনে নেওয়ার পর ঐ সকল লোকদের কার্যকলাপ লক্ষণীয় যারা স্বপ্নের মাধ্যেমে যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিদয়াত ও পথভ্রষ্টতা বলে মনে করে। উদহরণস্বরুপ এরা তাবলীগ জামাতকে নিন্দা করে কারণ- এটা স্বপ্নে পাওয়া পদ্ধতিতে আদায় করা হচ্ছে। আমাদের কথা হলো তাবলীগ জামাতের মধ্যে কোনো সমস্যা থাকলে সেটা আলোচনা করতে হবে কিন্তু কেবল স্বপ্নে পাওয়া পদ্ধতিতে আদায় করা হচ্ছে এই

যুক্তিতে এর নিন্দা করা যাবে না বরং দেখতে হবে এই স্বপ্নে পাওয়া পদ্ধতিটি শরীয়তে নিষিদ্ধ কিনা। একইভাবে স্বপ্নে পাওয়া কোনো দোয়া বা যিকির পাঠ করে অথবা স্বপ্নে পাওয়া ঔষধে মানুষের চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ নয়। যদি সেটা শরীয়তের বিপরীত না হয়। তবে এটা সত্য যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা স্বপ্নে পাওয়া ঔষধের কথা বলে তারা মিথ্যা বলে। এদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَل

যে কেউ এমন স্বপ্ন দেখার দাবী করে যা সে দেখে নি তবে তাকে দুটি যবের দানাতে গিঁট বাঁধতে বাধ্য করা হবে কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না। [বুখারী]

মোট কথা মিথ্যা স্বপ্নের দাবীদারদের কঠিন শাস্তি হবে। স্বপ্নের গুরুত্ব আছে বিধায় এধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। অতএব, কিছু লোক মিথ্যা বলে এই অজুহাতে সামগ্রিকভাবে স্বপ্নের ভূমিকাকে অস্বীকার করা অবশ্যই সঠিক পন্থা নয়।

১৪. রাসুলুল্লাহর আগমণে খুশি হয়ে আনন্দ-উৎসব করা।

তিরমিযীর একটি বর্ণনাতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো একটি যুদ্ধ থেকে নিরাপদে ফিরে আসলে একজন মহিলা সাহাবী

বলেন, হে আল্লাহর রাসুল আমি নিয়ত করেছি যদি আপনি নিরাপদে ফিরে আসেন তবে আমি আপনার সামনে দফ বাজাবো ও গান গাইবো। রসুলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি পুরোপুরি পছন্দ করছিলেন না। তিনি বললেন, (إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا) "তুমি যদি সত্যি সত্যিই নিয়ত করে থাকো তবে করো আর তা না হলে করো না।" অনুমতি পেয়ে উক্ত মহিলা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দফ বাজাতে শুরু করে। পরে আবু বকর ؓ প্রবেশ করলেন সে তখনও দফ বাজাচ্ছিল, এরপর উসমান ؓ প্রবেশ করেন সে তখনও দফ বাজাচ্ছিল। এরপর উমর ؓ কে প্রবেশ করতে দেখে উক্ত মহিলা দফ বাজানো বন্ধ করে এবং দফটি লুকিয়ে ফেলে। রসুলুল্লাহ ﷺ এটা দেখে বলেন, (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَر) "শয়তান তোমাকে দেখে ভয় পায় হে উমর"।

ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। শায়েখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [সহীহা/১৬০৯]।

এই হাদীসটি উল্লেখ করে শায়েখ আলবানী বলেন,

قد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها . والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه صلى الله عليه وسلم صالحا سالما منتصرا اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها

এই হাদিসটি অনেকের নিকট জটিল মনে হয়। যেহেতু বিয়ে

বা ঈদ ছাড়া অন্য কোনো উপলক্ষ্যে দফ বাজানো পাপের কাজ (এটা তার নিজস্ব ফতোয়া) এধরণের পাপের কাজের নিয়ত করাও বৈধ নয় সে নিয়ত পুরা করাও বৈধ নয়। আমার নিকট মনে হয় যেহেতু উক্ত মহিলা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিরাপদ ও বিজয়ীর বেশে আগমনে খুশি হয়ে এই নিয়ত করেছিল একারণে খুশি প্রকাশের জন্য সে যে নিয়ত করেছিল তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। [সিলসিলাতুস সহীহা]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, শায়েখ আলবানী বিবাহ ও ঈদ ছাড়া অন্য কোনো উপলক্ষ্যে দফ বাজানো পাপের কাজ মনে করছেন এ সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আগমনে খুশি হয়ে দফ বাজানো তিনি বৈধ মনে করছেন। অন্য কথায় আল্লাহর রাসুলের আগমন উপলক্ষে খুশি হয়ে এমন কি অবৈধ কাজও করা যায় এমন ফতোয়া দিচ্ছেন। অথচ তারাই ফতোয়া দেন রাসুলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতে আগমন উপলক্ষ্যে খুশি হয়ে কোনো বৈধ বা উত্তম কাজ যেমন, একত্রিত হয়ে দরুদ পাঠ করা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি কাজও বিদয়াত। এটা কি বোকার পরিচয় নয়?

এই হাদীস এর বিপরীতে দলিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বিজয়, তার নিরাপদ আগমন বা তার জন্ম গ্রহণ উপলক্ষে খুশি হয়ে যদি কেউ কোনো বৈধ কাজ করে তবে তা বিদয়াত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং শরীয়তের মূলনীতিতে এটা সওয়াবের কাজ

হিসেবেই গণ্য যেহেতু এর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। আমাদের কথা হলো এই মহিলা যা কিছু করেছে তার মধ্যে অবৈধ কিছু ছিল না। তেমন কিছু থাকলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিতেন না। দফ বাজানো মূলত একটি বৈধ বিষয় যদিও বিশেষ কোনো উপলক্ষ্য ছাড়া এসব খেল-তামাশাতে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। একারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ এধরণের বিষয় এড়িয়ে চলতে পছন্দ করতেন। তাই তিনি চাচ্ছিলেন এটা না ঘটুক কিন্তু যেহেতু মুল বিষয়টি বৈধ আর এ থেকে নিষেধ করা হলে উক্ত মহিলা কষ্ট পাবে তাই তিনি সরাসরি নিষেধ করেন নি। কিন্তু উমর رضي الله عنه আগমন করলে উক্ত মহিলা নিজ থেকেই দফ বাজানো বন্ধ করে দিয়েছে দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ খুশি হয়ে বলেছেন, উমরকে দেখে শয়তানও ভয় পায়। এর অর্থ এটা নয় যে, কাজটি শয়তানী কাজ ছিল। কেননা তেমন বললে প্রমাণিত হয় রাসুলুল্লাহ ﷺ শয়তানী কাজের অনুমতি দিয়েছেন। নাউযু বিল্লাহ। যদি ঐ মহিলা দফ বাজানোর পরিবর্তে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আগমন উপলক্ষে দোয়া-যিকির, কুরআন তিলওয়াত বা এই জাতীয় কোনো উত্তম কাজের নিয়ত করতেন তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ যতটুকু অপছন্দ করেছন তাও করতেন না। মোট কথা এই ঘটনা প্রমাণ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আগমনে খুশি হয়ে যে কোনো প্রকার বৈধ পদ্ধতিতে আনন্দ প্রকাশ করা দোষোনীয় নয়। এমনকি যদিও তার মধ্যে কিছুটা

ক্রিড়ামূলক বিষয় উপস্থিত থাকে। আর যদি দরুদ পাঠ বা সীরাত সম্পর্কিত আলোচনা ইত্যাদির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা হয় তবে তো অতি উত্তম। কিভাবে এটা দোষণীয় হবে অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই তার জন্মের ঘটনাকে উপলক্ষ্য হিসেব গ্রহণ করার মূলনীতি প্রনয়ন করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ কে সোমবার দিন রোজা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ

ঐ দিনই তো আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐ দিন আমার উপর ওহী হয়েছে। [সহীহু মুসলিম]

এই হাদীসে সোমবার দিন রোজা রাখার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ সরাসরি বলতে পারতেন সোমবার দিন রোজা রাখা সওয়াবের কাজ। এভাবে না বলে তিনি বলেছেন, ঐ দিন আমি জন্মেছি এবং নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছি। অর্থাৎ এসব কারণেই দিনটি ফজিলতপূর্ণ হয়েছে। এই হাদিস প্রমাণ করে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্মের উপলক্ষ্য একটি ফজিলতের বিষয়।

এর উপর আপত্তি উত্থাপন করে অনেকে বোকামী বশত বলেন, এখানে সাপ্তাহিক জন্ম দিনের কথা বলা হচ্ছে সেটাকে বাৎসরিক ভাবে প্রতি রবিউল আওয়াল মাসে পালন করা হয় কেনো? তাছাড়া এখানে রোজা রেখে জন্মদিন পালন করতে বলা হচ্ছে দরুদ পরে বা মিষ্টি খেয়ে তো নয়? এর উত্তরে আমরা পূর্বে যা

বলেছি তাই বলবো। শরীয়তে সকল কিছুর নাম ধরে উল্লেখ থাকে না বরং মূলনীতি বর্ণিত থাকে। আমাদের দেখতে হবে শরীয়তে বাৎসররিকভাবে দিবস পালন করার অনুমতি আছে কিনা। আশুরার দিন রোজা পালন করার মধ্যে আমরা এ বিষয়ক মূলনীতি দেখতে পায়। সহীহ বুখারীতে এসেছে, ফেরাউনের হাত থেকে মুসা ﵇ এর মুক্তি উপলক্ষে ইয়াহুদীরা রোজা রাখতো। রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা শুনে বললেন, (إنا أولي بموسي منكم) ‘‘আমি তোমাদের চেয়ে মুসার বেশি আপনজন’’ এরপর তিনি প্রতিবছর আশুরার দিন রোজা রাখতেন। কোনো খুশির দিন বাৎসরিকভাবে পালন করার মূলনীতি এই হাদীসে পাওয়া যায়। আর রোজা রাখা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করার ব্যাপারে কথা হলো। যদি আনন্দ প্রকাশই উদ্দেশ্য হয় তবে বৈধ যে কোনো পদ্ধতিতে আনন্দ প্রকাশ করা বৈধ হবে। হাদিসে একটি পদ্ধতির কথা বলে দেওয়া হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে বাকীগুলো নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। এই মহিলা সাহাবীর দফ বাজিয়ে ও গান গেয়ে আনন্দ প্রকাশের ঘটনা প্রমাণ করে রাসুলুল্লাহর আগমণ উপলক্ষ্যে যে কোনো বৈধ পদ্ধতিতে আনন্দ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ নয়। এই মহিলা সাহাবী যে পদ্ধতিতে আনন্দ প্রকাশ করেছেন সেটা তো রাসুলুল্লাহ ﷺ ঠিক করে দেন নি। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন পালন করা সম্পর্কে আরও কিছু কথা পরবর্তীতে আসছে এখানে সংক্ষিপ্ত কথায় বলা যায় এ বিষয়ে

সঠিক সিদ্ধান্ত হলো উত্তম কোনো উপলক্ষ্যে বৈধ কোনো কাজ করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়।

১৫. রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতি গ্রহণ না করেই তারাবীর সলাত জামাতে আদায় করার ঘটনা।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ অর্ধরাতের পর মসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করা শুরু করলে কিছু সাহাবী তা লক্ষ্য করে তার পিছনে সলাতে দাড়িয়ে যান। পরের দিন তারা এ বিষয়ে মানুষের সাথে আলোচনা করলে সেদিন রাতে অধিক লোক সমাগম হয়। পরের দিন রাতের সলাতে আরো অধিক লোক একত্রিত হয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে জামাতে সালাত আদায় করেন। পরের দিন আরো বেশি সংখ্যক লোক হাজির হয়। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ সেদিন রাতে বাড়ি থেকে বের হন নি। কেউ কেউ সলাত সলাত বলে শব্দ করছিল তবু রাসুলুল্লাহ ﷺ বের হলেন না। তিনি ফজরের সময় মসজিদে উপস্থিত হলেন এবং বললেন,

فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

তোমরা যে আমার পিছনে সলাত আদায় করছিলে তা আমি টের পেয়েছি কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিল (তোমাদের আগ্রহ দেখে) তোমাদের উপর রাত্রে সলাত আদায় করা (তারাবী অথবা

তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করা) ফরজ করে দেওয়া হবে আর তখন তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হবে না।

এই হাদিসে দেখা যায় সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতি গ্রহণ না করেই নফল সালাত আদায় করার জন্য তার পিছনে দাড়িয়ে গেলেন। পরের দিন তারা বিষয়টি নিয়ে মানুষের সাথে আলোচনা করে আরো অধিক সংখ্যক লোক নিয়ে হাজির হলেন কিন্তু সেদিনও রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতি গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এ কাজকে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিন্দা করেন নি তবে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি বিষয়টি পরিত্যাগ করেছেন। এ ঘটনা তাদের বিপক্ষে দলীল যারা যে কোনো ভালো কাজ একত্রে আদায় করার জন্য বিশেষ করে ঐ কাজটি সম্মিলিতভাবে করার ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসুলের অনুমতি লাগবে এমন দাবী করে। আমাদের কথা হলো যে কাজটি উত্তম তা একাকী করা যেমন উত্তম সম্মিলিত ভাবে করাও উত্তম বরং সম্মিলিতভাবে করার বিশেষ কিছু ফজিলত রয়েছে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং যে কাজ একাকী করা বৈধ সেটা সম্মিলিতভাবে করাও বৈধ। যদি না সে কাজ একত্রিত করার ব্যাপারে পৃথকভাবে নিষেধাজ্ঞা থাকে।

উপরে আমরা বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছি যাতে আমরা দেখেছি সাহাবায়ে কিরাম নিজ উদ্যোগে বেশ কিছু নতুন বিষয়ের উপর আমল শুরু করেন আর রাসুললুল্লাহ ﷺ পরে সেটা জানতে

পেরেছেন কিন্তু উক্ত কাজকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে নিন্দা করেন নি বরং প্রশংসা করেছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় এ ধরণের নতুন সৃষ্ট বিষয় নিষিদ্ধ বিদয়াত হিসেবে গণ্য নয়। কেউ কেউ এর উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারে,

পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ ﷺ এসব কাজের অনুমতি দিয়েছেন তাই তা গ্রহণযোগ্য হয়েছে নতুবা বিদয়াত হতো। এর সহজ উত্তর হলো, এসব কাজ রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতি না নিয়েই করা হয়েছে আর রাসুলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে। বেলাল ﷺ নিজ থেকে চিন্তা-গবেষণা করে প্রতিবার ওজুর পর দু'রাকাত সলাত আদায় করা শুরু করেন। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দেওয়া তো দূরের কথা তিনি এ সম্পর্কে জানতেনই না। এর পুরষ্কার হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ জান্নাতে বেলাল رضي الله عنه এর পায়ের শব্দ শুনতে পান। পরে বেলাল رضي الله عنه কে প্রশ্ন করে তিনি ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হোন এবং বিষয়টি পছন্দ করেন। যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করা বা অনুমতি দেওয়ার পূর্বে এই কাজ বিদয়াত হিসেবে গণ্য হয় তবে কি একটি বিদয়াত কর্মের কারণে বেলাল رضي الله عنه এতো বড় মর্যাদা প্রাপ্ত হলেন! একইভাবে রুকু থেকে উঠে যে ব্যক্তি বাড়তি দোয়া পাঠ করেছিল রসুলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষ করে ঐ ব্যক্তির কাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বেই ফেরেশতারা সেটার সওয়াব লেখার জন্য তাড়া-হুড়া শুরু করেন। বরং বলা যায় ফেরেশতাদের তাড়া-হুড়া

দেখেই রাসুলুল্লাহ ﷺ বিষয়টির ফজিলত সম্পর্কে অবহিত হোন। সুতরাং রাসুলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দেওয়ার পূর্বে এসব কাজ বিদয়াত ছিলো এমন মন্তব্য সঠিক নয়। কেননা তেমন হলে বিষয়টি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হতো না। যেহেতু বিদয়াত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন (فهو رد) ‘‘তা অহগ্রণযোগ্য’’।

পূর্বাপেক্ষা বেশি বোকা লোকেরা বলতে পারে, এসব ঘটনা রসুলুল্লাহ ﷺ বিদয়াত সম্পর্কে নিষেধ করার পূর্বে ঘটেছে। পরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদয়াত থেকে নিষেধ করেছেন তাই এখন এগুলো মানসুখ হয়ে গেছে। এই উক্তিটি হাস্যকর। যেহেতু এটা প্রমাণ করে ইসলামের প্রথম দিকে বিদয়াত তথা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা বৈধ ছিল। আল্লাহ ও তার রাসূলের নামে মিথ্যারোপ করে নকল শরীয়ত চালু করা বৈধ ছিল। নিজে ইচ্ছামতো কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম বলা বৈধ ছিল! এটা সম্ভব নয়। তাছাড়া সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোনো বিষয়কে মানসুখ বলে দাবী করা সঠিক নয়।

অতএব, এটা মেনে না নিয়ে কোনো উপায় নেই যে, উপরে আমরা যেসব ঘটনা উল্লেখ করেছি সেগুলো বিদয়াতের আওতাভূক্ত নয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদয়াত বলতে এসব বিষয় বোঝান নি তাই এগুলোর অনুমতি দিয়েছেন। আর সাহাবায়ে কিরামও বিদয়াত বলতে এধরনের বিষয় বোঝেন নি তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় এবং তার ওফাত পরবর্তী সময়ে

তারা এধরেণর বিভিন্ন নতুন সৃষ্ট বিষয়ের উপর আমল করেছেন। পূর্বে আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় ঘটমান কিছু ঘটনার বর্ণনা দিয়েছি। এবার আমরা দেখবো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাত পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কিরাম নতুন সৃষ্ট কি কি বিষয়ের উপর আমল করেছেন। এর মাধ্যমে এই হাস্যকর আপত্তিদুটি আরো স্পষ্টভাবে খন্ডিত হবে। যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর ঘটমান ঘটনা সম্পর্কে এটা বলার সুযোগ থাকবে না যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দেওয়ার কারণে এটা বৈধ হয়েছে বা রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদয়াত সম্পর্কে নিষেধ করার পূর্বে এগুলো ঘটেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম একমত হয়ে বা এককভাবে যেসব নতুন বিষয়ের উপর আমল করেছেন।

১. পবিত্র কুরআন সংকলন।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, আবু বকর رضي الله عنه এর খেলাফত কালে বিভিন্ন যুদ্ধে বহু সংখ্যক ক্বারী নিহত হলে উমর رضي الله عنه খলীফা আবু

বকর ﵁ এর নিকট হাজির হয়ে বলেন, আপনি কি কুরআন একত্রে গ্রন্থিত করার নির্দেশ দেবেন না? একথা শুনে আবু বকর ﵁ বলেন,

كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟

আপনি কিভাবে এমন কিছু করবেন যা রাসুলুল্লাহ ﷺ করেন নি?

এটা শুনে উমর ﵁ বলেন, (هو والله خير) "আল্লাহর কসম এটা ভাল কাজ"

এরপর তিনি বিভিন্নভাবে আবু বকর ﵁ কে বোঝাতে থাকেন এমন কি এক সময় তিনি রাজি হয়ে যান। এরপর তারা দু'জন মিলে যায়েদ ইবনে ছাবিতের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করলে তিনি বলেন,

كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

কিভাবে আপনারা এমন একটা কাজ করবেন যা আল্লাহর রাসুল করেন নি?

এবার আবু বকর ﵁ এর উত্তরে উমর ﵁ যা বলেছিলেন তাই বললেন। তিনি বললেন, (هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ) "আল্লাহর কসম এটা ভাল কাজ" [সহীহ বুখারী]

এই হাদীসটির মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

আমাদের সময়ে যারা বিদয়াত সম্পর্কে অত্যাধিক জ্ঞান গরিমার দাবী করে তাদের যখন বলা হয় নতুন সৃষ্ট সকল বিষয় বিদয়াত হলে কুরআন সংকলন, হাদীসের গ্রন্থ্ প্রনয়ন, মাদ্রাসা নির্মাণ ইত্যাদি কার্যকলাপ কেনো বিদয়াত নয়? তারা একগাল হেসে বলেন, এটা কোনো প্রশ্ন হলো? এসব বিষয় বিদয়াত হওয়ার কোনো কারণ নেই, এগুলো তো মাসালেহে মুরসালার মধ্যে গণ্য। বিদয়াতের আলোচনায় এসব বিষয় উল্লেখ করারই কোনো প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন হলো বিদয়াতের সাথে যদি এসব বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নাই থাকবে তবে আবু বকর ﵁ এবং যায়েদ ইবনে ছাবিত ﵁ এর মতো সাহাবী কেনো একবাক্যে বিষয়টিকে গ্রহণ করলেন না। কেনো তারা বললেন,

"আল্লাহর রাসুল যা করেন নি তা কিভাবে করা যায়?"

একথা শুনে উমর আল ফারুকই বা কেনো হেঁসে উড়িয়ে দিলেন না। তিনি তো বলতে পারতেন- "আপনারা এসব কি বলছেন? এর সাথে বিদয়াতের কি সম্পর্ক! এটা তো মাসালেহে মুরসালাহ। এধরণের কাজে কি কেউ সংকোচ করতে পারে!" বরং তিনি বারবার আলোচনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যদিও রসুলুল্লাহ ﷺ এটা করেন নি তবু এটা ভাল কাজ, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। এভাবে বারবার বোঝানোর পর আবু বকর ﵁ এবং যায়েদ ইবনে ছাবিত ﵁ বুঝতে পারলেন এটা আসলেই ভালো কাজ। ফলে তারা

কুরআন সংকলনে মনোনিবেশ করেন।

মোট কথা রাসুলুল্লাহ যেহেতু এ কাজ করেন নি তাই প্রথমে তারা এটা করতে সংকোচ বোধ করেন। তাদের আশঙ্কা হচ্ছিল কোনো কারণে বিষয়টি অছন্দনীয় বা অকল্যাণকর হওয়ার কারণেই হয়তো রসুলুল্লাহ ﷺ তা করেন নি। কিন্তু যখন আলোচনা ও গবেষণা করে বোঝা গেলো বিষয়টি আসলে উত্তম তখন তারা এতে সম্মত হোন। এটা প্রমাণ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ যা কিছু করেন নি সেটা একবাক্যে নিষিদ্ধ হয়ে যায় তা নয় বরং এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে হয়তো শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় বা অকল্যাণকর হওয়ার কারণে তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন অথবা আসলে বিষয়টি উত্তম তবে নিজে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বা অন্য কোনো কারণে তা করেন নি। শরীয়তের মুলনীতির উপর বিস্তারিত গবেষণার আলোকে এ দুটি বিষয়ের মধ্যে আসল কারণ কোনটি তা অনুধাবন করা সম্ভব। অতএব, নতুন সৃষ্ট কোনো বিষয় শরীয়তের মূলনীতির আলোকে গ্রহণযোগ্য কিনা সেটা বুঝার জন্য কিছুটা চিন্তা-গবেষণা ও আলোচনা সমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসকে একত্রিত করে তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরী। একারণে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের অনুসারী নেককার ওলামায়ে দ্বীন যাচাই-বাছাই না করে নতুন সৃষ্ট বিষয়াবলী গ্রহণ করতেন না। আবার কোনো নতুন সৃষ্ট বিষয়

শরীয়তের মুলনীতির আলোকে যাচাই-বাছাই করার পর উত্তম প্রমাণিত হলে তারা কেবলমাত্র রাসুলুল্লাহ ﷺ করেন নি এই যুক্তিতে সেটাকে বিদয়াত আখ্যায়িত করে নিন্দা করতেন না। বিশেষ করে যেসব নতুন বিষয় যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়ায় এবং শরীয়তের মূলনীতিতেও গ্রহণযোগ্য হয় সেগুলোর ব্যাপারে তারা মানুষকে উৎসাহিত করেন। আর যদি কোন নতুন সৃষ্ট বিষয় শরীয়তের মূলনীতিকে আবশ্যক (ফরজ বা ওয়াজিব) প্রমাণিত হয় তবে তো সেটার উপর আমল করা তারা বাধ্যতামূলক বলে থাকেন। যেমন উসুলে ফিকহ বা উসুলে হাদীস শিক্ষা করা। বর্তমান যুগের ওলামায়ে কিরাম ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজে কিফায়া বলে থাকেন। এ ফতোয়াটিও সঠিক যেহেতু মুসলামদের মধ্যে যদি কোনো ডাক্তার না থাকে তবে মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটবে বা মুসলিম নারী-পুরুষ বিধর্মী ডাক্তারদের নিকট চিকিৎসা গ্রহণে বাধ্য হবে যার ফলে দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হবে।

এই বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, রসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী "তোমরা নতুন সৃষ্ট বিষয় থেকে সতর্ক থাকবে" এই সতর্কতার অর্থ সকল নতুন বিষয়কে পরিত্যাগ করা নয় বরং এখানে মূলত যাচাই-বাছাই না করে নতুন বিষয়কে গ্রহণ করা হতে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং নতুন সৃষ্ট বিষয়কে বিনা-বিচারে গ্রহণ করা যাবে না বরং দ্বীন সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত ও অভিজ্ঞ

ওলামায়ে কিরাম যাচাই-বাছাই করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তারা লক্ষ্য করবেন শরীয়তের মূলনীতির আলোকে বিষয়টির বিধান কি হয়। এভাবে যাচাই-বাছায়ের পর যদি কোনো বিষয় উত্তম প্রমাণিত হয় তবে কেবল নতুন হওয়ার কারণে সেটাকে বিদয়াত আখ্যায়িত করে তিরষ্কার করা হলে তা অন্যায় ও অবিচার বলে গণ্য হবে। উমর ﵁ এর প্রস্তাবটির উপর প্রথমে আপত্তি উত্থাপন এবং পরে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে বিষয়টি উত্তম প্রমাণিত হলে তা গ্রহণ করার মাধ্যমে আবু বকর ﵁ ও যায়েদ ইবনে সাবেত ﵁ আমাদের এই মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। শরীয়তের মূললনীতির আলোকে যাচাই-বাছাই না করে কেবল নিজের খেয়াল-খুশি মতে নতুন সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে একটি অংশকে মাসালেহে মুরাসালার নামে বিদয়াতের সাথে সম্পর্কহীন ঘোষণা করে কোনেরূপ চিন্তা-গবেষণা ও বাছ-বিচার না করে বৈধ বলা আর অন্য একটি অংশকে বিনা-বিচারে বিদয়াত আখ্যায়িত করা সঠিক পন্থা নয়। বরং নতুন সৃষ্ট সকল ব্যাপারে একই মুলনীতি গ্রহণ করতে হবে আর তা হলো শরীয়তের মুলনীতির আলোকে বিশ্লেষণ করা যে, সেটা গ্রহণযোগ্য না কি অগ্রহণযোগ্য। কুরআন-হাদিস সংকলণ, মাদ্রাসা নির্মাণ ইত্যাদি নতুন বিষয়কে মাসালেহে মুরসালা বা অন্য কোনো নামে আখ্যায়িত করে বৈধ বলা হয়। অপর দিকে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর মোনাজাত করা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন পালন করা

ইত্যাদি বিষয়কে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে নিন্দা করা হয়। অথচ শরীয়তের মূলনীতিতে উভয় প্রকার কাজই উত্তম হিসেবে গণ্য। তবে কি যার যেটা পছন্দ সেটাকে মাসালেহে মুরসালা নামকরণ করে বৈধ করে নেবে আর যেটা অপছন্দ সেটাকে বিদয়াত আখ্যায়িত করে অবৈধ করে দেবে। এধরণের সুবিধাবাদি নীতি গ্রহণ করা কোনো সুবিবেচকের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

২. জামাতে তারাবীর সলাতের প্রচলন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে উমর ﵁ রমজান মাসে মসজিদে গিয়ে দেখেন মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে তারাবীর সলাত আদায় করছে। তিনি উবাই ইবনে কা’বকে ইমাম করে তাদের সকলকে জামাতবদ্ধ করে দেন। এর পর সকলে একত্রে জামাতে তারাবীর সলাত আদায় করতে থাকে। এই হাদীসের রাবী বলেন,

ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: «نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَه

এই ঘটনার পর আমি আর একদিন উমর ﵁ এর সাথে রাত্রে বের হলাম তিনি দেখলেন মানুষ তাদের ইমামের পিছনে জামাতে সলাত আদায় করছে। এটা দেখে তিনি বললেন, “এটা

একটা উত্তম বিদয়াত" তবে এরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সলাত আদায় করা এখন সলাত আদায় করার তুলনায় উত্তম।" তিনি রাতের শেষ ভাগে সলাত আদায় করার কথা বলছিলেন আর মানুষ রাতের প্রথমভাগে সলাত আদায় করতো।

* বিদয়াতকে ভাল মন্দ দুটি ভাগে বিভক্ত করা সম্পর্কে কিছু কথা।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, উমর ﵁ রাতের প্রথম ভাগে ঈশার সলাতের পর নিয়মিত জামাতে তারাবীর সলাত আদায়ের ব্যবস্থা করলেন এবং নিজেই বিষয়টিকে বিদয়াত নামে আখ্যায়িত করলেন তবে বললেন এটা ভাল বিদয়াত। যারা বিদয়াতকে ভাল মন্দ দুটি ভাগে বিভক্ত করেন তারা এ হাদিসকে নিজেদের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। ভিন্নমতালম্বীরা বিষয়টি খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তারা বলেন, উমর ﵁ যা করেছেন তার সাথে বিদয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই যেহেতু স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ রমজান মাসে সাহাবাদের নিয়ে কয়েক দিন জামাতে কিয়ামে রামাদান (তারাবীহ) আদায় করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই উত্তরটি যতটা স্পষ্ট মনে করা হয় আসলে তেমন নয়। বিদয়াত বলতে তারা যা বোঝে সে আলোকে কেবল রাসুলুল্লাহ ﷺ কয়েকদিন কিছু সাহাবাকে নিয়ে জামাতে তারাবীহ আদায়

করেছেন এ প্রমাণ পাওয়া গেলেই উমর ﷺ এর এই কর্মকান্ড বিদয়াত হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পায় না। যেহেতু উমর ﷺ রাত্রের প্রথম অংশ তথা এশার সলাতের পর মানুষকে তারাবীর সলাত জামাতের সাথে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ সাধারনত শেষ রাত্রে সলাত আদায় করতেন। যে হাদীসে কয়েকদিন সাহাবাদের নিয়ে জামাতে সলাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায় সে হাদিসেও (جوف الليل) অর্থাৎ অর্ধরাতের পর সলাত আদায়ের কথা বর্ণিত আছে। একারণেই উমর ﷺ বলেছেন, যে সময় এরা ঘুমিয়ে থাকে সে সময় সলাত আদায় করাই অধিক উত্তম।

এখন যারা কোনো একটি আমলের জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারন করে নিয়মিত আদায় করা বিদয়াত মনে করে তাদের মতে উমর ﷺ এর এই কাজটি বিদয়াত হবে। আর যদি তারা বলে, রাসুলুল্লাহ ﷺ রমজানের সলাত জামাতে আদায় করেছেন এতটকু প্রমাণ পাওয়া গেলেই একাজের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারন করে নিয়মিত সেই সময়ে আদায় করা বিদয়াত নয় তবে আমরা বলব, রসুলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে মোনাজাত করেছেন এটা প্রমাণিত হয়েছে অতবএ, পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর নিময়িত মোনাজাত করা বিদয়াত হবে না। এটা মেনে নিলেই তো সব ঝামেলা শেষ হয়ে যায়।

এখন বিদয়াতকে দুটি ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে কথা হলো।

ইমাম শাফেঈ, ইজ্জুদ্দিন আব্দুস সালাম, ইমাম নাব্বী, ইবনে হাযার আসক্কালানি, ইবনে বাত্তাল, ইবনে আছির প্রমুখ ওলামায়ে কিরাম বিদয়াতকে ভাল মন্দ দুটি ভাগে ভাগ করার পক্ষে। উপরে আমরা তাদের মতামত উল্লেখ করেছি। বিপরীত দিকে, ইমাম শাওকানী, ইমাম শাতেবী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিম এই ভাগাভাগিকে অপছন্দ করেছেন। পরবর্তীতে চার মাজহাবের জমহুর ওলামায়ে কিরাম বিদয়াতকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করার মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন অপরদিকে আহলে হাদিস ও সালাফীরা বিদয়াতকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে।। তারা বলে বিদয়াতকে বিভক্ত করা নিজেই একটি বিদয়াত। তারা উপরোল্লিখিত মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরামের কঠোর ভাষায় নিন্দা করে থাকে। এভাবে বিদয়াতের ভাগাভাগি নিয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ চরমে উঠেছে।

কিন্তু মজার ব্যাপারটি হলো এ বিষয়ে উভয় গ্রুপের বক্তব্যে তেমন কোনো বৈপরিত্ব নেই। বিদয়াতের আলোচনাতে এই ভাগাভাগির ব্যাপারটার খুব বেশি গুরুত্বও নেই। আসল কথা হলো, উভয় পক্ষের মূল বক্তব্য একই তবে এক পক্ষ নিজের মত খোলোশা করে বর্ণনা করছে আর অন্য পক্ষ ঘুরিয়ে কান দেখাচ্ছে।

মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, বিদয়াতের ভাল মন্দ ভাগ রয়েছে। তারা একথা বলেছেন কারণ এমন অনেক বিষয়

রয়েছে যেগুলো নতুন সৃষ্ট হওয়া স্বত্ত্বেও নিন্দনীয় নয়। যেমন, কুরআন সংকলন, মাদরাসা নির্মাণ ইত্যাদি। যারা বিদয়াতকে দুটি ভাগে ভাগ করতে নারাজ তারাও কি এসব বিষয়কে বিদয়াত বলতে পারেন? না, তাদের পক্ষেও এগুলোকে বিদয়াত বলা সম্ভব নয়। তাহলে তারা কি করেন? তারা এখানে বড় মাপের গোজামিল দেওয়ার চেষ্টা করেন। যেসব বিষয়কে বিদয়াত বলতে ইচ্ছা করে না সেগুলোকে মাসালেহে মুরসালা বা অন্য কোনে নাম দিয়ে বিদয়াতের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তারা বলেন এগুলো বিদয়াত নয় বরং উত্তম কাজ। আর আগের পক্ষ বলেন এগুলো বিদয়াত তবে উত্তম বিদয়াত। এই হচ্ছে পার্থক্য।

''উত্তম বিদয়াত'' কথাটির উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে আগের পক্ষ বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (كل بدعة ضلالة) ''সকল বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা''। এখানে কুল্লু (كل) শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে যার অর্থ 'সকল'। অতএব, সকল বিদয়াত পথভ্রষ্টতা এটা মেনে না নিলে এই হাদীস অগ্রাহ্য করা হয়। এরা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে, কুরআন-হাদীসে যেখানেই 'কুল্লু' (كل) অর্থাৎ 'সকল' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে সকল বিষয়কেই বুঝতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই। এই সকল লোকদের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হলো এরা কোনো বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করতে অভ্যস্ত নয়। কোনো একটি আয়াত বা হাদিসকে নিজেদের মন মতো ব্যাখ্যা

করেই তারা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে থাকে।

কুরআন-হাদীসে এমন বহু স্থানে কুল্লু (كل) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু সেখানে সব কিছু অন্তভূর্ক্ত করা উদ্দেশ্য নয়। যেমন আল্লাহ্ বাণী, (كل نفس ذائقة الموت) "প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে" [আলেইমরান/১৮৫] (كل شيء هالك الا وجهه) "সকল বস্তুই ধ্বংস হবে শুধু আল্লাহ্ ছাড়া" [ক্বসাস/৮৮] কিন্তু আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের নিকট সঠিক আক্বীদা হলো, জান্নাত ও তাতে বিদ্যমান যাবতীয় নিয়ামত-রাজী, হুর, গিলমান ইত্যাদি বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে আর ভবিষ্যতে তা কখণও ধ্বংস হবে না। বর্তমানে জান্নাতে অবস্থিত হুর বা গিলমানদের কেউই মৃত্যুবরণ করবে না। সুতরাং সব প্রাণীই মৃত্যুবরণ করবে বা সকল বস্তুই ধ্বংস হবে এই আয়াতদ্বয়ে ব্যাবহৃত কুল্লু (كل) শব্দের আওতায় সব কিছু অন্তভূর্ক্ত হচ্ছে না। আল্লাহ্ (ﷻ) মৌমাছিকে বললেন, (ثم كلي من كل الثمرات) " তুমি সকল প্রকার ফল হতে আহার করো (মধু গ্রহণ করো)" [সূরা নাহল/৬৯] কিন্তু এটা নিশ্চিত যে মৌমাছি সকল প্রকার ফল হতে আহার করে না বা মধু সংগ্রহ করে না। যেহেতু এমন অনেক ফল রয়েছে যা বিষাক্ত ও ক্ষতিকর। ইব্রাহীম (عليه السلام) যখন কিভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন তা স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা পোষণ করলেন আল্লাহ (ﷻ) তাকে বললেন, (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُـرْهُنَّ

(إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا) "তাহলে তুমি চারটি পাখি সংগ্রহ করে তাদের পোষ মানাও তারপর (তাদের টুকরো টুকুরো করে) প্রতিটি পাহাড়ে এক একটি খন্ড রাখো [বাকারা/২৬০]। আয়াতে বলা হয়েছে প্রতিটি পাহাড়ে এক এক খন্ড রাখতে এটা নিশ্চিত যে, ইব্রাহীম (عليه السلام) কে পৃথিবীতে যত পাহাড় আছে তার প্রত্যেকটির উপর একেক খন্ড রাখতে বলা হয়নি সেটা করা সম্ভবও নয় আর চারটি পাখির মাংস অতগুলো টুকরাতে বিভক্ত করাও সম্ভব নয়। বরং এর ব্যাখ্যা হলো ইব্রাহীম (عليه السلام) এর এলাকা বা তার আশে পাশের পাহাড়গুলোর কথা বলা হচ্ছে যার সংখ্যা ছিল ৪ টি বা ৭টি [বায়দাবী, জালালাইন] এমন আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যায় যেখানে কুল্লু শব্দটি সকল অর্থে আসেনি বরং কিছু অর্থে এসেছে।

বিদয়াত সম্পর্কিত হাদিসরটির মধ্যে বলা হয়েছে,

وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار

সকল নতুন সৃষ্ট বিষয় বিদয়াত, সকল বিদয়াত পথভ্রষ্টতা আর সকল পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে। [নাসাঈ]

এখানে তিনটি স্থানে কুল্লু শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, সকল নতুন সৃষ্ট বিষয় বিদয়াত। পরে বলা হচ্ছে সকল বিদয়াত পথভ্রষ্টতা সবশেষে বলা হচ্ছে সকল পথভ্রষ্টতা

জাহান্নামে। যারা বলে, ‘‘সকল বিদয়াত পথভ্রষ্টতা’’ এখানে সকল শব্দের মাধ্যমে সকলই বুঝতে হবে কারণ এখানে কুল্লু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তারাও কিন্তু আগে ও পরে উল্লেখিত দুটি কুল্লু শব্দের অর্থ সকল বোঝেন না। যেহেতু তারা সকল নতুন সৃষ্ট বিষয়কে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেন না। যেমন বাস-ট্রাক, কম্পিউটার, মোবাইল, মাদ্রাসা ইত্যাদি নতুন সৃষ্ট বিষয়কে তারা বিদয়াত বলেন না। অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে ‘‘দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্ট বিষয় পরিত্যাক্ত’’ এই হাদীসের উপর নির্ভর করে তারা বলেন, ‘‘সকল নতুন সৃষ্ট বিষয় নয় বরং কেবল দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্ট বিষয় বিদয়াত’’। যখন তাদের বলা হয় মাদ্রাসা কি দ্বীনী বিষয় নয়, কুরআন সংকলণ, পবিত্র কুরআনে যের-যবর সংযোজন, হাদীসের সনদ যাচাই-বাছাই করা এগুলো কি দ্বীনী বিষয় নয়? এসব নতুন সৃষ্ট বিষয় তবে বিদয়াত নয় কেনো? তারা বলেন এগুলো মাসালেহে মুরসালা। মোট কথা বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপণ করে তারা ‘‘সকল নতুন সৃষ্ট বিষয় বিদয়াত’’ রাসুলের এই কথার মধ্যে ব্যবহৃত কুল্লু তথা সকল শব্দকে সকল নতুন সৃষ্ট বিষয়ের উপর প্রয়োগ করতে অস্বীকৃতি জানায়। একইভাবে হাদিসের শেষে বলা হয়েছে সকল পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে অথচ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে শিরক ছাড়া অন্যান্য সকল পাপ ক্ষমা করা হতে পারে [নিসা/৪৮] । সুতরাং যে বিদয়াত শিরক কুফরের পর্যায়ে পড়ে

না সেটার কারণে কেউ জাহান্নামে যাবে কিনা সেটা নিশ্চিত নয় যেহেতু আল্লাহ কিয়ামতের প্রথম পর্বেই এধরণের ব্যাক্তিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন আর যদি তাকে প্রথমে ক্ষমা না করেন তবে জাহান্নামে কিছু কাল শাস্তি দেওয়ার পর পুনরায় সেখান থেকে বের করে আনবেন। এটাই খারেজী ও মু'তাজিলা সম্প্রাদয়ের বিপরীতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা। উদাহরণ স্বরূপ যারা সলাতের পর মোনাজাত করা বিদয়াত বলেন তারা কি এমন ব্যক্তিকে নিশ্চিত জাহান্নামী বলে ঘোষণা করবেন যে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর মোনাজাত করে? যদি মোনাজাত করা বিদয়াত এটা তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়াও হয় তবু এমন সম্ভাবনা কি নেই যে আল্লাহ এই ব্যক্তির অন্যান্য আমলের ওসীলায় তার এই পাপ ক্ষমা করবেন? তাহলে "সকল প্রকারের পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে যাবে" এই কথার মধ্যে ব্যাবহৃত সকল কথাটি কিছু ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য নয় যাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং কুল্লু শব্দটি এখানে সকল অর্থে গ্রহণ করা যাবে না।

দেখা যাচ্ছে খোদ বিদয়াত সম্পর্কিত হাদিসে উল্লেখিত তিনটি কুল্লুর মধ্যে আগের কুল্লু আর পরের কুল্লু সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না তবে মাঝের কুল্লুটি নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করার কি কারণ আছে?

জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে এই মাঝের কুল্লু তথা কুল্লু

বিদয়াতিন দালালাহ্ (كل بدعة ضلالة) বা সকল বিদয়াত পথভ্রষ্টতা এই কথার মধ্যে উল্লেখিত কুল্লু (كل) শব্দটিও সকল অর্থে প্রযোজ্য নয়। বিদয়াতের বিভিন্ন প্রকার ভাগ বর্ণনা করার পর ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

إِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْتُهُ عُلِمَ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ قَوْلُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فِي التَّرَاوِيحِ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ عَامًّا مَخْصُوصًا قَوْلُهُ كُلُّ بِدْعَةٍ مُؤَكَّدًا بِكُلِّ بَلْ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ مَعَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ

এটা জেনে নেওয়ার পর স্পষ্ট প্রকাশিত হবে যে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর এই হাদীসটি এবং এর মতো অন্যান্য হাদীসসমূহের ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং তা একটি নির্দিষ্ট সীমায় প্রযোজ্য। তারাবিহ্ সলাত সম্পর্কে উমর ﵁ যে, বলেছেন ‘‘এটা উত্তম বিদয়াত’’ এর মাধ্যমে আমাদের এই মতের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। রসুলুল্লাহ্ ﷺ যে কুল্লু (كل) বা সকল শব্দ ব্যবহার করে জোর দিয়ে বলেছেন, সকল বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা এটা এ ব্যাপারে (কিছু বিদয়াতকে খাস করার ব্যাপারে) কোনো বাধার সৃষ্টি করে না। কেননা কুল্লু (كل) বা সকল শব্দটি ব্যবহার করার পরও খাস হওয়া সম্ভব যেমন আল্লহ্ বলেন, ‘‘সে বাতাস সকল কিছুকে ধ্বংস করে দিয়েছিল’’ [আহকাফ/২৫] (ইমাম নাব্বীর উদ্দেশ্য হলো, এই আয়াতে সব কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এটা উদ্দেশ্য নয় যেহেতু কিয়ামতের আগে আকাশ-পৃথিবী সব কিছু

ধ্বংস হবে না।)

[শারহে মুসলিম]

এছাড়া আমরা ইমাম নাব্বী থেকে পূর্বে উল্লেখ করেছি যে তিনি বলেছেন, "যে কেউ ভাল রীতি নীতি চালু করে তাকে তার সওয়াব দেওয়া হয় এবং যে কেউ খারাপ রীতি নীতি চালু করে তার পাপ লেখা হয়" এই হাদিস দ্বারা "সকল বিদয়াত পথভ্রষ্টতা" এই হাদিসটি খাস হয়ে গেছে। অর্থাৎ পথভ্রষ্ট বিদয়াত বলতে কেবল খারাপ রীতি-নীতিকে বোঝায় ভাল রীতি-নীতিকে নয়।

পাঠকের স্মরনার্থে আমি আবার বলবো, বিদয়াত সম্পর্কিত আলোচনাতে বিদয়াতকে ভাগাভাগি করা বা না করার বিষয়টি খুব একটা জরুরী বিষয় নয়। এখানে মতপার্থক্য মূলত শাব্দিক। সাধারনভাবে এতটুকু সবাই স্বীকার করে যে কিছু বিষয় নতুন মনে হলেও সেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য। এখন এই সকল গ্রহণযোগ্য নতুন বিষয়গুলোকে কেউ বিদয়াত বলে কেউ বলে না। যারা বিদয়াত বলে তারা বলে এগুলো উত্তম বিদয়াত আর যারা বিদয়াত বলে না তারা বলে এগুলো উত্তম জিনস, বিদয়াত নয়। পার্থক্য আসলে এতটুকু। আমাদের কথা হলো প্রতিটি নতুন সৃষ্ট বিষয়কে শরীয়তের মূলনীতিতে বিচার করতে হবে। যদি শরীয়তের মূলনীতিতে বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য

হয় তবে সেটা ঘৃণিত বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে আর যদি শরীয়তের মূলনীতিতে গ্রহণযোগ্য হয় তবে সেটার উপর আমল করা যাবে সেটার নাম উত্তম বিদয়াতই বলা হোক বা উত্তম জিনিস বলা হোক তাতে মূল বিধানে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে বিদয়াত সম্পর্কিত আলোচনাতে বিদয়াতের ভাগা-ভাগি সম্পর্কে আলোচনা করা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এরপরও আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম মূলত দুটি উদ্দেশ্যে।

এক. যারা মনে করে ‘কুল্লু’ শব্দ সর্বাবস্থায় ‘সকল’ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এর কোনো বিকল্প নেই। অতএব, যেসব ওলামায়ে কিরাম বিদয়াতকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন তারা হাদিসকে পরিত্যাগ করেছেন রাসুলের নির্দেশকে অমান্য করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন সকল বিদয়াত পথভ্রষ্টতা আর তারা বলেছেন, কিছু বিদয়াত পথভ্রষ্টতা আর কিছু বিদয়াত উত্তম। আমরা প্রমাণ করেছি কুল্লু শব্দটি সব সময় সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না বরং অনেক সময় কিছু বিষয় এর আওতার বাইরে থেকে যায়। উসুলের পরিভাষা অনুযায়ী বিষয়টি আম-খাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। যারা এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ তারাই এ নিয়ে অত্যাধিক কড়াকড়ি করে থাকে। এভাবে আমরা পূর্ববর্তী বরেণ্য ওলামায়ে দ্বীনের বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছি আর তাদের যারা তিরষ্কার করে তাদের বোকামী ও অজ্ঞতা প্রমাণ করেছি। আমরা দেখেছি

পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীন যা করেছেন বুঝে-শুনেই করেছেন আর বর্তমানে যারা তাদের তিরষ্কার করছে তারা অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের মতো আচরণ করছে।

দুই. যারা বিদয়াতকে ভাগ করতে চাই না তারাও এটা মেনে নিতে বাধ্য যে, সাহাবায়ে কিরাম এবং পূর্ববর্তী নেককার ওলামায়ে দ্বীন বিদয়াত শব্দটি ভাল বিদয়াত অর্থে ব্যবহার করেছেন। উমর رضي الله عنه এর উপরোক্ত হাদিসটি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল। কেউ কেউ বলেন তিনি ভাষাভিত্তিক অর্থে বিদয়াতকে উত্তম বলেছেন। তাদের সাথে আমরা একমত যে উমর رضي الله عنه ভাষাভিত্তিক অর্থে উত্তম বিদয়াত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে এই ঘটনা প্রমাণ করে সাহবায়ে কিরাম কখনও কখনও ভাষাভিত্তিক অর্থেও বিদয়াত শব্দটি ব্যাবহার করতেন। সেক্ষেত্রে তারা যে বিষয়টিকে বিদয়াত বলছেন সেটার নিন্দা করছেন নাকি প্রশংসা করছেন তা বোঝার জন্য গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ইবনে হাযার আসক্বালানী رحمه الله ফাতহুল বারীতে এ বিষয়ক একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে জুময়ার সলাতে অন্যান্য সলাতের মতো একটি আজান দেওয়ার রীতি চালু ছিল। উসমান رضي الله عنه জুময়ার দিনে দ্বিতীয় আজান চালু করেন [বুখারী ও মুসলিম]। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে তিনি এই বিষয়টিকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন [মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা]। ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী رحمه الله এ

সম্পর্কে বলেন,

فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك

এখানে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে ইবনে উমর ﵁ বিষয়টিকে নিন্দা করে বিদয়াত বলেছেন আবার এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তিনি কেবল রাসুলের জামানায় ছিল না একারণে এটাকে বিদয়াত বলেছেন (বিষয়টি নিন্দনীয় এটা বোঝানোর জন্য নয়)। যেহেতু রাসুলের জামানায় ছিল না এমন প্রতিটি জিনিসকে বিদয়াত বলা যায় কিন্তু তার মধ্যে কিছু বিষয় ভাল আর অন্য কিছু বিষয় মন্দ। [ফাতহুল বারী]

চিন্তা করলে দেখা যাবে ইবনে উমর ﵁ এর কথার মধ্যে বিদয়াত শব্দটি উত্তম বিদয়াত অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যেহেতু তৃতীয় খলীফা উসমান ﵁ যে কাজটি চালু করেছেন আর অন্যান্য সকল সাহবায়ে কিরাম যে কাজটিকে মেনে নিয়েছেন ইবনে উমর ﵁ সেটাকে নিন্দনীয় বিদয়াত বলতে পারেন না। যাই হোক, এই ঘটনা প্রমাণ করে, কোনো একজন সাহাবী বা পূর্ববর্তী কোনো একজন আলেম কোনো বিষয়কে বিদয়াত বললেই তিনি বিষয়টিকে নিন্দা করছনে কিনা তা নিশ্চিত নয়। এখানে লক্ষ্য করতে হবে তিনি কি অর্থে বিদয়াত শব্দ প্রয়োগ করেছেন ভাষাভিত্তিক অর্থে নাকি শরীয়তে

নিন্দনীয় বিদয়াত অর্থে। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের পরবর্তী যুগের ওলামায়ে দ্বীন বিদয়াত শব্দটি ভালো মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাই তাদের মতামত নিয়ে আলোচনার সময় সর্বাবস্থায় বিদয়াত শব্দটি মন্দ বিদয়াত অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। বরং তাদের কথার সঠিক অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। কোনো ব্যাক্তির কথা বুঝতে হলে তিনি যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করেন শব্দটির সেই অর্থকে সামনে রেখে কথাটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে আমরা শব্দটির যে অর্থ বুঝি তার আলোকে নয়। সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মন্তব্য উল্লেখ করার সময় এই বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

এ দুটি বিষয় স্মরণ রাখলে বিদয়াতকে ভাগ করা বা না করার কারণে আমরা কাউকে তিরষ্কার করবো না। যেহেতু বিদয়াতকে ভাল মন্দ দুটি ভাগে বিভক্ত করা বা না করার বিষয়টি মূলত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কারণ উভয় পক্ষই একমত যে, ভাষাভিত্তিকভাবে বিদয়াত অর্থ সকল নতুন সৃষ্ট বিষয়। কিন্তু নতুন সৃষ্ট সকল বিষয় কোনো পক্ষের নিকটই নিন্দনীয় ও বর্জনীয় নয়। বরং তারা একমত যে নতুন সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে কিছু বিষয় বৈধ ও কিছু বিষয় অবৈধ। তাহলে ভাষাভত্তিকভাবে বিদয়াত দুটি ভাগে বিভক্ত এটা সকলে স্বীকার করছে। আবার রাসুলুল্লাহ ﷺ যে ধরনের বিদয়াতকে পথভ্রষ্টতা হিসেবে

আখ্যায়িত করেছেন সেগুলোকে কেউ ভাল বলতে পারে না যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ যে বিষয়কে পথভ্রষ্টতা বলবেন তা ভাল বলার অধিকার কারো নেই। সুতরাং শরীয়ত যে অর্থে বিদয়াতকে পথভ্রষ্টতা বলছে তার মধ্যে ভাল খাবাপ কোনো ভাগ নেই এ বিষয়ে সকলে একমত। এখানে দ্বিমত মুলত এ বিষয়ে যে নতুন সৃষ্ট কোন বিষয়টি নিন্দনীয় হবে আর কোনটি প্রশংসিত হবে। সুতরাং বিদয়াতের বিভক্তি সম্পর্কে আলোচনা পরিত্যাগ করে আমাদের উচিৎ নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহ গ্রহণ করা বা বর্জন করার মূলনীতি কি হবে সেটা নিয়ে চিন্তা করা তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ। উপরে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং সামনের আলোচনাতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করার ইচ্ছা রাখি। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৩. রাসুলুল্লাহ ﷺ এর চুল ভেজা পানি দ্বারা রোগমুক্তি কামনা।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে উম্মে সালামা رضي الله عنها এর নিকট রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কিছু চুল একটি রুপার পাত্রে সংরক্ষিত ছিল। মানুষের দৃষ্টি লাগলে বা অন্য কোনো সমস্যা হলে তারা একটি পাত্র নিয়ে তার কাছে আসতো। তিনি রসুলুল্লাহ ﷺ এর চুল ভেজানো পানি তাদের দিতেন। এবং মানুষ ঐ চুল ভেজানো

পানি রোগ মুক্তির আশায় পান করতো।

৪. রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জামা ভেজা পানি দ্বারা রোগমুক্তি কামনা।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, আসমা رضي الله عنها একটি বস্ত্র নিয়ে এসে বললেন,

هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا

আয়েশা رضي الله عنها মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত এটা তার নিকট ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা পরিধান করতেন। রোগাগ্রস্থ ব্যক্তির রোগমুক্তির জন্য আমরা এটা ধৌত করি।

৫. রাসুলুল্লাহ ﷺ এর চুল সাথে রেখে বিজয় কামনা।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصرة

রাসুলুল্লাহ ﷺ একবার উমরা করেন। তিনি মাথার চুল কামিয়ে ফেললে মানুষ তার মাথার চুল সংগ্রহ করতে শুরু করে। আমি সবার আগে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মাথার সামনের দিকের চুলগুলো সংগ্রহ করে এটা এই টুপির মধ্যে রেখে দিয়েছি। এখন আমি

এটা সাথে নিয়ে যে যুদ্ধেই গমণ করি আমাকে বিজয় দেওয়া হয়। [তিবরানী]

আল-হাইছামী বলেন, এই হাদীসের রাবীরা সহীহ হাদীসের রাবী।

এই সকল হাদীসে দেখা যায় আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম রোগ মুক্তি, যুদ্ধে বিজয় লাভ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা এ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে চালু ছিল না। কোনো রোগীর রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে নিজের চুল বা কাপর ভেজানো পানি রাসুলুল্লাহ ﷺ কাউকে পান করতে বা শরীরে মাখতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা যায় না। একইভাবে যুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ এর চুল মোবারোক টুপির মধ্যে রেখে যুদ্ধ যাত্রা করার বিষয়টিও সরাসরি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কথার মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। তবে যেহেতু সামগ্রিকভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর মাধ্যমে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করা সম্পর্কে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে তাই এ বিষয়ে যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা বৈধ হয়েছে। নাম ধরে ধরে প্রতিটি পন্থা-পদ্ধতির স্বপক্ষে দলিল প্রমাণ থাকা জরুরী নয়। এটা জেনে নেওয়ার পর ঐ সকল লোকদের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা কি হতে পারে যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নামের ওসীলায় দোয়া করা

বিদয়াত বা শিরক-কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে? সরাসরি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নামের ওসিলায় দোয়া করার বৈধতা সম্পর্কে প্রমাণ না থাকলেও রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ের ওসীলায় দোয়া করার প্রমাণ থাকাই কি এ বিষয়ে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয়? রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নাম কি তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নয়? কোনো বিষয় হাদিসে উল্লেখ থাকা বলতে কি সরাসরি নাম ধরে উল্লেখ থাকা বোঝায়! ঐ বিষয়ে মূলনীতি বর্ণিত হওয়াই কি যথেষ্ট নয়?

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে

ما تنخم رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه

রাসুলুল্লাহ ﷺ যদি থুথু বা কফ ফেলতেন তবে কোনো না কোনো সাহাবী সেটা হাত পেতে গ্রহণ করতেন এবং নিজের মুখ ও শরীরে সেটা মেখে নিতেন। তিনি কোনো আদেশ করলে তড়িঘড়ি করে তা পালন করতেন আর তিনি যখন ওজু করতেন তার ওজুর অবশিষ্ট পানি গ্রহণ করার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যেতো। [সহীহ বুখারী]

রাসুলুল্লাহ ﷺ কি এসব করতে আদেশ করেছিলেন? তিনি কি বলেছিলেন আমার ওজুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে, আমার থুথু গায়ে মেখে নেবে? সব কিছুই কি নাম ধরে ধরে

বলে দিতে হয়?

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে রসুলূল্লাহ একদিন উম্মে সুলাইমের ঘরে নিদ্রারত ছিলেন। উম্মে সুলাইম এসে দেখলেন রসুলুল্লাহ্ ﷺ ঘেমে গেছেন। তিনি একটি কাচের পত্রে রসুলুল্লাহ ﷺ এর ঘাম গুলো তুলে নিচ্ছিলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ এটা দেখে বললেন তুমি কি করছো? উম্মে সুলাইম বললেন, (يَا رَسُولَ اللهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا) "আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য আমরা এর বরকত কামনা করছি হে আল্লাহর রসুল" এটা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (أصبت) তুমি ঠিকই করেছো।

লক্ষণীয় বিষয় হলো উম্মে সুলাইম رضي الله عنها ঘাম সংগ্রহ করা এবং সেটার ওসীলায় ছোট বাচ্চারা রোগবালাই-কুদৃষ্টি ইত্যাদি অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবে এমন মনে করার পূর্বে কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট অনুমতি গ্রহণ করেন নি। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ঘাম থেকে বরকত গ্রহণ করা যায় কিনা এটা তিনি আলাদাভাবে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন নি। কারণ তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, যার থুথু বা কফ গায়ে মেখে নিলে বরকত হয় তার ঘামেও বরকত হবে। এর জন্য আলাদা করে প্রশ্ন করা বোকামী ছাড়া কিছু নয়।

আমরা বলবো, যে রাসুলের ঘামের ওসীলায় আল্লাহ কল্যাণ করেন তার নামের ওসীলায়ও কল্যাণ হবে। এর জন্য আলাদা

দলিল লাগবে না। আলাদা দলিল তালাশ করা সঠিক পন্থা নয়।

৬. হজ্জের তালবিয়াতে ইবনে উমর ﵁ এর কিছু শব্দ যোগ করার ঘটনা।

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তালিবয়া উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে,

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا: " لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ এর মধ্যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে বলতেন, লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক ওয়াল খায়রু বিইয়াদাইদ, লাব্বাইক ওয়ার রাগবা ইলাইক ওয়াল আমাল''

৭. তাশাহুদে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ এর কিছু শব্দ যোগ করার ঘটনা।

আবু দাউদ শরীফে ইবনে উমর ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাশাহুদের বর্ণনা দিয়ে বলেন, (زدت فيها وبركاته) আমি তার মধ্যে ''রাহমাতুল্লাহি'' এর পর ওয়া বরাকাতুহু যোগ করে নিয়েছি। তিনি আরো বলেন, (زِدْتُ فِيهَا: وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পর ''ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু'' যোগ করে নিয়েছি। [আবু দাউদ]

ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার আসক্বালানী এই হাদীসটিকে

সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যান্য বর্ণনাতে রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে এইসকল শব্দসহ তাশাহুদ বর্ণিত আছে তবে এটা স্পষ্ট যে ইবনে উমর رضي الله عنه ঐ সকল বর্ণনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। যেহেতু তিনি বলেছেন আমি নিজে তাতে এগুলো বৃদ্ধি করেছি। রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি এটা প্রমাণিত এমন জানা থাকলে তিনি একথা বলতেন না। একারণে ইবনে হাযার আসক্কালানী رحمه الله বলেন,

وفي حديث بن عمر عند الدارقطني إلا أن سنده ضعيف وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن بن عمر في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله قال بن عمر زدت فيها وحده لا شريك له وهذا ظاهره الوقف

দারে কুতনী ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে মারফু ভাবে এই বাড়তি অংশ বর্ণনা করেছেন তবে সে বর্ণনাটির সনদ দূর্বল আর আবু দাউদে বর্ণিত একটি সহীহ সনদে এসেছে, ইবনে উমর رضي الله عنه বলেছেন, আমি তাশাহুদের মধ্যে ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু অতিরিক্ত যোগ করেছি। এতে বোঝা যায় এটা ইবনে উমর رضي الله عنه এর নিজের বক্তব্য। [ফাতহুল বারী]

৮. তাশাহুদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه এর কিছু শব্দ যোগ করার ঘটনা।

তিবরাণী বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ رضي الله عنه তাশাহুদে বলতেন (سلام علينا من ربنا) "আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদের উপর

সালাম।”

আল-হাইছামী বলেছেন এই হাদীসের রাবীরা সহীহ হাদীসের রাবী।

রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে তাশাহুদের যেসব বর্ণনা আছে তাতে “আমাদের রবের পক্ষ থেকে” অংশটি উল্লেখ নেই। ইবনে মাসউদ رضي الله عنه এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে এটা বর্ণনা করেন নি। তবে ইবনে মাসউদ رضي الله عنه নিজে তাশাহুদ পাঠ করার সময় এটা পড়তেন। যেহেতু এধরণের বাড়তি শব্দ পাঠ করাতে কোনো দোষ নেই বরং রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে এর অনুমতি রয়েছে যেমনটি আমরা পূর্বে দেখেছি।

৯. আনাস رضي الله عنه এর কুরআন খতমের পর স্ত্রী-সন্তানদের একত্রিত করে দোয়া করার ঘটনা।

তিবরানী বর্ণনা করেন,

أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم

আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه যখন কুরআন খতম করতেন তার পরিবার-পরিজন ও স্ত্রী-সন্তানদের একত্রিত করে তাদের জন্য দোয়া করতেন।

আল-হাইছামী বলেন, (رجاله ثقات) এই হাদীসের রাবীরা বিশ্বস্ত।

১০. আরাফাতের দিন ইবনে আব্বাস ﵁ মানুষদের একত্রিত করে দোয়া ও যিকির করার রেওয়াজ চালু করেন।

আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে আবি শায়বা তাদের মুসান্নাফে হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন,

أول من عرف بالبصرة بن عباس

বসরাতে আরাফাতের দিন মানুষকে একত্রিত করার রেওয়াজ প্রথম চালু করেন ইবনে আব্বাস।

এটি একটি প্রশিদ্ধ ঘটনা। ইবনে কাছির ﵀ বলেন,

وهو أول من عرف بالناس في البصرة، فكان يصعد المنبر ليلة عرفة ويجتمع أهل البصرة حوله فيفسر شيئا من القرآن، ويذكر الناس من بعد العصر إلى الغروب، ثم ينزل فيصلي بهم المغرب،

তিনি (ইবনে আব্বাস) প্রথম বসরাতে আরাফাতের দিন মানুষকে একত্রিত করার প্রথা চালু করেন। তিনি মিম্বরে আরোহন করতেন আর মানুষ তার নিকট একত্রিত হতো। তিনি তাদের কুরআনের তাফসীর শোনাতেন এবং বিভিন্ন প্রকার উপদেশ দিতেন। এটা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত চলতো পরে তিনি তাদের নিয়ে মাগরিবের সলাত আদায় করতেন। [আল বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া]

পরবর্তীতে ওলামায়ে কিরামের একটি অংশ এটা অপছন্দ করেছেন আর অন্য একটি অংশ এটাকে পছন্দ করেছেন। যারা অপছন্দ করেছেন তারা মূলত একারণে অপছন্দ করেছেন যে হয়তো মানুষ এই কাজটিকে দ্বীনের বিশেষ অংশ মনে করবে অথচ আসলে তা নয়। আর যারা পছন্দ করেছেন তারা কিছুটা শর্তস্বাপেক্ষে বিষয়টির অনুমতি দিয়েছেন। যেমন প্রতি বছর এটা না করা বা সম্মানিত ব্যক্তিরা অনুপস্থিত থাকা ইত্যাদি।

ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত আছে তিনি বিষয়টিকে অপছন্দ করেছেন। তবে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে বর্ণিত আছে তাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

لا بأس به إنما هو دعاء وذكر الله فقيل له تفعله أنت قال : أما أنا فلا

এতে কোনো সমস্যা নেই এটা তো দোয়া আর যিকির। তখন তাকে বলা হলো তবে আপনি কি অংশগ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, আমি নিজে এতে অংশগ্রহণ করবো না। [আল-মুগনী]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের এই কথাটির মধ্যে দুটি শিক্ষা পাওয়া যায় যা আমরা পূর্বেও বলেছি আর তা হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি প্রমাণিত নয় এমন বিষয় যদি শরীয়তের বিপরীত না হয় তবে তা মূলত বৈধ কিন্তু এমনভাবে তা আদায় করা উচিৎ নয় যাতে মানুষ মনে করে এটা রাসুলুল্লাহর সুন্নাত এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ যা

করেন নি বা করতে বলেন নি সেটাকে সুন্নাত নামকরণ করা বা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান মনে করা ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা হিসেবে গণ্য আর এধরণের ভুল ধারণাই মূলত বিদয়াত। একারণেই মূলত আহমাদ ইবনে হাম্বাল এ কাজে মৌখিক অনুমতি দেওয়া স্বত্ত্বেও নিজে অংশ গ্রহণ করেন নি যাতে মানুষ বুঝতে পারে এটা আল্লাহ বা আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। যেমন বেশ কিছু সাহাবা কুরবানী দেওয়ার সামর্থ থাকা স্বত্ত্বেও নিজেরা কুরবানী দেন নি যাতে মানুষ বুঝতে পারে এটা ফরজ নয়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের এই মধ্যম পন্থাটি অতীব সুন্দর। কাজটি সধারনভাবে বৈধ তবে এমন আশঙ্কা রয়েছে যে মানুষ হয়তো বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিধান মনে করে বসবে অতএব, এই ভুল ধারনার পথ বন্ধ করে এতে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি সুন্দর সমাধান। কেউ কেউ অবশ্য এসব বিষয় গোড়া শুদ্ধ উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত প্রশান্তি অনুভব করেন না। দু-দশজন লোক মসজিদে বা অন্য কোথাও একত্রিত হয়ে একটু যিকির-আজকার বা দোয়া মোনাজাত করা শুরু করলেই এদের মাথা গরম হয়ে যায়। বিদয়াত-বিদয়াত করে চিৎকার করে পরিবেশ দুষণ করে ফেলে। প্রয়োজনে সাধারন মুসলিমদের সাথে লাঠা-লাঠিতে লিপ্ত হয়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, রক্তা-রক্তি ঘটায়। এর মাধ্যমে

যে, আসলে বিদয়াতের পথ বন্ধ করার পরিবর্তে ফিতনার পথ খুলে যায় এটা তাদের মাথায় ধরে না।

বিপরীত দিকে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা সাধারন মুসলিমদের মধ্যে নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহ বিনা-বিচারে প্রচার-প্রসার করেন। এ ব্যাপারে তারা না কোনোরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন আর না কোনো শর্ত আরোপ করেন। ফলে কিছু দিন পরই দেখা যায় মানুষ সেসব বিষয়কে ফরজ-ওয়াজিব বা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত মনে করছে। ঐ সকল বিষয় কেউ পরিত্যাগ করলে তাকে ফাসিক-ফুজ্জার বা মুনাফিক বলে গালি দিচ্ছে। সন্দেহ নেই যে, এধরণের অবস্থা সৃষ্টি হলে বিষয়টি বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। উদহরণস্বরুপ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের শেষে মোনাজাত করা সম্পর্কে একসময় মানুষ ধারণা করতো এটা সলাতের অংশ বা কমপক্ষে সুন্নাত। আলেম-ওলামারা এসব বিষয়ে সাধারন মানুষকে অবহিত না করার কারণে তারা এমন ধারনা করতো। আল্লাহর প্রশংসা যে বর্তমানে এসব ধারনা মানুষের মধ্যে নেই। তবে সাধারন মুসলিমরা এখনও পর্যন্ত একটি বিষয়ে কড়া-কড়ি করে থাকে। কোনো ইমাম সাহেব সলাতের শেষে মোনাজাত না করলে তারা এটা সহ্য করে না। মোনাজাত করা ফরজ বা সুন্নাত নয় এটা তারা স্বীকার করে কিন্তু তারা বলে কম পক্ষে এটা তো ভাল কাজ অতএব, এটা চালিয়ে যেতে হবে। এ ধরণের সমস্যার মোকাবিলায় অভিজ্ঞ

ওলামায়ে কিরামের উচিৎ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বেশিরভাগ মানুষ এখানে একটা ছোট ভুল করে ফেলেন। একশ্রেণীর ইমাম রয়েছে যারা পেটের দায়ে ইমামতি করেন। সাধারন মানুষ যেটা পছন্দ করে নিরবে সেটাই করতে থাকেন। কোনো অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করার মানসিকতা তাদের নেই। বিপরীত দিকে একদল আবেগী লোক রয়েছে যারা এ ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা করে থাকে। তারা বলে, যেহেতু এরা মোনাজাত ছাড়তে চাচ্ছে না অতএব, এরা বিষয়টাকে ফরজ মনে করে, তাছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা করেন নি অতএব এটা বিদয়াত ও বড় মাপের পাপ। এমন ধারণার কারণে তারা একটি বারের জন্যই হাত তুলে মোনাজাত করতে রাজি হয় না আর সাধারন জনগনকেও হাত তুলে মোনাজাত করার অনুমতি দেয় না। শুধু তাই নয় যেসব ইমাম-মুয়াজ্জিন বা আলেম-ওলামারা হাত তুলে মোনাজাত করে বা এটা করা বৈধ বলে তাদের ভীষণ কর্কষ ভাষায় নিন্দা করে। এর ফলে সাধারন মুসলিমরা তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাদের কথা শোনা তো দূরের কথা তাদের নাম শুনলেও তারা রেগে আগুণ হয়ে যায়। এভাবে মুসলিমরা দুটি দলে বিভক্ত হয়। উভয় পক্ষ নিজেদের স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণ পেশ করতে শুরু করে। এক পক্ষ বাড়া-বাড়ি করে বলে, আলেম-ওলামা, ওলী-বুযুর্গ যে কেউ সলাতের শেষে মোনাজাত করে সে বিদয়াতী এবং জাহান্নামী। এর পরিপ্রেক্ষিতে

অন্য পক্ষ বলে, মোনাজাত যে করে না তার নামাজই হয় না। এভাবে একটি পক্ষ বিদয়াতের ব্যাপারে কড়াকড়ি করার কারণে অন্য পক্ষ বিদয়াতকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে। এতে দুটি দলই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অথচ একটু ধীর মস্তিষ্কে বুঝে শুনে কাজ করলে এই উভমুখী ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। একটি গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানো যায়।

- এক দরিদ্র চাষা মাঠে কাজ-কর্ম করে বাড়ি ফেরার সময় একটি ডিম কিনে আনলো। সে মনে মনে ভাবছিল, আজ বাড়ি গিয়ে বেশ মজা করে ডিম ভাজা খাওয়া যাবে। কিন্তু বাড়ি গিয়ে ডিমটি রাখতেই তার ছোট বাচ্চা ডিমটি হাতে তুলে নিলো। বাচ্চা ছেলে ডিম ভেঙে ফেলতে পারে এমন মনে করে চাষা তাড়া-হুড়া করে হাত বাড়িয়ে ডিমটি তার কাছ থেকে নিতে গেলো আর চেচিয়ে বলল,

- ডিমটা দিয়ে দে বলছি।

এত সুন্দর জিনিসটা এখনই হাতছাড়া হয়ে যাবে দেখে ছেলেটা দুহাত দিয়ে সজোরে ডিমটা চেপে ধরলো আর তখনই ঘটে গেলো বিপত্তি। মচমচ করে ডিমটা ভেঙে গেলো আর ভিতরে যা ছিল সব গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। চাষার মথায় এবার রাগ চড়ে গেলো বড় একটা লাঠি এনে ছেলেটাকে পিটাতে যাবে এমন সময় তার বৌ এসে হাজির। সব দেখে-শুনে সে বলল,

- ছেলেটার কোনো দোষ নেই দোষ তোমারই। বাচ্চা ছেলেদের কাছ থেকে কিভাবে ডিম নিতে হয় তা তোমার জানা নেই। আমি থাকলে দেখতে কিভাবে ডিমটা নিয়ে নিতাম।

কথা শুনে চাষীর রাগ দ্বিগুন হয়ে গেলো। সে মনে মনে ভাবলো, এবার দুটোকেই উচিৎ শিক্ষা দেবো। কাউকে কিছু না বলে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর আর একটা ডিম এনে ছেলের তাতে দিয়ে বৌকে বলল,

- এবার ওর কাছ থেকে ডিমটা নিয়ে নাও দেখি।

কৃষকের বৌ ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল,

- বাহ্! খুব সুন্দর ডিম তো! এই ডিম কার?

ছেলেটা কিছুমাত্র দেরি না করে বলল,

- আমার ডিম।

- ডিম কি করতে হয়?

- ভেজে খেতে হয়

- তাহলে আমাকে দাও আমি ভেজে দিই।

ছেলেটি আর কথা না বাড়িয়ে মায়ের হাতে ডিমটা তুলে দিলো।

সাধারন মানুষের সাথে আচরণ করতে হয় অনেকটা এরকম।

তাড়াহুড়া করে কিছু করতে গেলে তারাও বেঁকে বসে। তাড়া-হুড়া বা কঠোরতা না করে শরীয়তের সীমার মধ্যে তাদের সময় সুযোগ দেওয়া উচিৎ। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও এমন পন্থা অবলম্বন করতেন অন্যকে একই রাস্তা অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন,

بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

মানুষকে সুসংবাদ দাও তাদের উত্তেজিত করো না। মানুষের জন্য সহজ করো তাদের উপর কঠোরতা করো না। [বুখারী ও মুসলিম]

এখানে সঠিক পন্থা হলো, যেহেতু মূল বিষয়টি বৈধ কিন্তু এটাকে ফরজ বা সুন্নত মনে করার কারণে তা বিদয়াতে পরিণত হচ্ছে আবার বিষয়টি ফরজ বা সুন্নাত নয় এটা বোঝালে মানুষ তা মেনে নিচ্ছে তবে বিষয়টি পরিত্যাগ করতে চাচ্ছে না। তাহলে তাদের আক্বীদা সঠিক রয়েছে। সুতরাং বিষয়টি ঘোরতর অপরাধ নয়। অনেকে বলেন, তারা মুখে বললেও আসলে তারা বিষয়টিকে ফরজই মনে করে তা না হলে তারা এটা পরিত্যাগ করতে চাচ্ছে না কেনো। এ মন্তব্য সঠিক নয়। যেহেতু আমরা পূর্বে দেখেছি একজন সাহাবী প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম বিষয়টির উপর প্রতিবাদ করার পরও তিনি তা পরিত্যাগ করেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি

এমন কথাও বলেছেন যে প্রয়োজনে আমি ইমামতি পরিত্যাগ করবো তবু একাজ পরিত্যাগ করতে পারবো না [সহীহ বুখারী]। এই সাহাবা প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করা ফরজ বা সুন্নাত মনে করতেন এখানে এমন বলার সুযোগ আছে কি? তাছাড়া বর্তমানে দেখা যায় যারা মসজিদে সলাত আদায় করে তাদের সবাই মোনাজাতে শরীক হয় এমন নয়। তাদের একটি অংশ উঠে যায় আর একটি অংশ মোনাজাত করে। যারা উঠে যায় তাদের কেউ নিন্দা বা তিরষ্কার করে না। বরং যে ব্যক্তি আজ মোনাজাত করলো সে হয়তো আগামী কাল করবে না। কিন্তু একটু খোঁজ খবর করলেই দেখা যাবে যারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়ে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তারা কেউই ফরজ সলাতের আগে পরে যে সুন্নাত আছে তা পরিত্যাগ করে না, বিতরের সলাত তো নয়ই। এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে বর্তমান যুগের সাধারন মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের শেষে মোনাজাত করা ফরজ তো নয়ই এমন কি সুন্নাতও মনে করে না। যারা বলে, মানুষ মোনাজাতকে ফরজ বা সুন্নাত মনে করে তারা বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত না হয়েই এ মন্তব্য করে। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত মোনাজাত সাধারনভাবে বিদয়াতী কোনো কাজ নয়। যেহেতু এর সাথে কোনো ভুল বুঝ প্রচলিত নেই। তবে একটা আশঙ্কা থেকে যায় যে নিয়মিত মোনাজাত চলতে থাকলে কিছু কাল পর পুনরায় এ সম্পর্কিত ভুল বুঝ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু

এ যুক্তিতে মোনাজাতকে এখনই গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। যেহেতু এর কারণে ব্যাপক ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে। এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে ভবিষ্যতে একটি সমস্যা হতে পারে এই আশঙ্কায় এখনই সমস্যা বাঁধিয়ে দেওয়া সঠিক পন্থা নয়। তাছাড়া সমস্যা সমাধানের আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে একসময় মানুষের মধ্যে মোনাজাত সম্পর্কে ভুল ধারনা ছিল এখন আর নেই। কারণ বেশ কিছু কাল ধরে বরেণ্য আলেম-ওলামারা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে আসছেন। যদি তারা এধরনের আলোচনা চালিয়ে যান তবে মানুষ আর কখনও ভুল ধারনায় ফিরে যাবে না। এর জন্য মোনাজাতকে পরিত্যাগ করতেই হবে এমন নয়। বরং মানুষকে বিষয়টির সঠিক বিধান সম্পর্কে অবহিত করলেই তারা এ বিষয়ে ভুল ধারনা করা হতে বিরত থাকবে। ফলে আস্তে আস্তে তারা এটা পরিত্যাগ করতে রাজি হবে। তখন মাঝে মাঝে মোনাজাত পরিত্যাগ করা বা ইচ্ছা করলে পুরোপরি মোনাজাত তুলে দেওয়া যেতে পারে। আবার যদি কোনো একটি এলাকার কিছু মসজিদে মোনাজাত চলে আর কিছু মসজিদে না চলে তবে সেটাও উত্তম যদি তারা একে অপরকে গালা-গালি না করে। মোট কথা রাসুলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবায়ে কিরাম অমুক কাজ করেন নি অতএব, সেটা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এমন মন্তব্য করে সাধারন

মুসলিমদের বিভ্রান্ত করা বা ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা অপেক্ষা মধ্যম পন্থায় সংশোধনের চেষ্টা করাই অধিক সহজ ও ফলপ্রসু।

১১. সাহাবায়ে কিরাম নতুন মাস বা বছর শুরু হলে দোয়া করতেন।

তিবরানী বর্ণনা করেন,

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يتعلمون هذا الدعاء إذا دخلت السنة أو الشهر اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان

যখন নতুন বছর বা নতুন মাস শুরু হতো তখন রসুলুল্লাহর সাহাবীরা এই দোয়াটি একে অপরকে শেখাতেন, হে আল্লাহ এতে (নতুন মাস বা বছরে) আমাদের ঈমান ও আমান (নিরাপত্তা) বজায় রাখো। তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে আমাদের রক্ষা করো।

আল-হাইছামী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

এই ঘটনার মধ্যে দোয়া-দরুদ পাঠ করা বা অন্য কোনো বৈধ পন্থায় আরবী নববর্ষ পালন করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

১২. উসমান ﵁ জুময়ার দিন অতিরিক্ত একটি আজান চালু করেন।

সহীহ বুখারীতে এসেছে,

كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ

আল্লাহর রাসুল ﷺ , আবু বকর ؓ ও উমর ؓ এর যুগে ইমাম সাহেব মিম্বারের উপর বসার পরই প্রথম আজান দেওয়া হতো। যখন উসমান ؓ খলীফা হলেন, এবং মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো তিনি যাওরা নামক বাজারে বাড়তি একটি আজান চালু করেন।

১৩. আবু বকর ؓ মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সুরা আলে ইমরানের একটি আয়াত তেলোয়াত করতেন।

মুয়াত্তা মালিকে বর্ণিত আছে আবু বকর ؓ তার খেলাফত কালে মাগরিবের সলাতে প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহা ও আরেকটি সূরা পাঠ করতেন। তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করে সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতটি পাঠ করতেন, (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) "হে আল্লাহ হেদায়েত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিয়ো না।"

মুসান্নাফে আব্দির রজ্জাকে এই হাদিস বর্ণনা করার পর অতিরিক্ত এসেছে, উমর ইবনে আব্দিল আজিজ ﵀ এই হাদিস শোনার পূর্বে মাগরিবের শেষ রাকাতে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ তথা সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। এই হাদিস শোনার পর তিনি তা পরিত্যাগ করে আবু বকর ﵁ এর মতো আমল করতে শুরু করেন।

এই হাদীসে দেখা যায় আবু বকর ﵁ মাগরিবের তৃতিয় রাকাতের একটি নির্দিষ্ট আয়াত তেলোয়াত করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ নিজে মাগরিবের তৃতীয় রকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন পরবর্তীতে আবু বকর ﵁ এর আমলটি গ্রহণ করেন। এধরণের কাজ বিদয়াতের পর্যায়ে গণ্য নয় যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই বিভিন্ন সাহাবাকে ইচ্ছামতো কোনো একটি সূরা নির্দিষ্ট করে পাঠ করার ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। যেমনটি আমরা পূর্বে বেশ কিছু হাদীসে দেখেছি।

১৪. উসমান ﵁ এর সময় মসজিদে নব্বীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মসজিদে নাব্বী ছিল কাঁচা ইটের তৈরী উপরে ছিল খেজুরের পাতার ছাউনি খুটি গুলো ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর ﵁ এর সময়ও অনুরূপ

ছিল। উমর ﵁ মসজিদের দৈর্ঘ্য কিছুটা বৃদ্ধি করেন তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ যেভাবে নির্মাণ করেছিলেন অনুরূপভাবে কাঁচা ইট ও খেজুর পাতার ছাউনি দিয়েছিলেন। তবে উসমান ﵁ তার খেলাফতকালে মসজিদের চেহারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। তিনি নকশা করা পাথরে চুনকাম করে মসজিদের দেওয়াল নির্মাণ করেন, তার খুটিগুলোও করেন নকশা করা পাথরে আর তার উপরে ছাউনি দেন সেগুন কাঠের।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন,

قال بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ الْقَصْدُ وَتَرْكُ الْغُلُوِّ فِي تَحْسِينِهِ فَقَدْ كَانَ عُمَرُ مَعَ كَثْرَةِ الْفُتُوحِ فِي أَيَّامِهِ وَسَعَةِ الْمَالِ عِنْدَهُ لَمْ يُغَيِّرِ الْمَسْجِدَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى تَجْدِيدِهِ لِأَنَّ جَرِيدَ النَّخْلِ كَانَ قَدْ نَخَرَ فِي أَيَّامِهِ ثُمَّ كَانَ عُثْمَانُ وَالْمَالُ فِي زمانه أكثر فحسنه بمالا يَقْتَضِي الزَّخْرَفَةَ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ

ইবনে বাত্তাল ও অন্যান্যরা বলেছেন, এই হাদিস প্রমাণ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত ছিল মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে যথাসম্ভব অতিরিক্ত ব্যায় এড়িয়ে চলা। এবং মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা। একারণে উমর ﵁ এর যুগে বিভিন্ন দেশ বিজয় ও অধিক সম্পদ হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মসজিদের পূর্বের রূপে কোনো পরিবর্তন আনেন নি। তিনি কেবল খেজুরের পাতাগুলো পরিবর্তন করেছিলেন কারন তার খেলাফতকালে সেগুলো পঁচে গিয়েছিল। এরপর উসমান ﵁ এর

যুগে সম্পদ আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি মসজিদটির সৌন্দর্য এমনভাবে বৃদ্ধি করেন যা অতিরিক্ত সাজ-সজ্জার পর্যায়ে পড়ে না। এরপরও কিছু সংখ্যক সাহাবী এ ব্যাপারে তাকে তিরষ্কার করেন। [ফাতহুল বারী]

মোট কথা, উসমান ﵁ যা করেছিলেন তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য নয় যদিও রাসুলুল্লাহ ﷺ ও দুই খলীফার আমল ছিল এর বিপরীত। বর্তমানেও কাঁচা ইট বা খেজুরের পাতার ছাউনির পরিবর্তে পাঁকা মসজিদ নির্মাণ করা বিদয়াত হিসেবে গণ্য নয়। যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশনার মধ্যে মসজিদ নির্মাণ করার ব্যাপারে সাধারনভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে তবে মসজিদের সাজ-সজ্জার মধ্যে অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোনটি অতিরঞ্জন আর কোনটি স্বাভাবিক সেটা অনেক সময় যুগের উপর নির্ভর করে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

১৫. ইবনে মাসউদ ﵁ প্রতি বৃহষ্পতিবার মানুষদের দ্বীন শিক্ষা দিতেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে,

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ

ইবনে মাসউদ ﵁ প্রতি বৃহষ্পতিবার মানুষকে ওয়াজ-নসীহত শুনাতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ জুমুয়ার দিনের খুতবা ছাড়া এভাবে কোনো নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত বক্তব্য দিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয় নি। তবু এ কাজ বিদয়াত নয় যেহেতু কোনো একটি ভাল কাজ নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত করাতে সমস্যা নেই বরং এর অনুমতি রয়েছে যেমনটি উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে।

এছাড়া আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে যাতে দেখা যায় সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর এমন কিছু কাজ করেছেন যা রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি প্রমাণিত নয়। এসব ঘটনা প্রমাণ করে শরীয়তের মূলনীতিতে গৃহীত কোনো কাজ নতুন সৃষ্ট হলেও বিদয়াত নয়।

অনেকে বোকার মতো বলতে পারে সাহাবায়ে কিরাম এসব নতুন কাজ করেছেন তাদের জন্য এটা যথার্থ ছিল। কিন্তু তারা ছাড়া অন্য কারও জন্য এধরণের নতুন কাজে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। সাহাবের কিরাম যা কিছু করেছেন তা আমাদের জন্য দলিল হিসেবে গণ্য নয়। কারণ আমরা সাহাবায়ে কিরামের মতো নই। যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّي) "আমার সুন্নাত এবং আমার সত্যপন্থী খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত মেনে চলো" [ইবনে মাযা] অন্য হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে তাদের মধ্যে একটি যাবে জান্নাতে আর বাকীরা জাহান্নামে। বলা

হলো, হে আল্লাহর রাসুল তারা কারা তিনি বললেন, (ما انا عليه واصحابي) "আমি এবং আমরা সাহাবারা যার উপর আছি তার উপর যারা টিকে থাকবে।" সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম যা কিছু করেন তা শরীয়তের অংশ হয়ে যায় সেগুলো অনুসরণ করা অন্যদের উপর বাধ্যতামূলক হয়। তারা কোনো নতুন বিষয়ে আমল করলে করতেই পারেন এর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় না যে আমরাও ঐ ধরনের কাজ করতে পারি।

এই যুক্তিটির উপর প্রথম প্রশ্ন হলো সাহাবায়ে কিরাম কি শরীয়ত প্রণেতা ছিলেন? দ্বীনের মধ্যে যে বিধান নেই তেমন কোনো নতুন বিধান তৈরী করা কি তাদের জন্য বৈধ ছিল? তারা কি বিদয়াতের আওতার বাইরে ছিলেন? তাই যদি হয় তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে সামনে নিয়ে কেনো বলেছেন, (إياكم والمحدثات) "তোমরা নতুন সৃষ্টি বিষয় থেকে দূরে থাকো"। এই কথার মাধ্যমে কি সাহাবায়ে কিরামকে বিদয়াত সৃষ্টির অনুমতি দেওয়া হয়েছে নাকি বিদয়াত সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে? তাছাড়া আল্লাহ ﷻ বলেছেন, (اليوم أكملت لكم دينكم) "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম" [মায়েদা/৩] প্রশ্ন হলো, এ আয়াত রাসুলের যুগে নাযিল হয়েছে নাকি সাহাবায়ে কিরামের যুগে? যদি রাসুলের যুগেই দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তবে সাহাবায়ে কিরামের জন্য সেই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু অনুপ্রবেশ করানোর সুযোগ থাকে কি?

এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব হলো, সাহাবায়ে কিরাম শরীয়ত প্রণেতা নন বরং শরীয়তের ব্যাখ্যাকার। আল্লাহর পক্ষ হতে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর যা কিছু ওহী হয়েছে তার মধ্যে চুল পরিমাণ বৃদ্ধি করার অধিকার তাদের নেই তবে সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা কি তারা তা বর্ণনা করে থাকেন। পবিত্র কুরআনের কোনো একটি আয়াত বা রাসুলে আকদাস ﷺ এর কোনো একটি কথার সঠিক অর্থ কি সেটা আমরা তাদের মাধ্যমে জানতে পারি। আমাদের সাহাবায়ে কিরামকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যা জানার জন্য শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য নয়। উদাহরণস্বরুপ রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের কুরবানী করতে আদেশ করেছেন, এমন কি কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, (من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) "যে কেউ সামর্থ থাকা স্বত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেনো আমাদের ঈদগাহে হাজির না হয়। [তিরমিযী] এখন এই সকল হাদীসে কুরবানী ফরজ করা হয়েছে না কি কেবল গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারি না। যেহেতু আমরা সরাসরি এটা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মুখ থেকে শুনি নি। কারো কথা যে ব্যক্তি সরাসরি শোনে সে সর্বোত্তমভাবে তা বুঝতে পারে এটাই স্বাভাবিক। যাই হোক বরেণ্য সাহাবায়ে কিরামের কেউ কেউ সামর্থ থাকা স্বত্ত্বেও কুরবাণী পরিত্যাগ করতেন এবং বলতেন এটা আমি পরিত্যাগ করছি যাতে মানুষ বুঝতে পারে

এটা ফরজ নয়। এভাবে তারা আমাদের রাসুলের কথার ব্যাখা শিখিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত বলতে এটাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করা নতুন কোনো বিধান আমদানী করা নয়। একইভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘‘নতুন সৃষ্ট বিষয় হতে দূরে থাকো কেননা সকল নতুন সৃষ্ট বিষয় বিদয়াত’’ এখানে তিনি কোন ধরণের নতুন সৃষ্ট বিষয় বুঝিয়েছেন তা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা মনে করি কুরআন-হাদীসের সরাসরি উল্লেখ নেই এমন যে কোনো কিছু বিদয়াত। দু’দশজন লোক এক জায়গায় বসে একটু দোয়া-মানাজাত বা যিকির-আযকার করলে আমরা তাদের ব্যাপারে এই হাদিসটি প্রয়োগ করি। অথচ সাহাবায়ে কিরাম নিজেরা আমল করে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন এই হাদীসটির প্রকৃত অর্থ কি? তারা এমন অনেক বিষয়ের উপর আমল করেছেন যা বর্তমানে অনেকে বিদয়াত বলে থাকে। তারা সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে বিষয়টি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে না। এটা সঠিক পন্থা নয়। সঠিক পন্থা হলো, বিদয়াত সম্পর্কিত হাদিসটি সাহাবায়ে কিরামের আমলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। সাহাবায়ে কিরাম যে ধরণের কাজে লিপ্ত হয়েছেন সেটা কখনও বিদয়াত হতে পারে না অতএব বুঝতে হবে বিদয়াত সম্পর্কিত হাদিসটিতে এসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়নি। এগুলো বিদয়াত নয়। খোলাফায়ে রাশেদা বা সামগ্রিকভাবে সাহাবায়ে কিরামের

সুন্নাত মেনে চলার অর্থ এটাই। একারণে উপরে আমরা যেসব হাদিস উল্লেখ করেছি তার উপর নির্ভর করে মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরাম বিদয়াতের সংজ্ঞা নির্ধারন করেছেন। তারা বলেছেন, শরীয়তের মূলনীতিতে গ্রহণযোগ্য যে কোনো নতুন বিষয় নিষিদ্ধ বিদয়াত হিসেবে গণ্য নয়।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, শরীয়তের ব্যাখ্যা প্রদানের দায়িত্ব কেবল সাহাবায়ে কিরামের ছিল এখন আর কারো নেই তা নয়। আসলে প্রতিযুগের অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম এ দায়িত্ব পালন করবেন। যেহেতু ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন বিষয় সৃষ্টি হবে তার প্রত্যেকটির বিধান ইসলামে রয়েছে তবে সাধারন মানুষের পক্ষে এসব বিষয়ের সঠিক বিধান নির্ণয় করা সম্ভব নয় তাই প্রতি যুগের অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম কুরআন-হাদিসের উপর চিন্তা-গবেষণা করে নতুন সৃষ্ট বিষয়ের বিধান নির্ণয় করবেন আর সাধারন মানুষ এসব ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করবে। যদিও সেসব ব্যাপারে সরাসরি আল্লাহর রাসুল বা সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য পাওয়া না যায়। একারণে কুরআন-হাদীসে যেমন সাহাবায়ে কিরামের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তেমনই সাধারনভাবে সকল আস্থাশীল ওলামায়ে কিরামকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

তোমরা নিজেরা না জানলে যারা জানে তাদের নিকট জেনে নাও। [নাহল/৪৩]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}

হে ঈমানদাররা তোমারা আল্লাহর আনুগত্য করো তার রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের আনুগত্য করো। [নিসা/৫৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নেতৃত্বস্থানয়ী ব্যাক্তিদের পরিচয় সম্পর্কে ইবনে আব্বাস ও জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে তারা বলেছেন,

هم الفقهاء والعلماء الذين يعلّمون الناس معالِمَ دينهم

এরা হলো ফুকাহা ও ওলামা যারা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা দেন।

[তাফসীরে বাগাবী]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِين

এই দ্বীন প্রতিটি যুগের নেককার ব্যাক্তিরা বহন করবে। যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিকৃত ব্যাখ্যাকে, বাতিল পন্থীদের পন্থা-

পদ্ধতিকে এবং মূর্খ লোকদের ভুল বুঝকে তারা নাকচ করবে। [বাইহাক্বী]

এই হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরাম দ্বিমত করেছেন। তবে অন্যান্য হাদীসে একটু ভিন্ন ভাবে একই কথা বলা হচ্ছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء

আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ। [আবু দাউদ]

আল-হাইছামী বলেন, এই হাদীসের রাবীরা বিশ্বস্ত। শায়েখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এই হাদীসে সংক্ষিপ্তভাবে উপরে বক্তব্যকেই সমর্থন করা হয়েছে। যেহেতু নবীর ওয়ারিশরা নবীর রেখে যাওয়া শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে বাতিল মতবাদ ও পন্থা পদ্ধতির মূলৎপাটন করবে এটাই স্বাভাবিক।

সুতরাং সাহাবায়ে কিরামকে শরীয়তের ব্যাখ্যা প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বা তাদের মতামত অনুসরণ করার নির্দশ দেওয়া হয়েছে এই যুক্তিতে যদি দাবী করা হয় সাহাবায়ে কিরামকে যে কোনো নতুন বিষয়ের উপর আমল করার অধিকার দেওয়া হয়েছে অতএব, তাদের যুগে যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যাবে না তবে তো সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরামের ব্যাপারেও একই

দাবী করা যায়। তাহলে তো আর কিয়ামত পর্যন্ত কোনো কিছু বিদয়াত বলে গণ্য হবে না কেবল কোনো একজন সাহাবা বা কোনো একজন আলেম-মুজতাহিদের মতামত পেলেই হলো তাহলেই বিদয়াতী কাজ শরীয়তী বিষয়ে পরিণত হবে। এটা কখনও সঠিক কথা হতে পারে না। আসল কথা হলো সাহাবায়ে কিরাম বা পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরামের উপর কেবল শরিয়তের ব্যাখা প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, শরীয়ত প্রণয়ন করা নয়। কুরআন-হাদীস ঘেটে প্রতিটি নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয় করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন কোনো বিধান তৈরী করার অধিকার তাদের নেই। অতএব, সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম যেসব নতুন সৃষ্ট বিষয় গ্রহণ করেছেন তাতে প্রমাণিত হয় শরীয়তের মূলনীতিতে ঐ ধরণের বিষয় নিষিদ্ধ বিদয়াত নয়। অতএব, বিদয়াতের সংজ্ঞা নির্ধারনে নতুন সৃষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী ওলামায়ে কিরামের কর্মপন্থা গুরুত্বসহকারে বিশ্লেসণ করা একান্ত জরুরী। এ লক্ষ্যে উপরে আমরা নতুন সৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম কি পন্থা অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা দেখবো এ ব্যাপারে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও বিশিষ্ট ওলামায়ে দ্বীন কি পন্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমেই আমরা এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করবো যে সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরামের সুস্পষ্ট

মন্তব্য পাওয়া যায় না তবু উম্মতে মুসলিমা সেগুলো উত্তম হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

যেসব নতুন সৃষ্ট বিষয় সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগে উম্মতে মুসলিমা একমত হয়ে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

১. রেজাল শাস্ত্র।

উপরে আমরা দেখেছি শায়েখ ইজ্জুদ্দিন আব্দিস সালাম বিদয়াতকে শরীয়তের বিধান অনুসারে পাঁচটি বিধানে বিভক্ত করেছেন। তার মাধ্যে ফরজ বিদয়াতের উদাহরণ হিসেবে তিনি হাদিস সহীহ জঈফ করার নিয়ম নীতি তথা রেজাল শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টি অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সাধারনভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার নামে মিথ্যা কথা রচনা করার ব্যাপারে সতর্কবার্তা উল্লেখ করেছেন কিন্তু কিভাবে হাদিসের মধ্যে সহীহ জঈফ ও সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা যাবে তা সুবিস্তারে বর্ণনা করেন নি। সাহাবায়ে কিরামও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন নি। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারা হাদিস সহীহ জঈফের মানদন্ড সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়মনীতি প্রনয়ন করেন। সেসব নিয়মনীতির বেশিরভাগই আল্লাহর রাসুল বা সাহাবায়ে কিরাম থেকে সরাসরি

প্রমাণিত নয় তবে শরীয়তে সে বিষয়ে মূলনীতি রয়েছে। এ বিষয়ে প্রথমেই যে মূলনীতিট উল্লেখ করা যায় তা হলো, (الصحابة كلهم عدول) "সকল সাহাবায়ে কিরাম বিশ্বস্ত"।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ বলেন,

والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية

সকল সাহাবা ন্যায় নিষ্ঠ। (তাদের জীবন চরিত বিশ্লেষণ করে) সততার সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

[ফাতহুল বারী]

এই মুলনীতিটির ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসীনে কিরাম একমত। অথচ এটা সরাসরি রাসুলের বাণী বা সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। তবে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসায় যেসব আয়াত ও হাদীস এসেছে আর সাহাবাদের ব্যাপারে বাস্তবে যে সততার প্রমাণ পাওয়া গেছে তার আলোকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম এই মুলনীতিটি প্রণয়ন করেছেন এবং যুগের পর যুগ ধরে এটা বিনা প্রতিবাদে অনুসরণীয় হয়ে আসছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই মূলনীতিটির আলোকে বহু সংখ্যক হাদিস সহীহ প্রমাণিত হচ্ছে যা সাধারনভাবে সহীহ হতো না। উদাহরণ স্বরুপ অনেক সময় হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো একজন তাবেয়ী বলেন, (عن رجل من أصحاب النبي) "আমি কোনো

একজন সাহাবাকে বলতে শুনেছি” এভাবে সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে যে হাদীস বর্ণিত হয় মুহাদ্দিসীনে কিরাম সেই হাদীসকেও সহীহ বলে থাকেন যদিও এখানে উল্লেখিত সাহাবীর পরিচয় জানা যায় নি। কারণ সকল সাহাবায়ে কিরাম ন্যায়নিষ্ট অতবএ তাদের কারো পরিচয় জানা শর্ত নয়।

ইবনে রজব আল-হাম্বালী বলেন,

وعدم تسمية الصحابة لا يضر؛ فإنهم كلهم عدول

হাদিসের সনদে সাহাবার নাম উল্লেখ না থাকাতে কোনো সমস্যা নেই যেহেতু সব সাহাবাই ন্যায়নিষ্ঠ।

[ফাতহুল বারী]

অথচ সাহাবায়ে কিরাম ছাড়া অন্য কোনো রাবীর জীবন পরিচয় জানা না গেলে একটি হাদীসের সনদ অজ্ঞতার দোষে দুষ্ট হয় এবং অগ্রহণযোগ্য হয়।

এধরণের আরো অনেক মূলনীতি আছে যার মাধ্যমে হাদিসের মধ্যে জাল জঈফ নির্ধারণ করা হয়। এসব মূলনীতিসমূহ কুরআন-হাদিস বা সাহাবায়ে কিরামের যুগে সরাসরি বিদ্যমান ছিল না। কুরআন-হাদিসের উপর গবেষণা করে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসীনে কিরাম এগুলো প্রনয়ণ করেছেন। এসব মুলনীতির কোনোটির ব্যাপারে তারা একমত হয়েছেন আবার কোনোটির

ব্যাপারে তারা দ্বিমত করেছেন। আমরা যে দুটি গ্রন্থকে সহীহ বলে থাকি অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এই দুটি গ্রন্থের গ্রন্থাকার তথা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বেশ কিছু মুলনীতির ব্যাপারে পরষ্পরের সাথে দ্বিমত করেছেন। ইমাম নাব্বী ﵀ উল্লেখ করেন,

قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم

মুহাদ্দিসরা বলেন, অমুক হাদিস ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ কিন্তু ইমাম বুখারীর শর্তে সহীহ নয় এর অর্থ ইমাম মুসলিম হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেন এই সকল রাবীদের মধ্যে তা পূর্ণ হয়েছে কিন্তু ইমাম বুখারী হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেন তা তাদের মধ্যে পাওয়া যায় নি। [শারহে মুসলিম]

এর পর তিনি এও উল্লেখ করেন যে অনেক সময় ইমাম বুখারী কোনো হাদীসকে সহীহ মনে করলেও ইমাম মুসলিম তা সহীহ মনে করেন নি।

ইমাম নাব্বী ﵀ আরও উল্লেখ করেন,

عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري

في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا والله أعلم

ইমাম বুখারী যাদের হাদীস তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন কিন্তু ইমাম মুসলিম তাদের হাদীস বর্ণনা করেননি এমন রাবীর সংখ্যা চার শত চৌত্রিশ জন আর ইমাম মুসলিম যাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন নি এমন রাবীর সংখ্যা ছয় শত পঁচিশ জন। [শারহে মুসলিম]

এই সকল মতপার্থক্যপূর্ণ মুলনীতির মধ্যে একটি হলো- ইমাম বুখারীর মতে আনআন পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ একজন রাবী যদি বলে অমুক অমুক থেকে হাদিস বর্ণনা করেছে তবে এই হাদীস সহীহ হবে না বরং বলতে হবে অমুক অমুকের নিকট হাদীস শুনে আমাকে তা বর্ণনা করেছে অথবা রাবীদ্বয়ের সরাসরি সাক্ষাত হয়েছে এমন প্রমাণ থাকতে হবে। ইমাম বুখারীরর যুক্তি হলো প্রথম ক্ষেত্রে রাবী সরাসরী হাদিসটি তার নিকট শুনেছে কি না সেটা অস্পষ্ট থেকে যায়। ইমাম মুসলিম বলেছেন প্রথম প্রকারের হাদিসও গ্রহণযোগ্য হবে যদি তার রাবী মুদাল্লিস (সনদ থেকে কোনো একজন রাবীর নাম হঠাৎ বাদ দিয়ে দেয় এমন ব্যক্তি) না হয়। এক্ষেত্রে রাবীদ্বয়ের সাক্ষাতের প্রমাণ থাকা শর্ত নয় কেবল সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকাই যথেষ্ট। [মুক্বদ্দামা সহীহ মুসলিম]

এছাড়া বিদয়াতীর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, যে কেউ হাদিস

লিখে রাখে কিন্তু তা তার মুখস্থ থাকে না তার হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, যে ব্যক্তি কোনো এটি হাদিস বর্ণনা করে কিন্তু পরে ভুলে যায় তবে যার নিকট বর্ণনা করেছেন তিনি মনে রাখতে সক্ষম হন এমন হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, যে জাল হাদীস বর্ণনা করে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু পরে তওবা করে এই ব্যাক্তির তওবা করার পরের হাদীস সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা হবে কিনা ইত্যাদি নানাবিধ মূলনীতি রয়েছে। যার কিছুই সরাসরি কুরআন-হাদীস বা সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, যা কিছু আল্লাহর রাসুল ﷺ বা সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল না তা নিকৃষ্ট বিদয়াত, যদি এগুলো ভাল কিছুই হতো তবে সাহাবায়ে কিরামই তা আগেভাগে করে দেখাতেন এমন দাবী করে এসব মূলনীতিকে পরিত্যাগ করলে অবস্থা কি দাড়াবে? সব সহীহ হাদীসগুলো জাল-জঈফে পরিণত হবে আর মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসগুলো মুসলিম সমাজে পুনরায় স্থান গেঁড়ে বসবে।

২. উসুলে ফিকহ।

হাদিস শাস্ত্রের মতো আরেকটি শাস্ত্র হলো ফিকাহ শাস্ত্র। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসের উপর গবেষণা করে বিভিন্ন বিষয়ের বিধান নির্ণয় করাই ফিকাহ শাস্ত্রের কাজ। এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ

ব্যক্তিদের ফকীহ বা মুজতাহিদ বলা হয়। মুজতাহিদগণ কুরআন-হাদিস থেকে বিধান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কিছু মুলনীতির অনুসরণ করে থাকেন। এই সকল মূলনীতিকে বলা হয় উসুলে ফিকহ (أصول لفقه) তথা ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি। উসূলে ফিকহের আলোচনাতে শব্দকে আম, খাস, মুশতারাক ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। মুশতারাক বলতে এমন শব্দ বোঝায় যার একই সাথে দুটি অর্থ রয়েছে। কোন আয়াতে কোন অর্থটি উদ্দেশ্য সেটা নির্ণয় করার পদ্ধতি কি, কখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা না গেলে তার বিধান কি এ সম্পর্কে উসুলবিদগণ আলোচনা করে থাকেন। আম ও খাসের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়। খাস বিধান দ্বারা আম বিধানকে সীমাবদ্ধ করা হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ও উসুলে ফিকার আলোচ্য বিষয়। আদেশ ও নিষেধ দ্বারা কোনো কিছু আবশ্যক করা ছাড়া অন্য আর কি কি অর্থ উদ্দেশ্য হয়, আমর দ্বারা কোনো কিছু একবার ফরজ হয় নাকি বারবার, তাৎক্ষণিক ফরজ হয় নাকি বিলম্ব করা বৈধ হয়, হাক্বীকত-মাঝাজ, মুতলাক মুক্বয়্যাদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মুলনীতি কি তা উসুলবিদগণ বর্ণনা করে থাকেন। যেভাবে রেজাল শাস্ত্রের নিয়মনীতি দ্বারা হাদীসের মধ্যে সহীহ-জইফ নির্ণয় করা হয় একইভাবে উসুলে ফিকাহর মূলনীতি দ্বারা কুরআন-হাদিসের সঠিক বুঝ কোনটি তা নির্ণয় করা হয়। যারা উসুলে ফিকহার মুলনীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তারা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করার

সময় মারাত্মক ভুল ধারণার প্রচার করে থাকে। একারণে কুরআন হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে উসুলে ফিকাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র।

এখন এমন একদল লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা এসব মুলনীতিকে অগ্রাহ্য করে। তারা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের এমন সব ব্যাখা বিশ্লেষণ উল্লেখ করে যা শুনলে শয়তানও লজ্জা পায়। উদহারণস্বরুপ সহীহ মুসলিমের একটি হাদিসের এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ অন্য কারও সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় সে যেনো তার চেহারায় আঘাত না করে কেননা আল্লাহ আদম عليه السلام কে সৃষ্টি করেছেন তার নিজ আকৃতিতে।

এই হাদীস অনুযায়ী একদল লোক দাবী করে আল্লাহর চেহারা মানুষের মতো [নাউযু বিল্লাহ]

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের পর আল্লাহ سبحانه وتعالى মুমিনদের শান্তনা দিয়ে বলেন, এটা আমার পক্ষ থেকেই হয়েছে যাতে আমি জেনে নিতে পারি কে মুমিন। [আলে ইমরান/১৪০] এই আয়াত পেশ করে কাদরিয়্যারা দাবী করতো আল্লাহ سبحانه وتعالى কোনো ঘটনা আগে থেকে জানেন না যখন সেটা ঘটে তখন জানতে পারেন। [নাউযু বিল্লাহ]

আল্লাহর আয়াত ও রাসুলের হাদীস কিভাবে ব্যাখ্যা করা উচিৎ সেটা না জানার কারণে এধরণের বিভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাস জন্ম নেয়।

এখানে উল্লেখোগ্য বিষয় হলো উসুলে ফিকাহর মূলনীতিসমূহ কিন্তু আল্লাহর রসুল বা তার সাহাবায়ে কিরাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন নি। বরং পরবর্তী যুগের ওলামায়ে দ্বীন বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এগুলো প্রণয়ন করেছেন।

এখন যদি কেউ এই শাস্ত্রকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে পরিত্যাগ করে তবে কেমন হবে? এটা কি আসলে বিদয়াতী আক্বীদা বিশ্বাস ও বিভ্রান্ত চিন্তাধারার লোকদের সুযোগ করে দেওয়া নয়?

৩. ইজমা।

আমরা সবাই জানি ইজমা তথা আলেমদের ঐক্যমত শরীয়ের একটি মূলনীতি। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে এই মূলনীতিটি সরাসরি পবিত্র কুরআন বা সহীহ হাদীসে উল্লেখ নেই। এমন কি সাহাবায়ে কিরামের মুখেও ইজমা নামে কোনো মূলনীতির কথা শোনা যায় নি। তবু পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরাম ইজমাকে শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যে কেউ ইজমাকে অস্বীকার করে বা ইজমার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে তারা তাকে বড় মাপের বিদয়াতী

হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। আলেমরা ইজমা অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে কিছু আয়াত ও হাদিস থেকে দলিল পেশ করেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

যে কেউ সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসুলের সাথে বিবাদ করে এবং মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথে চলে সে যে পথে চলে আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেবো আর তার স্থান হবে জাহান্নাম যা খুব নিকৃষ্ট স্থান। [নিসা/১১৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মাতকে ভুলের উপর একত্রিত করবেন না। [তিরমিযী]

এ হাদীসটির বিভিন্ন সনদ রয়েছে। আল-হাইছামী তিরানী বর্ণিত এই হাদীসের একটি সনদের রাবীদের বিস্তস্ত বলেছেন। এই হাদীসের অন্য একটি রেওয়ায়েতকে শায়েখ আলবানী হাসান বলেছেন। [সহীহা/১৩৩১] আল জামি’ আস সাগীরে এই হাদীসের একটি রেওয়ায়েতকে তিনি সহীহ বলেছেন।

এখানে উম্মতের ঐক্যমতের একটি গুরুত্ব প্রমাণিত হয় কিন্তু উম্মতের ঐক্যমত বলতে উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির ঐক্যমত নাকি কেবল আলেম-ওলামা ও মুজতাহিদদের ঐক্যমত সেটা এখানে বলে দেওয়া হয় নি। ঐক্যমত কিভাবে প্রমাণিত হবে সেটাও বলে দেওয়া হয় নি। ইজমা কখন ক্বতঈ (শক্তিশালী) আর কখন জন্নী (অপেক্ষাকৃত দূর্বল) হয় তাও বর্ণনা করা হয় নি। তাছাড়া এই বিষয়টিকে ইজমা নামে আখ্যায়িত করা এবং ইজমাকে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি তৃতীয় একটি মূলনীতি হিসেবে কুরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। সাহাবায়ে কিরামও এভাবে বলেন নি। প্রশ্ন হলো, যে আল্লাহ বলছেন, ‘‘তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম’’ তিনি দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সম্পর্কে কিছুই বললেন না! যে রাসুল পায়খানা প্রসাবের পর ঢেলা কুলুপ ব্যবহারের পদ্ধতি পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন তিনিও এটা এড়িয়ে গেলেন! এটা কিন্তু সঠিক কথা নয়। ইজমা সম্পর্কে নাম ধরে কুরআন হাদীসে কিছু বলা হয়নি এর শর্তাবলী ও নিয়মকানুন সম্পর্কেও সরাসরি আলোচনা করা হয় নি তবে এ ব্যাপারে যাবতীয় মুলনীতি অবশ্যই বর্ণিত হয়েছে। কুরআন-হাদীসে যে কোনো বিষয় বর্ণনা করার পদ্ধতিই এটা যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি। নাম ধরে সব কিছুর বর্ণনা থাকতে হবে তা নয় বরং কিছু মূলনীতির আলোকে বিষয়টি প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট হবে। ইজমা সম্পর্কেও এ ধরণের

মূলনীতি রয়েছে। তার আলোকেই ওলামায়ে দ্বীন এটাকে শরীয়তের একটি ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং দলিল প্রমাণের আলোকেই তারা এ বিষয়ক যাবতীয় মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। কুরআন-হাদিস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যাক্তিরা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারেন আর যারা সব কিছু নাম ধরে দলিল প্রমাণ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে তারা বলে ইজমার কোনো দলিল নেই তাই ইজমা যারা মানে তারা বিদয়াতী। সন্দেহ নেই যে এরাই সর্বাপেক্ষা বড় বিদয়াতী। এদের সর্দার হলো নিজাম যে সর্বপ্রথম ইজমাকে অস্বীকার করেছিল আর একারণে সকল ওলামায়ে দ্বীন তাকে বিদয়াতী আখ্যা দিয়েছিলেন। যারা ইজমা অস্বীকার করে তারা হাদীসকেও অস্বীকার করে কারণ হাদিসের মূলনীতিসমূহ উম্মতে মুসলিমার ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত সরাসরি কুরআন-হাদিস থেকে নয়। এদের কেউ কেউ পবিত্র কুরআনকেও অস্বীকার করে কারণ এটা সাহাবায়ে কিরামের যুগে একত্রে গ্রন্থিত করা হয় রাসুলের যুগে নয়। তাদের মতে একারণে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এর মধ্যে কিছু ভুলত্রুটি অনুপ্রবেশ করা অসম্ভব নয়। [নাউযু বিল্লাহ] আল্লাহর দরবারে এ ধরণের বিভ্রান্তি হতে আশ্রয় চাই।

৪. কুরআন সৃষ্ট নয়।

সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগে জাহামিয়্যা ও মু’তাজিলাদের

একটি বিভ্রান্ত আক্বীদা ব্যাপক প্রচার প্রসার পায়। তারা বলতো, পবিত্র কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। তৎসময়ের ওলামায়ে দ্বীন এই মতবাদের বিরুদ্ধে জান-প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করেন। তারা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, (القرآن كلام الله غير مخلوق) ''কুরআন আল্লাহর বাণী, তার সৃষ্টি নয়।'' তৎসময়ের খলীফা এ বিষয়ে বিভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিল। যারা পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি বলে স্বীকার করতো না তাদের সে ভীষণ শাস্তির সম্মুখিণ করতো। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল কুরআন সৃষ্ট নয় এই আক্বীদা বিশ্বাস প্রচার করার কারণে ভীষণভাবে নির্যাতিত হোন। বলা হয়ে থাকে তাকে এমনভাবে প্রহার করা হয়েছিল যদি একটা হাতিকেও সেভাবে প্রহার করা হতো তবে তা মারা যেতো।

পরবর্তীতে এই আক্বীদাটি সত্যপন্থী ও বিদয়াতীদের মধ্যে পার্থক্য করার একটি অন্যতম প্রতীকে পরিণত হয়। আজ পর্যন্ত যে কেউ ওলামায়ে কিরামের মন্তব্য পরিত্যাগ করে কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা করে তাদের জাহামিয়্যা বা মু'তাজিলা হিসেবে চিহ্নিত করে তিরষ্কার করা হয়। ইমাম আজ-জাহাবী তার আল-উলু নামক কিতাবে বহু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম থেকে উল্লেক করেছন তারা এই আক্বীদাটিকে জাহামিয়্যাদের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এমন আক্বীদা-বিশ্বাস যে পোষণ করে তাকে কাফির আখ্যায়িত

করেছেন। সুতরাং ‘‘পবিত্র কুরআন সৃষ্ট নয়’’ এই আক্বীদাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই আক্বীদাটি সরাসরি পবিত্র কুরআন বা সহীহ হাদীসে উল্লেখ নেই। সাহাবায়ে কিরামের যুগেও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ ﷻ তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদাটি কেনো বর্ণনা করেন নি? আল্লাহর রাসুল বা তার সাহাবায়ে কিরামই বা কেনো এটা বর্ণনা করেন নি? অনেকে বলবেন, তাদের যুগে তো আর এসকল বিদয়াতী ও পথভ্রষ্ট ফিরকার আবির্ভাব ঘটেনি তাই এ ধরণের আক্বীদা বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় নি। এই উত্তরটি একটি মারাত্মক ভুল উত্তর। রাসুলে আকদাস ﷺ এর যুগে কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় নি তাই তিনি সে বিষয়ে কিছুই বলেন নি এটা সঠিক কথা নয়। আল্লাহর রাসুল কি কেবল তার যুগের সমস্যার সামাধান নিয়ে এসেছেন নাকি কিয়ামত পর্যন্ত যত সমস্যা সৃষ্টি হবে তার সবগুলোর সমাধান নিয়ে এসেছেন? পবিত্র কুরআন কি কেবল রাসুলের যুগের জন্য নাকি কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্য? এর উত্তর সবার জানা। আমাদের রাসুল এবং তার রেসালাত কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত মানুষের জন্য। অতএব, কেবল রাসুলের যুগের সমস্যাগুলো নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগমণকারী সকল নতুন সমস্যার সমাধান

কুরআন-হাদিসে পাওয়া যাবে। কুরআন-হাদিসে সব কিছুর সমাধান বর্ণনা করাও হয়েছে কিন্তু বেশিরভাগ লোক অজ্ঞতাহেতু তা বুঝতে সক্ষম হয় না। আমরা বারবার বলেছি কুরআন-হাদীসে নাম ধরে তালাশ করলে সব কিছু পাওয়া যাবে না বরং কিছু মুলনীতির আলোকে তালাশ করতে হবে।

এখন যদি আমরা "পবিত্র কুরআন আল্লার সৃষ্টি নয়" এ সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে কি মূলনীতি আছে তা লক্ষ করি তবে দেখবো, আল্লাহ বলেন, (فاعلموا إنما إنزل بعلم الله) "জেনে নাও কুরআন আল্লাহর জ্ঞান নিয়ে নাযিল হয়েছে" [হুদ/১৪] অর্থাৎ পবিত্র কুরআন যেসব তথ্য ও বিধান দেওয়া হয়েছে তা আল্লাহ ﷻ এর জ্ঞানের একটি অংশ। এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ ﷻ এই বিষয়গুলো আগেই জানতেন না কি পরে জেনেছেন? এখানে আগে পরে বলতে উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ ﷻ অনাদি অনন্তকাল ধরে আছেন। যখন কিছু ছিল না তিনি ছিলেন, তিনি ছিলেন না এমন কোনো সময় নেই। এরপর তিনি বিভিন্ন জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব সর্বাবস্থায় ছিল, রয়েছে এবং থাকবে আর সৃষ্টি এক সময় ছিল না, এখন আছে হয়তো আবার এক সময় থাকবে না। এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে তার নিজের জ্ঞান থেকে যা কিছু বর্ণনা করেছেন সেগুলো তিনি প্রথম থেকেই জানতেন নাকি পরে জেনে নিয়েছেন? এর সহজ উত্তর হল সকল বিষয়ের জ্ঞান তার প্রথম

থেকেই ছিল। এমন কখনও হতে পারে না যে আল্লাহ ﷻ এক সময় কোনো একটা বিষয় জানতেন না। তাহলে পবিত্র কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ ﷻ পরে সৃষ্টি করেন নি বরং তার সাথে অনাদি অনন্ত কাল ধরে ছিল। অতএব, পবিত্র কুররআন আল্লাহর অনাদি-অনন্ত কালের সিফাত। এটা কোনো সৃষ্ট জিনিস নয়।

এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে "কুরআন সৃষ্ট নয়" এ আক্বীদা কুরআনেরই আক্বীদা। কিন্তু বেশিরভাগ লোক এভাবে গবেষণা করতে অভ্যস্ত নয় তারা প্রতিটি বিষয় কুরআন-হাদীসে নাম ধরে তালাশ করে। আর বলে, অমুক জিনিস কুরআনে নেই হাদীসে নেই সাহাবারা করেন নি তাই তা বিদয়াত। এটা সঠিক পন্থা নয়।

৫. কুরআনে নুকতা ও যের যবর সংযুক্ত করা।

ইসলামের ইতিহাসে একটি প্রশিদ্ধ ঘটনা হলো পবিত্র কুরআনে নুকতা ও যের জবর সংযক্ত করা। প্রথম কে এটা করেছিল সে বিষয়ে কিছু দ্বিমত রয়েছে তবে এ বিষয়ে সকলে একমত যে, আল্লাহর রাসুলের যুগে ওহী লেখকরা যখন পবিত্র কুরআন লিখতেন তারা নুকতা ও যের যবর ছাড়াই তা লিখতেন। সাহাবায়ের কিরামের সময়ও পবিত্র কুরআন এই অবস্থাতে ছিল। পরবর্তীতে তাবেয়ীদের যুগে এতে নুকতা ও যের জবর

সংযুক্ত করা হয়। সুনানে আবু দাউদের গ্রন্থাকার ইমাম আবু দাউদের পুত্র ইমাম আবু বকর তার কিতাব "আল-মাসাহেফ"-এ উল্লেখ করেন, (أول من نقط المصاحف يحي بن يعمر) পবিত্র কুরআনে প্রথম নুকতা সংযোজন করেন ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মার। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে ইব্রাহীম নাখঈ, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, হাসান প্রমুখ তাবেঈরা এটা অপছন্দ করেন। এমন কি তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতি সূরার শুরুতে উক্ত সূরার নাম লেখার ব্যাপারটিকেও অপছন্দ করেছেন। ইব্রাহীম নাখয়ী এ বিষয়ে নিষেধ করার পর বলেন, ইবনে মাসউদ এটা অপছন্দ করতেন তিনি বলতেন, (لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس منه) "তোমরা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে বাইরের কিছু মিশিয়ে ফেলো না।" [আল-মাসাহিফ] এ স্বত্ত্বেও পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনে নুকতা বা জের জবর সংযুক্ত করা এবং সুরার নাম লেখা ইত্যাদি বিষয় বৈধ ও উত্তম হওয়ার ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

ইমাম নাব্বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

ويستحب نقط المصحف وشكله لأنه صيانة له من اللحن والتحريف

পবিত্র কুরআনে নুকতা ও যের যবর সংযুক্ত করা মুস্তাহাব কেননা এর মাধ্যমে ভুল সংঘটিত হওয়া এবং বিকৃতি ঘটা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। [আল-মাজমু]

৬. সাহাবী কারা?

উপরে আমরা দেখেছি হাদীস শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, (الصحابة كلهم عدول) ‘‘সাহাবারা প্রত্যেকে ন্যায় নিষ্ঠ’’ একারণে হাদিস সহীহ হওয়ার জন্য কোনো সাহাবার জীবন চরিত্র বিশ্লেষণ করা বা তাদের পরিচয় জানা শর্ত নয়। সন্দেহ নেই যে, এটা সাহাবায়ে কিরামের একটি মহান ফজিলত। এছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই সাহাবায়ে কিরামকে সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

তোমরা আমার সাহাবাদের মন্দ বলো না। যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ দান করে করে তবু তাদের (সাহাবায়ে কিরামের) এক মুদ (প্রায় এক অঞ্জলি) পরিমাণ (খেজুর বা যব) দান করার সমান হতে পারবে না। [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে,

اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُم

আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমার পর তাদের গাল-মন্দ করো না। যে কেউ তাদের ভালবাসে সে আসলে আমাকেই ভালবাসে আর যে কেউ তাদের ঘৃণা করে সে

আমাকেই ঘৃণা করে।

[তিরিমযী]

এই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে তবে পূর্বের হাদীসের সাথে এটা সমার্থপূর্ণ। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের ফজিলত সম্পর্কে বহু সংখ্যক বর্ণনা রয়েছে যা সবিস্তারে বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়।

আল্লাহ ﷻ বিনাযুদ্ধে বিজিত এলাকার সম্পদে কাদের অধিকার রয়েছে সে প্রসঙ্গে প্রথমে আনসার ও মুহাজির সাহাবাদের নাম উল্লেখ করেন এবং পরে বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا}

আর যারা তাদের পরে আসবে (তাবেঈনরা এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে) তারা বলে হে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের যেসব ভাই পূর্বে ঈমান গ্রহণ করেছেন (আনসার ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম যাদের কথা এই আয়াতের পূর্বে বলা হয়েছে) তাদের ক্ষমা করো আর আমাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ যেনো না থাকে। [হাশর/১০]

ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন, (هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة) “এই আয়াত প্রমাণ করে সাহাবায়ে কিরামকে ভালবাসা

ফরজ”।

তিনি ইমাম মালিক ﵀ থেকে আরও উল্লেখ করেন,

من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو كان في قلبه عليهم غل، فليس له حق في في المسلمين

যে কেউ সাহাবায়ে কিরামের কোনো একজনকে অপছন্দ করে অথবা তার অন্তরে কোনো বিদ্বেষ থাকে তবে মুসলিমদের ফায় (বিনা যুদ্ধে বিজিত সম্পদ) এ তার কোনো অংশ নেই। [তাফসীর কুরতুবী]

সাহাবায়ে কিরামের ফজিলত সম্পর্কে এধরণের আরও বেশ কিছু আয়াত ও হাদিস বর্ণিত আছে। এসব দলিল প্রমাণের কারণে মুসলিম উম্মার ওলামায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকেন। যারা সাহাবায়ে কিরামের নিন্দা-মন্দ করে, মুসলিম উম্মার ওলামায়ে কিরাম একমত হয়ে তাদের বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কোনো কোনো আলেমের মতে বিশেষ কিছু সাহাবাকে গালি দেওয়া কুফরী। এখন প্রশ্ন হলো সাহাবা কারা, সাহাবা বলতে কি বোঝায়? অনেকে ভাববেন এ তো সহজ প্রশ্ন। সাহাবা মানে হলো সাথী বা সঙ্গী যে কেউ রাসুলুল্লাহ ﷺ কে সঙ্গ দিয়েছে তাকে সহযোগীতা করেছে সে সাহাবী। এই উত্তরটির দুটি স্থানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সঙ্গ

দিলেই বা তাকে সহযোগীতা করলেই কেউ সাহাবী হয়ে যায় না। বরং যে ব্যক্তি সঙ্গ দিচ্ছে তাকে পূর্বেই মুসলিম হতে হবে। একারণে আবু তালিবকে সাহাবী বলা যায় না। তাদেরকেও সাহাবী বলা হয় না যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে বিদ্যমান ছিলেন, তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, হয়তো তার সঙ্গও দিয়েছেন কিন্তু তখন ইসলাম গ্রহণ করেন নি তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর ইসলাম গ্রহণ করেছন। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো কারো সাথী হওয়া বা সঙ্গ দেওয়া বলতে সাধারনভাবে বোঝায় তার সাথে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা। এ হিসেবে বিদায় হজ্জের সময় যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন কিন্তু তার সাথে দীর্ঘ সময় সঙ্গ দেন নি তারা সাহাবা বলে গণ্য হবেন না। কিন্তু সঠিক মতে তারা সাহাবী। একারণে সাহাবী হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গ দেওয়াকে বেশিরভাগ আলেম শর্ত করেন নি বরং রাসুলুল্লাহ ﷺ কে চোখে দেখাই এখানে যথেষ্ট। তবে যে ব্যক্তি ওজরের কারণে তাকে দেখতে পান নি কিন্তু তাকে সঙ্গ দিয়েছেন তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (একজন অন্ধ সাহাবী)। দেখার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে দেখা শর্ত নাকি আবছা আবছা দেখলেও যথেষ্ট হবে সে বিষয়েও দ্বিমত রয়েছে। সঠিক মতে আবছাভাবে দেখাও যথেষ্ট। এমন কি যে ব্যক্তি দেখছে যদি সে অবুঝ বাচ্চাও হয়। একারণে আবু বকর رضي الله عنه এর ছেলে মুহাম্মাদকে সাহাবা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে অথচ রাসুলুল্লাহ

ﷺ এর মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে তার জন্ম হয়।

সাহাবী হওয়ার জন্য যেমন মুসলিম অবস্থায় রাসুলুল্লাহ ﷺ কে দেখা বা তার সঙ্গ দেওয়া শর্ত একইভাবে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাও শর্ত। যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মুসলিম হয়েছে এবং তাকে দেখেছে কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে বা পরবর্তীতে আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে তারা সাহাবী হিসেবে গণ্য নয় এ বিষয়ে সকলে একমত। এই ব্যক্তি যদি আবার আল্লাহর দ্বীনে ফিরে আসে কিন্তু পরে আর রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে তার সাক্ষাত না হয় তবে তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন কিনা সে ব্যাপারে কিছু দ্বিমত রয়েছে। সঠিক মতে তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন।

এটাই হলো সাহাবী সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। প্রশ্ন হলো, এই ধরেণর বিস্তারিত ব্যাখ্যা কুরআন-হাদীসে সরাসরি উল্লেখ আছে কি? সাহাবায়ে কিরাম এভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন কি? তাহলে কেনো বলা হবে, আল্লাহর রাসুল যা করেন নি বা সাহাবায়ে কিরাম যা করেন নি তাই নিকৃষ্ট বিদয়াত!

৭. চার মাযহাব।

সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগে নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে একটি প্রশিদ্ধ বিষয় হলো চার মাযহাব। আমরা উপরে হাদীস

শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি মুহাদ্দিসীনে কিরাম অনেক সময় হাদীসের মূলনীতি নির্ধারণ করতে যেয়ে দ্বিমত করেছেন। এমনকি দুটি সহীহ গ্রন্থের গ্রন্থাকার ইমাম বুখারী ও মুসলিম পরষ্পরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত করেছেন। পরবর্তীতে আমরা উসুলে ফিকাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি কুরআন-হাদিস থেকে বিভিন্ন বিধি-বিধান তথা মাসয়ালা-মাসায়েল বের করার মূলনীতিকে বলা হয় “উসুলে ফিকহ”। যারা এসব ব্যাপারে দক্ষ হন তাদের বলা হয় মুজতাহিদ। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যান্য অনেক মুজতাহিদ যুগে যুগে আগমণ করেছেন। তারা কুরআন হাদীস থেকে মাসয়ালা-মাসায়েল নির্গত করেছেন। মুহাদ্দিসদের মতো মুজতাহিদরাও বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত করেছেন। উল্লেখিত চার ইমাম যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ছিলেন। তারাও বিভিন্ন বিষয়ে পরষ্পরের মধ্যে দ্বিমতে জড়িয়ে পড়েছেন। কুরআন-হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে দ্বিমত হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। একারণে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ এসব ব্যাপারে দ্বিমত হলে তার নিন্দা করতেন না। এ ব্যাপারে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, (لا يصلين احدكم العصر الا ببني قريظة) “তোমরা কেউ বানু কুরাইজায় না গিয়ে আসরের সালাত আদায় করবে না।” পরবর্তীতে বানু কুরাইজায়

পৌছানোর পূর্বেই আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে সাহাবায়ে কিরাম দ্বিমত শুরু করেন। একদল বলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন আমরা তাই করবো, বানু কুরাইজায় না গিয়ে আসরের সলাত আদায় করবো না। ফলে তারা সূর্য ডোবার পর বনু কুরাইজায় পৌঁছে আসরের সলাত আদায় করেন। অন্য একটি পক্ষ বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের সলাত কাজা করতে বলেন নি। বরং তার কথার উদ্দেশ্য হলো, দ্রুত যাও যাতে বনু কুরাইজায় গিয়ে সময়মত আসরের সলাত আদায় করতে পারো। কিন্তু আমরা যখন আসরের আগে বনু কুরাইজায় পৌঁছাতে পারি নি, তখন সলাত কাজা করা আমাদের জন্য সঠিক হবে না। তারা রাস্তার মধ্যেই আসরের সলাত আদায় করে নেন। হাদীসের শেষে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো পক্ষকে তিরষ্কার করেন নি। এছাড়া অন্য হাদীসে এসেছে, রাসুলূল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে চিন্তা-গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেয় সে ঠিক করলে দুটি সওয়াব ভুল করলে একটি সওয়াব [বুখারী]। একারণে মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরাম এসব দ্বিমতকে নিন্দা করেন নি। তবে বর্তমানে কিছু নির্বোধ লোক এসব দ্বিমতের কারণে আলেম-ওলামাদের তিরষ্কার করে থাকে। আল্লাহ আমাদের এ দূর্মতি থেকে রক্ষা করুন।

মোট কথা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পরবর্তী যুগে সাহাবায়ে কিরামের সময় থেকেই কিছু কিছু বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত

শুরু হয়। সাহাবায়ে কিরামের পর চার ইমামের যুগে এই সকল মতপার্থক্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। প্রতিটি ইমামের কিছু অনুসারী তৈরী হয়। তারা নিজেদের মতামত কিতাব-পত্রে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে এবং একেক এলাকার লোকেরা একেক ইমামের অনুসরণ করতে শুরু করে। এভাবে মুসলিম বিশ্বে চার ইমাম ও তাদের মতামতের অনুসরণ শুরু হয়। এমতাবস্থায় যে এলাকার লোকেরা যে ইমামের মতামত অনুসরণ করতো তাদের সেই ইমামের নামে পরিচয় দেওয়ার রীতি চালু হয়ে যায়। এভাবে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী ইত্যাদি নামের উদ্ভব ঘটে। এগুলোকে বলা হয় মাজহাব। প্রতিটি মাজহাবের লোকেরা নিজেদের মত মেনে চলে কিন্তু অন্যকে তিরষ্কার করে না। যেহেতু এ বিষয়ে রাসুলুলল্লাহ ﷺ এর কর্মপন্থা সম্পর্কে তারা অবহিত। এভাবে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এবং চারটি নামে পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ আসলে এক ও অভিন্ন থেকে যায়। একারণে চার ইমামের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর হতে আজ পর্যন্ত যত অভিজ্ঞ ইমাম-মুজতাহিদ বা মুহাদ্দিস আগমণ করেছেন তাদের কেউ চার মাজহাবকে অস্বীকার করেন নি। মাজহাবী পরিচয়ে পরিচয় দেওয়ার বিষয়টিকেও তারা অপছন্দ করেন নি। যারা নিজের মাজহাবকে বড় করার জন্য সহীহ হাদিস অগ্রাহ্য করতো বা অন্য মাজহাবের লোকদের তিরষ্কার করে দলাদলি করার চেষ্টা করতো আলেমরা

তাদের নিন্দা করেছেন কিন্তু সাধারনভাবে মাজহাবের বিরুদ্ধে কথা কেউ বলেন নি। বরং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তারা সবাই কোনো না কোনো মাজাহাবের পরিচয়ে পরিচয় দিয়েছেন। দু'একজন ছাড়া সকল আলেম ও মুহাদ্দিস এই চারটি মাজহাবের কোনো না কোনোটির সাথে সম্পর্কিত। তারা কেউ এসব মাজহাবকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেন নি। তারা বলেন নি, রাসুলের যুগে কি মাজহাব ছিল? সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল? কারণ তারা জানতেন রাসুলের যুগে বা সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল না এমন অনেক কিছুই এখন আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এমন অনেক কিছু আসবে যা আগের যুগে ছিল না।

শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলাবী ﵀ বলেন,

أن هذه المذاهب الاربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها علي جواز تقليدها إلي يومنا هذا وفي ذالك من المصالح ما لا يحصي لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم واشربت النفوس الهوي واعجب كل ذي رأي برأيه

বর্তমান সময় পর্যন্ত উম্মতের আলেমরা সকলে বা তাদের মধ্যে যাদের মতামত গ্রহণযোগ্য তারা একমত যে, এই চারটি মাযহাব যা কিতাবে লিখিত রয়েছে এগুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটির অনুসরণ করা যেতে পারে। এতে যা উপকারীতা আছে তা গুনে শেষ করা যাবে না। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন মানুষের ইজতিহাদ করার শক্তি কমে এসেছে এবং নিজের

খেয়াল খুশির অনুসরণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেকে তার মতকে সঠিক মনে করছে। [আল ইনসাফ]

এমনকি বর্তমান যুগের সালাফী ও আহলে হাদীসদের নিকট মাননীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত শায়েখ বিন বাযও বলেছেন, চার মাজহাবের কোনো একটির পরিচয়ে নিজের পরিচয় দেওয়া বৈধ তবে তিনি মাজহাবী গোড়ামী থেকে দূরে থাকার কথা বলেছেন। [ফাতাওয়ায়ে নুরুন আলাদ-দারব] কেবল বিন বায নয় বরং এ বিষয়ে সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ড লাজনায়ে দায়েমার ফতোয়া হলো,

وأما انتسابه إلى بعض المذاهب الأربعة المشهورة فلا حرج فيه إذا لم يتعصب للمذهب الذي انتسب إليه ولم يخالف الدليل من أجله

চার মাযহাবের কোনো একটির সাথে সম্পর্কিত হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই যদি কেউ গোড়ামী না করে এবং স্পষ্ট দলীল পাওয়ার পরও সেটার বিরোধিতা না করে। [ফাতাওয়ায়ে ইসলামিয়া]

দ্বীন সম্পর্কে যাদের সামান্য পরিমাণ জ্ঞান আছে তারা এ কথাই বলেন। আর নির্বোধরা বলে, মাজহাবের নামে পরিচয় দেওয়া বা মাজহাবের সাথে সম্পর্কিত হওয়া বৈধ নয়। তাদের যুক্তি হলো, মাজহাব রাসুলের যুগে ছিল না, সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল না তবে এখন কেনো আমরা এটা গ্রহণ করবো? এই

যুক্তিতে সব কিছু বিদয়াত বানিয়ে ছাড়ে। সে জানে না এর মাধ্যমে কত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৮. রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর বিভিন্ন বাক্যে সলাত ও সালাম পাঠ করা।

মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

হে ঈমানদাররা, তোমরা নবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করো। [আহযাব/৫৬]

বিভিন্ন হাদীসে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর দরুদ পাঠ করার ফজিলত বর্ণিত আছে। একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَي

সেই ব্যক্তি লাঞ্চিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হয় কিন্তু সে আমার উপর দরুদ পাঠ করে না। [তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব। শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। [মিশকাত/৯২৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

الْبَخِيل مَنْ ذُكِرْت عِنْده فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

সেই প্রকৃত কৃপণ যার সামনে আমার নাম স্মরণ করা হয় কিন্তু সে আমার উপর দরুদ পাঠ করে না।

[তিরমিযী]

ইবনে হাযার আসক্কালানী رحمه الله বলেছেন, বিভিন্ন সনদ একত্রিত করলে এই হাদীসটি কমপক্ষে হাসান প্রমাণিত হয়। [ফাতহুল বারী]

এছাড়া ইবনে হাযার আসক্কালানী رحمه الله ফাতহুল বারীতে দরুদের ফজিলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে কিছু হাদীসকে তিনি সহীহ বা হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

একারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর দরুদ পাঠ করার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং সাধারন মুসলিমরাও ব্যাপারটি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বললেল, আমরা কিভাবে আপনার উপর দরুদ পাঠ করবো? রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের একটি লম্বা দরুদ শিক্ষা দেন। এই দরুদটি সবার নিকট দরুদে ইব্রাহীমী হিসেবে পরিচিত। দরুদে ইব্রাহীমীর বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত থেকে অন্য রেওয়াতের কিছু বেশ-কমও আছে। তবে মোটামুটিভাবে সব রেওয়ায়েতে ইব্রাহীম عليه السلام এর উপর কৃত অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে রাসুলে আকদাস ﷺ এর উপর অনুরূপ অনুগ্রহ

প্রার্থনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ সলাতের মধ্যে দুরুদে ইব্রাহীমী পাঠ করে থাকে। তবে সলাতের বাইরে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নাম শুনে আমরা কিন্তু দরুদে ইব্রাহীমী পাঠ করি না। এসময় বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম দরুদ পাঠ করে থাকে। কেউ বলে, সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেউ বলে, আলাইহিস সলাতু ওয়াস্ সালাম। ওলামায়ে কিরাম যখন বক্তৃতা করেন বা বই লেখেন তখন আল্লাহর প্রশংসা করার পর বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন ভাষায় লম্বা লম্বা দরুদ পাঠ করে থাকেন। এসব দরুদ কিন্তু হাদীসে বর্ণিত নেই। সাহাবায়ে কিরাম থেকেও এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরেণ্য ওলামায়ে দ্বীনের গ্রন্থসমূহের ভূমিকা লক্ষ্য করলেই বিষয়টি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এধরণের দরুদ মুখে পাঠ করা বা কাগজ কলমে লিখে রাখা কেউ নিষিদ্ধ মনে করেছেন বলে আমারা জানি না। সলাতের মধ্যে দরুদে ইব্রাহীমী পাঠ করতে হবে এ বিষয়ে সকলে একমত। সেক্ষেত্রেও দরুদে ইব্রাহীমীর মধ্যে সায়্যেদানা, মাওলানা ইত্যাদি শব্দ যোগ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। কিন্তু সলাতের বাইরে এগুলো যোগ করা বা অন্য কোনো উত্তম বাক্য ব্যবহার করে রাসুলের উপর দুরুদ ও সালাম পেশ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। যদিও তা সরাসরি হাদীসে বর্ণিত না থাকে বা সাহাবায়ে কিরাম হতে প্রমাণিত না থাকে।

৯. নবীদের নামের পর আলাইহিস সালাম, সাহাবয়ে কিরামের নামের পর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের নামের পর রাহিমাহুল্লাহ বলা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নাম শুনলে যেভাবে আমরা দরুদ পাঠ করে থাকি একইভাবে অন্যান্য নবীদের নামের পর আমরা বলি আলাইহিস সালাম, সাহাবায়ে কিররামের নাম শুনলে বলি, রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং পরবর্তী যুগের ওলামায়ে দ্বীনের নাম শুনলে বলি, রহিমাহুল্লাহ। যেসব ওলামায়ে দ্বীন এখনও জীবিত অবস্থায় আছেন তাদের নামের শেষে বলি হাফিজাহুল্লাহ বা দামাত বারাকাতুহুম। সারা বিশ্বের মুসলিমরা এখন এসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সাধারন মুসলিমরা এবং ওলামায়ে কিরাম এসব বিষয়ে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ইমাম নাব্বী রحمه الله বলেন,

كذلك يقول فى الصحابى (رضى الله عنه) فان كان صحابيا بن صحابى قال (رضى الله عنهما) وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار ويكتب كل هذا وان لم يكن مكتوبا فى الاصل الذى ينقل منه فان هذا ليس رواية وانما هو دعاء وينبغى للقارىء أن يقرأ كل ما ذكرناه وان لم يكن مذكورا فى الاصل الذى يقرأ منه ولا يسأم من تكرر ذلك ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما

যখন সাহাবীর নাম আসে তখন রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখবে, যদি পিতা-পুত্র দু’জনই সাহাবী হয় তাহলে রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

লিখবে। একইভাবে সকল ওলামায়ে কিরাম ও বরেণ্য বক্তিদের নামের পর ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত প্রার্থনা করে দোয়া করবে। কোনো বই মুদ্রণ করার সময় এসব কিছু লিখবে যদি মূল বইতে নাও থাকে। একইভাবে কোনো বই পাঠ করার সময় যদি এসব লেখা না থাকে তবু পাঠক নিজে এগুলো বলবে। বারবার এসব বলতে কেউ যেনো বিরক্তি বোধ না করে। যে এসব বলা পরিত্যাগ করে সে অনেক কল্যাণ ও ফজিলত থেকে বঞ্চিত হয়। [শারহে মুসলিম]

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নামের পর দুরুদ পাঠ করার ব্যাপারে সরাসরি কুরআন-হাদিসে নির্দেশনা রয়েছে কিন্তু অন্যান্য নবীদের বা সাহাবায়ে কিরামের নামের পর কিছু পাঠ করার নির্দেশনা সরাসরি কুরআন-হাদীসে নেই। পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কিরামের সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রদু আনহু (رضي الله عنهم ورضوا عنه) “আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে।” কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের নামের পর প্রতিবার এটা বলতে আদেশ করা হয়নি। ঠিক যেভাবে দোয়া মোনাজাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রতিবার সলাতের শেষে মোনাজাত করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। একইভাবে সালাম, রহমত ইত্যাদি বিষয় তো কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত আছে কিন্তু নবী বা নেককার লোকদের নামের শেষে এগুলো উল্লেখ করার

নির্দেশ নেই। তবে যেহেতু তাদের সম্মান করতে আদেশ করা হয়েছে তাই মুসলিম উম্মাহ তাদের নামের পরে এসব বাক্য উচ্চারণ করে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এর জন্য তারা পৃথক দলীলের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। কিন্তু যারা সব কিছুর নাম ধরে দলিল প্রমাণ তালাশ করে, কুরআন-হাদিসে কোনো কিছু সরাসরি উল্লেখ না থাকলে তা বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের উচিৎ এসব বিষয়কে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করা। কিন্তু তারা এক্ষেত্রে তা করতে সক্ষম হয় নি। সম্ভবত তাদের নির্বুদ্ধিতা এখনও সে পর্যায়ে পৌঁছেনি। অথবা জনরোষে পড়ার ভয়ে হয়তো এগুলোকে বিদয়াত বলা হতে বিরত আছে। কিন্তু এ ভয় কতদিন তাদের এ নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত রাখবে সেটাই চিন্তার বিষয়। যারা সম্মান প্রদর্শনের জন্য পবিত্র কুরআনে চুম্বন করা বিদয়াত বলে, কুরআন পাঠ করার পর সদাকাল্লাহুল আজীম বলা বিদয়াতের সমপর্যায়ের বলে গণ্য করে, মসজিদ বা অন্য কোনো পবিত্র স্থানে আল্লাহ শব্দ লেখা থাকলে সেটা মুঝে ফেলতে আদেশ করে, তাদের নিকট এগুলো বিদয়াত হতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রই চাই।

১০. তিন দিনের কমে কুরআন তিলওয়াত।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন,

وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনও এক রাতে কুরআন খতম দিয়েছেন বলে আমি জানি না। [সহীহ মুসলিম]

আবু দাউদের রেওয়ায়েতে এসেছে,

وَلَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ قَطُّ

রসুলুল্লাহ ﷺ কখনও এক রাত্রে কুরআন খতম দেন নি।

তবে বেশ কিছু সাহাবা থেকে এক রাত্রে কুরআন খতম দেওয়ার বর্ণনা রয়েছে। [আলমুগনী, শারহে মুহাজ্জাব] পরবর্তী যুগের ওলামায়ে দ্বীনের কেউ কেউ এক রাতে বহুবার কুরআন খতম দিয়েছেন। ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

وبعضهم ثمان ختمات وهو أكثر ما بلغنا

কেউ কেউ দিনের মধ্যে আট বার কুরআন খতম দিয়েছেন। আমার জানা মতে এটাই সর্বোচ্চ।

[শারহে মুসলিম]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবায়ে কিরামের আমল অপেক্ষা অতিরিক্ত এই আমল কেউ বিদয়াত বলেছে বলে জানা যায় নি। অনেকে অবশ্য শুদ্ধভাবে কুরআন তিলওয়াত করা সম্ভব হবে না এমন আশঙ্কার কারণে তিন দিনের কমে কুরআন খতম দেওয়া

অপছন্দ করেছেন। তবে বিশুদ্ধভাবে তিলওয়াত করে যত বেশি সম্ভব কুরআন পাঠ করা কেউ বিদয়াত বলেন নি।

ইবনে হাযার আসক্কালানী ﵀ ইমাম নাব্বী ﵀ থেকে উল্লেখ করেন, তিনি বলেন,

والاختيار أن ذلك يختلف بالاشخاص فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة والله أعلم

এ বিষয়ে সঠিক কথা হলো কুরআন খতম দেওয়ার বিষয়টি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যে গবেষক তার উচিৎ হবে চিন্তা-গবেষণা করে অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করা যায় এভাবে (অর্থাৎ কম পরিমান) পাঠ করা। একইভাবে যার জ্ঞান অর্জন বা অন্য কোনো দ্বীনী দায়িত্ব রয়েছে, যার সাথে মুসলিমদের স্বার্থ জড়িত রয়েছে, তার উচিৎ হবে এমনভাবে কুরআন পাঠ করা যাতে অন্যান্য দায়িত্বে অবহেলা না হয়। আর যার এসব কিছু নেই সে যতটুকু সম্ভব বেশি বেশি পাঠ করবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তার অন্তরে বিরক্তি সৃষ্টি না হয় এবং খুব দ্রুত পাঠ করার কারণে অর্থগত বিকৃতি না ঘটে। [ফাতহুল বারী]

এভাবে রাতের সলাত ও সওম সম্পর্কেও পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের অনেকে অতিরিক্ত আমল করেছেন বলে বর্ণিত আছে। কোনো কোনো বরেণ্য আলেম হতে এমন বর্ণনাও আছে, যা আধুনা চিন্তাবিদদের অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হয়। এখানে সেসবের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল এটা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, আল্লাহর রাসুল বা সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল না এমন যে কোনো কাজ বিদয়াতে পরিণত হবে এ সূত্র সঠিক নয়। পূর্বে উল্লেখিত হাদীসমূহ, সাহাবায়ে কিরামের কর্মপন্থা এবং ওলামায়ে দ্বীনের ঐক্যমতের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়। উপরের উদহারণসমূহের উপর গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে এটাও প্রমাণিত হবে যে, এর মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে দ্বীনী বিষয় হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া গতান্তর নেই। যেমন, প্রতি রাকাতে সুরা ইখলাস পাঠ করা, দোয়া ও যিকিরের মধ্যে বাড়তি কিছু সংযোজন করা, জুময়ার দিন নতুন একটি আজানের প্রচলন করা, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের মুলনীতি প্রনয়ণ করা ইত্যাদি। অতএব, মাসালেহে মুরসালার নামে বা অন্য কোনো যুক্তিতে এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব নয়। এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তের মূলনীতিতে গ্রহণযোগ্য কোনো কাজ নতুন সৃষ্ট হলেও বিদয়াত হিসেবে গণ্য নয়। বরং বিদয়াত হলো তাই, যা শরীয়তের মূলনীতিতে অগ্রহণযোগ্য

সাব্যস্ত হবে। নতুন সৃষ্ট বিষয়কে একবাক্যে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে পরিত্যাগ করা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া সঠিক পন্থা নয় বরং শরীয়তের মূলনীতির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে বিষয়টির বিধান কি হয়। শরীয়তের দলিল প্রমাণে কোনো বিষয়ের উপর ফরজ, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ, মুবাহ ইত্যাদি যে বিধানই প্রযোজ্য হয় তার উপর সেই বিধানই প্রয়োগ করতে হবে। কোনো কিছুর উপর শরীয়তের বিধানের বিপরীত বিধান প্রয়োগ করা হলে তা বিদয়াত বলে গণ্য হবে।

মোট কথা কেবলমাত্র রাসুলুল্লাহ ﷺ করেন নি এর উপর নির্ভর করে কোনো বিষয়কে নিষিদ্ধ বলা যাবে না। এটিই সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটির উপর একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। অনেকে বলেন, রাসুলের সকল কাজই তো সুন্নাত। সে হিসেবে আল্লাহর রাসুল যা করেন সেটা করা যেমন সুন্নাত আল্লাহর রাসুল যেটা করেন নি তা না করাও সুন্নাত সুতরাং আল্লাহর রাসুল যা কিছু করেন নি তা করা অর্থ তার সুন্নাতের বিপরীত আমল করা অতএব বিষয়টি নিন্দনীয় হবে। তাহলে এর সাথে উপরে যা কিছু বলা হলো তার সমন্বয় কিভাবে হবে?

উপরোক্ত প্রশ্নটির উত্তর পেতে হলে আমাদের তারকী সুন্নাত (السنة التركية) সম্পর্কে জানতে হবে।

তারকী সুন্নাত (السنة التركية) :

তারক (الترك) শব্দের অর্থ কোনো কিছু পরিত্যাগ করা আর তারকী সুন্নাত অর্থ আল্লাহর রাসুল কোনো কিছু পরিত্যাগ করার কারণে উক্ত বিষয়টি পরিত্যাগ করা সুন্নাত হিসেব গণ্য হওয়া। সামগ্রিকভাবে এটা সত্য যে, কোনো কিছু পরিত্যাগ করার মাধ্যমে অনেক সময় বিষয়টি সুন্নাতে পরিনত হয় এবং তার বিপরীত আমল করা অনুচিত প্রমাণিত হয়। কিন্তু এর সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে যাতে মানুষ তারকী সুন্নাতের স্বরুপ এবং এর বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত হতে পারে। আমরা কয়েকটি শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

* ফিল (فعل) ও তারক (ترك) এর মাঝে সম্পর্ক।

আরবীতে ফিল (فعل) অর্থ কোনো কিছু করা আর তারক (ترك) অর্থ কোনো কিছু না করা। চিন্তা করলে দেখা যাবে কোনো কাজ করা একটি কাজ আবার কোনো কাজ না করাও একটি কাজ। যাকাত দেওয়া যেমন একটি কাজ যাকাত না দেওয়াও একটি কাজ। একারণে বলা হয় যাকাত দেওয়া ভাল কাজ আর যাকাত না দেওয়া খারাপ কাজ। সুতরাং রাসুলুল্লাহ ﷺ যেসব কাজ পরিত্যাগ করেছেন সেগুলোও তার কাজ হিসেবেই গণ্য। তাই

হাদীসকে তিনটি প্রকারে বিভক্ত করা হয়। ১. ক্বওলী (قولي) অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ যা কিছু মুখে বলেছেন ২. ফি’লী (فعلي) অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ যেসব কাজ করেছেন এবং ৩. তাকরীরী (تقريري) অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সামনে যেসব কাজ করা হয়েছে আর তিনি সেগুলোকে সমর্থন করেছেন। এখানে তারকী (تركي) হাদীস তথা রাসুলুল্লাহ ﷺ যেসব কাজ পরিত্যাগ করেছেন সেগুলোকে ভিন্ন একটি নামে উল্লেখ করা হয় না কারণ এটা আসলে ফি’লী (فعلي) হাদীস তথা রাসুলুল্লাহ ﷺ যা কিছু করেছেন তার মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত।

উসুলবিদ ওলামায়ে দ্বীনও আল্লাহর রাসুল হতে বিধি-বিধান প্রমাণিত হওয়ার তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে রুশদ رحمه الله বলেন,

إن الطرق التي منا تلقت الاحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار

রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে দ্বীনের বিধি-বিধান পাওয়া যায় তিনটি পন্থায়। হয়তো কথার মাধ্যমে অথবা কাজের মাধ্যমে অথবা সম্মতি জানানোর মাধ্যমে। [বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ]

ইবনে হিযাম رحمه الله বলেন,

السنن تنقسم ثلاثة أقسام: قول من النبي (ص) أو فعل منه عليه السلام، أو شئ

رآه وعلمه فأقر عليه ولم ينكره

রাসুলের সুন্নাত (রীতি-নীতি ও কার্যাবলী) তিনটি ভাগে বিভক্ত। তিনি যা বলেছেন, তিনি যা করেছেন এবং যেসব বিষয় তার সামনে ঘটেছে বা তিনি জানতে পেরেছেন কিন্তু নিষেধ করেন নি। [আল-আহকাম]

এরপর তিনি তিনটি প্রকারের প্রত্যেকটির বিধান কি সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

এখানে দেখা যাচ্ছে দ্বীনের বিধি-বিধান প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুল যেসব বিষয় পরিত্যাগ করেছেন সে সম্পর্কে পৃথকভাগে কিছুই বলা হয়নি। অনেকে বলতে পারেন "তাহলে তারকী সুন্নাতের কোনো গুরুত্ব নেই"। আসল ঘটনা তা নয় বরং এখানে তারকী সুন্নাতের কথা পৃথকভাগে উল্লেখ করা হয় নি কারণ এটা আসলে ফি'লী সুন্নাতের মধ্যেই গণ্য। এদুটি বিষয় আসলে একই এবং তাদের বিধানও এক। রাসুলুল্লাহ ﷺ যা কিছু করেছেন সে অনুযায়ী কাজ করা আর যা কিছু পরিত্যাগ করেছেন সে অনুযায়ী কাজ না করার অর্থই হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাজ অনুযায়ী কাজ করা। অতএব দুটি বিষয়ই মূলত রাসুলুল্লাহর কাজ তথা ফি'ল (فعل) এর সাথে সম্পর্কিত।

আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলাম, কারণ উসুলে ফিকহের

গ্রন্থ সমূহতে তারকী সুন্নাত সম্পর্কে পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না। সেখানে কেবল আল্লাহর রাসুলের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একারণে বর্তমানে কেউ কেউ তারকী সুন্নাতকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে থাকে। এই সিদ্ধান্ত আসলে সঠিক নয়। বরং আল্লাহর রাসুল যা কিছু পরিত্যাগ করেছেন সেগুলোও তার কাজ বলেই গণ্য এবং নির্দিষ্ট শর্ত স্বাপেক্ষে সেগুলোর আনুগত্য করা কাম্য।

বিপরীত দিকে কিছু লোক উসুলে ফিকহের গ্রন্থসমূহতে সরাসরি তারকী সুন্নাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না পাওয়ার কারণে নিজেদের মন মতো তারকী সুন্নাতের ব্যাখ্যা করে থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে রাসুলুল্লাহ ﷺ যা পরিত্যাগ করেছেন তা পরিত্যাগ করা ফরজ। অথচ এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আল্লাহর রাসুল যা কিছু করেছেন তার সব কিছু ফরজ নয় একইভাবে তিনি যা কিছু পরিত্যাগ করেছেন তার সব কিছু নিষিদ্ধ বা হারাম নয়। উসুলবিদ ওলামায়ে কিরাম শরিয়তের মূলনীতির উপর গবেষণে করে এসব বিষয়ের বিধান নির্ণয় করেছেন। আল্লাহর রাসুলের কার্যাবলী কখন সুন্নাতে পরিণত হয় এবং সেক্ষেত্রে তার বিধান কি হয় সে বিষয়ে তারা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিজেদের মন মতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে উসুলবিদ ওলামায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কার্যাবলী সম্পর্কে যেসব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তার আলোকে ‘তারকী

সুন্নাত’ বলতে কি বোঝায় এবং তার বিধান কি তা নির্ণয় করতে হবে।

* রাসুলের কাজ কখন সুন্নাতে পরিণত হয়?

সুন্নাত শব্দের অর্থ পথ, পদ্ধতি বা তরীকা। সাধারনভাবে যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুলের তরীকাকে সুন্নাত বলা হয়। তবে ফুকাহায়ে কিরামের নিকট সুন্নাত বলতে বোঝায় যে বিষয়ে আল্লাহ নির্দেশ দেন নি রাসুলও তা করতে আদেশ করেন নি তাই বিষয়টি ফরজ নয় তবে আল্লাহর রাসূল মৌখিকভাবে বা নিজে আমল করার মাধ্যমে সেটা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। এসকল বিষয়ের উপর আমল করলে সওয়াব হয় এর বিপরীত আমল করা মাকরুহ হিসেবে গণ্য হয়। তবে ফরজ পরিত্যাগ করার মতো গোনাহ হয় না।

সাধারনভাবে অনেকে মনে করে আল্লাহর রাসুলের সকল কাজই সুন্নাত হিসেবে গণ্য। এ ধারণা সঠিক নয়। উসুলবিদ ওলামায়ে দ্বীন আল্লাহর রাসূলের কার্যাবলীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।

একঃ আদাত তথা সাধারন অভ্যাস হিসেবে তিনি যা কিছু করেছেন। যেমন, ঘুম, ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি।

দুইঃ ইবাদত তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি যা কিছু করেছেন। যেমন, যিকির-আযকার, কুরআন তিলওয়াত, সলাত-

সপ্তম ইত্যাদি।

সাধারনভাবে এ বিষয়ে সকলে একমত যে আল্লাহর রাসুল ﷺ অভ্যাসবশত যেসব কাজ করেছেন সেগুলো সুন্নাত হিসেবে গণ্য নয়। যেমন, আল্লাহর রাসুল ঘুমাতেন অতএব, ঘুমানো সুন্নাত বা আল্লাহর রাসুল যেভাবে হাঁটতেন সেভাবে হাঁটা সুন্নাত এমন কেউ বলেন নি। আল্লাহর রাসুলের এই প্রকৃতির কার্যাবলীর বিপরীতে কাজ করা কোনোভাবেই অপছন্দনীয় বা নিন্দনীয় নয়। তবে যদি কেউ এসব ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ কে পুরোপুরি অনুসরণ করতে চায় তবে তা উত্তম। যেমন আনাস رضي الله عنه একদিন দেখেন রাসুলুল্লাহ ﷺ বেছে বেছে লাউ খাচ্ছেন। তিনি বলেন, (فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ) সেদিন থেকে আমি লাউ খাওয়া পছন্দ করি। [সহীহ বুখারী] সাহাবায়ে কিরাম থেকে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যাতে দেখা যায় তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অভ্যাসগত বিষয়সমূকেও অনুসরণের চেষ্টা করতেন।

কাজী ইবনুল আরবী رحمه الله এ বিষয়ের সঠিক বিধান বর্ণনা করে বলেন,

أما أفعاله صلى الله عليه و سلم التي وقعت منشأة في جبلة الآدمي فهي على الندب في قول المحققين وقال بعضهم إنها على الوجوب وهو قول ضعيف ورد بعض الأحبار من المتأخرين فقال إنها لا حكم لها ولا دليل فيها وهذه هفوة شنعاء فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على بكرة أبيهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم في نومه وأكله ولباسه وشرابه ومشيه وجلوسه وجميع حركاته فاعتقادها لغوا من

هذا الحبر المتأخر هفوة وسهو

আল্লাহর রাসূল মানবিক প্রয়োজন ও অভ্যাসগতভাবে যেসব কাজ করেছেন মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরাম সেগুলোকে অনুসরণ করা উত্তম (সওয়াবের কাজ) হিসেবে গণ্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন সেগুলো অনুসরণ করা ওয়াজিব (আবশ্যক)। এটা দূর্বল মত। পরবর্তী যুগের আলেমদের কেউ কেউ বলেছেন, এসব বিষয়ের কোনো গুরুত্ব নেই। তার কোনো বিধানও নেই (এগুলোর অনুসরণ করলে সওয়াব হবে না)। এটা মারাত্মক ভুল। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ঘুম, খাওয়া, পরিধান করা, পান করা, বসা ইত্যাদি যাবতীয় অভ্যাসগত বিষয়সমূহ অনুসরণ করার ব্যাপারেও সাহাবায়ে কিরাম একমত হয়েছেন। অতএব এসব বিষয়ে কোনো সওয়াব নেই এমন মন্তব্য করা সঠিক নয়। [আল-মাহসুল]

মোট কথা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অভ্যাসগত কার্যাবলী কেউ অনুসরণ করলে উত্তম বলে গণ্য হবে তবে এটা অনুসরণ করা আবশ্যক নয় এবং এর বিপরীত কিছু করা নিন্দনীয় নয়। উদহরণস্বরুপ যদি কারো লাউ খেতে ভাল না লাগে ফলে লাউ না খায় তবে তার ঈমানদারিত্বে কোনো কমতি ঘটেছে বলে গণ্য হয় না। তার এ কাজ মাকরুহও নয়। যেহেতু আল্লাহর রাসূল লাউ খেয়েছেন আদাত বা অভ্যাসগত কারণে, ইবাদত হিসেবে নয়। অতএব, আল্লাহর রাসুলের কোনো কাজ সুন্নাত হিসেবে গণ্য কিনা এবং

তার বিপরীতে আমল করা অপছন্দনীয় বা নিন্দনীয় কিনা সেটা বুঝতে হলে প্রথমেই জানতে হবে তিনি কাজটি ইবাদত হিসেবে তথা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম হিসেবে করেছেন নাকি অভ্যাসবশত করেছেন। যদি আল্লাহর ইবাদত হিসেবে করে থাকেন তবে তো তা সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে এবং তার বিপরীতে আমল করা অছন্দনীয় হবে আর যদি অভ্যাসবশত করে থাকেন তবে তা সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে না এবং তার বিপরীতে আমল করা অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় হবে না যদিও তা অনুসরণ করা উত্তম কাজ হিসেবে গণ্য হয়।

আল্লাহর রাসূলের কার্যাবলীর মধ্যে আর একটি অংশ রয়েছে যা আসলে উত্তম বা মুস্তাহাব হিসেবেও গণ্য নয় বরং বৈধ হিসেবে গণ্য। যেমন, আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ দাড়িয়ে প্রসাব করেছেন [সহীহ বুখারী]। এই হাদীসের আলোকে এমন বলার কোনো সুযোগ নেই যে দাড়িয়ে প্রসাব করা সুন্নাত বা উত্তম। কারণ অন্যান্য বিভিন্ন হাদীসে প্রসাব বা পায়খানার সময় যেসব আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার আলোকে প্রমাণিত হয় এধরণের কাজ রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তম হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারেন না। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল বসে প্রসাব করা। একারণে আয়েশা ﵂ বলেছেন, যদি কেউ বলে, রাসুলুল্লাহ ﷺ দাড়িয়ে প্রসাব করেছেন তোমরা বিশ্বাস করবে না। তিনি সর্বাবস্থায় বসে প্রসাব করতেন। [ইবনে মাযা]।

এসব কারণে ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ হয়তো কোনো ওযরের কারণে দাড়িয়ে প্রসাব করে থাকবেন অথবা দাড়িয়ে প্রসাব করা যে বৈধ এটা বোঝানোর জন্য তিনি এমন করেছেন উত্তম প্রমাণ করার জন্য নয়।

এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কার্যাবলীকে বৈধ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে উত্তম অর্থে নয়। যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ দাড়িয়ে পানি পান করেছেন বলে বর্ণিত আছে অথচ অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি দাড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। এর ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন, যে হাদীসে দাড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করা হয়েছে যেখানে মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় অর্থে এটা বলা হয়েছে হারাম বা নিষিদ্ধ অর্থে নয়। আর এই বিধান যে হারাম বা নিষিদ্ধ নয় এটা প্রমাণ করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনও কখনও দাড়িয়ে পানি পান করেছেন। [শারহে মুসলিম]

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজ করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া গেলেই উক্ত কাজটি সুন্নাতে পরিণত হয় না। সর্বাবস্থায় এমনও বলা যায় না যে, বিষয়টি উত্তম। বরং বিষয়টির বিধান নির্ণয়ের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য দলিল প্রমাণের উপর চিন্তা-গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যেসব বিষয় পরিত্যাগ করেন সেগুলোর ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো কিছু পরিত্যাগ করলেই উক্ত কাজটি খারাপ বা অনুত্তম এমন মন্তব্য সঠিক নয়। বরং প্রথমেই দেখতে হবে উক্ত কাজটি রাসুলুল্লাহ ﷺ কেনো পরিত্যাগ করেছেন। আল্লাহর নিকট তা অপছন্দণীয় হওয়ার কারণে বা দ্বীনী দৃষ্টিকোন থেকে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে নাকি অভ্যাসবশত? যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো কিছু দ্বীনী দৃষ্টিকোন থেকে অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করে থাকেন তবে তো উক্ত কাজ পরিত্যাগ করা সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে এবং তাতে লিপ্ত হওয়া অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় হবে। কিন্তু যদি বোঝা যায় রাসুলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করে নয় বরং অভ্যাসবশত তা পরিত্যাগ করেছেন তবে তা সুন্নাত হিসেবে গণ্য নয়। উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়া নিন্দনীয় বা অপছন্দনীয়ও নয়। এক্ষেত্রে যদি কেউ রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমলের সাথে হুবহু মিল রাখতে চায় তবে সেটা উত্তম। কিন্তু অন্যের উপর এ বিষয়ে কড়াকড়ি করা উচিৎ নয়। উদাহরণস্বরুপ ঐ সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করা যায় যিনি প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস তিলোয়াত করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ কিন্তু এমনটি করতেন না। অনেকে মনে করতে পারে এই সাহাবী অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় কাজ করেছেন যেহেতু তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তার বিপরীতে আমল করেছেন। অথচ আমরা দেখেছি রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে তিরষ্কার

করেন নি বরং তার জন্য পুরষ্কার ঘোষণা করেছেন। উপরে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তার আলোকে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস তিলোয়াত করতেন না। এখন প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করার বিধান কি জানতে হলে আমাদের প্রথমেই প্রশ্ন করতে হবে আল্লাহর রাসুল কেনো এভাবে তিলোয়াত করতেন না? প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হোন বা এটা খারাপ কাজ একারণেই কি তিনি তা পাঠ করতেন না নাকি সাধারনভাবে এটা তার অভ্যাস ছিলো না তাই এভাবে পাঠ করেন নি। চিন্তা করলে দেখা যাবে প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস বা অন্য কোনো সূরা পাঠ করার ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট বা তার রাসুলের নিকট অপছন্দনীয় হওয়ার কোনো কারণ নেই বরং আল্লাহর বাণী (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) "তোমাদের যতটুকু সহজ মনে হয় ততটুকু তেলোয়াত করো" [মুজ্জাম্মিল/২০] এর আলোকে সলাতে বা সলাতের বাইরে যে কোনো সূরা পাঠ করা উত্তম হিসেবে প্রমাণিত। তবে যেহেতু প্রতি রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন তেলোয়াত করা সম্ভব নয় আবার প্রতিটি সূরা বারবার করে পাঠ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয় তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ তিলোয়াতের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূরা পাঠ করেছেন। অনেক সময় কোনো কোনো সলাতে কিছু কিছু সূরা বেশি বেশি পাঠ

করতেন। এটা ছিল তার অভ্যাস। এর অর্থ কখনও এমন নয় যে তিনি যেসব সুরা সলাতে পাঠ করেছেন তার বাইরে কোনো সূরা পাঠ করা অপছন্দনীয় বা নিন্দনীয় বরং সলাতের মধ্যে তিলোয়াত করার সাধারন যে নির্দেশ রয়েছে সে আলোকে সূরা ফাতিহার পর যে কোনো রাকাতে যে কোনো সূরা পাঠ করা উত্তম হিসেবে প্রমাণিত। কোনো সূরা বারবার পাঠ করা বা একেক রাকাতে ভিন্ন ভিন্ন সূরা পাঠ করা ইত্যাদি যে কোন পদ্ধতিতে তেলোয়াত করা বৈধ। আর কেউ যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমলের সাথে হুবহু মিল রাখার চেষ্টা করে এবং তিনি যে সলাতে যে সূরা বেশি বেশি পাঠ করতেন সেই সলাতে তা পাঠ করে তবে তা উত্তম হিসেব গণ্য হবে। কিন্তু এর বিপরীত আমল করা হলে তা কোনোভাবেই নিন্দনীয় বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে না। যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা নিন্দনীয় মনে করার কারণে পরিত্যাগ করেন নি। বরং এটা ছিল তার সাধারন অভ্যাস। একারণে আমরা দেখি যে সাহাবা প্রতি রাকাতে সুরা ইখলাস পাঠ করতেন তার সাথীরা তাকে এটা পরিত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করে। এরপরও যখন তিনি এটা পরিত্যাগ করেন নি তারা তাকে বিদয়াতী বা গোমরাহ আখ্যায়িত করে মসজিদ থেকে বের করে দেন নি। বরং তাকে নিজেদের ইমাম হিসেবেই বহাল রেখেছেন। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘটনা শুনে উক্ত ব্যক্তির এ কাজকে প্রশংসা করেছেন, নিন্দা করেন নি। কারণ সে এমন

কিছু করে নি যা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।

প্রতি সলাতের শেষে মোনাজাত করা সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। জামাতে সলাত আদায় করে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ মোনাজাত করেন নি এটা সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো,

- তিনি কেনো এটা করেন নি? তিনি কি একাজ অপছন্দ করেছেন? কিছু লোক হাত তুলে মিনতি করলে কি আল্লাহ নাখোশ হোন? এটা কি শরীয়তে নিন্দনীয় কাজ?

দোয়া-মোনাজাত করা সম্পর্কে শরীয়তে যেসব দলিল প্রমাণ বর্ণিত আছে সেসবের উপর স্বাভাবিক বুদ্ধিতে চিন্তা করলেই প্রতীয়মান হবে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ সলাতের পর দোয়া-মোনাজাত করা অপছন্দনীয় বা নিন্দনীয় মনে করেন নি। তবে তিনি এটা করেন নি। কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে যতগুলো ভাল কাজ করা যায় তার সবগুলো করে দেখানো সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই। যারা সলাতের পর সম্মিলিত মোনাজাতকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং এর কারণ হিসেবে বলে, রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা করেন নি তারা কি এটা লক্ষ্য করে না যে, কেবল মোনাজাত নয় বরং রাসুলুল্লাহ ﷺ সলাতের পর করেন নি এমন কাজের হিসাব করলে শত-সহস্র উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের সলাত আদায় করে

মসজিদের এক কোনে বসে এশা পর্যন্ত কুরআন তেলোয়াত করে কাটিয়েছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখন যদি কেউ প্রতিদিন মাগরিবের পর হতে এশা পর্যন্ত কুরআন তেলোয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলে এটা কি নিন্দনীয় বিদয়াত বলে গণ্য হবে নাকি উত্তম স্বভাব বলে গণ্য হবে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো কিছু করেননি এটা প্রমাণ করে না যে, উক্ত কাজ নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় বরং লক্ষ্য করতে হবে তিনি উক্ত কাজ অপছন্দ করার কারণে করেননি নাকি সাধারন অভ্যাসের কারণে করেননি। যদি দেখা যায় রাসুলুল্লাহ ﷺ অপছন্দনীয় বা নিন্দনীয় হওয়ার কারণে নয় বরং স্বাভাবিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কাজ পরিত্যাগ করেছেন তবে তাতে লিপ্ত হওয়া নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় নয়। এক্ষেত্রে যদি কেউ আল্লাহর রাসুলের সাধারন অভ্যাসের অনুসরণ করে উক্ত কাজ পরিত্যাগ করতে চায় তবে ক্ষেত্র বিশেষে এটা উত্তম হতে পারে কিন্তু এর বিপরীতে আমল করা কোনোক্রমেই অপছন্দনীয় বা নিন্দনীয় নয়।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়। উপরে আমরা দেখেছি রাসুলুল্লাহ ﷺ যেসব কাজ করেন সাধারনত সেগুলোর অনুসরণ করা উত্তম কিন্তু অনেক সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন অনেক কাজ করেন যার মাধ্যমে আসলে কাজটি উত্তম বোঝায় না বরং বৈধ বোঝায়। যেমন দাড়িয়ে পানি পান করা বা দাড়িয়ে প্রসাব করা

সম্পর্কিত ঘটনায় আমরা দেখেছি। একইভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় এমন কাজ পরিত্যাগ করেন যেটা আসলে তার নিকট উত্তম কাজ হিসেবে গণ্য। কিন্তু কাজটি ফরজ নয় তাই তা পরিত্যাগ করা যায় এমন প্রমাণ করার জন্য বা অন্যান্য বিভিন্ন কারণে তিনি তা পরিত্যাগ করে থাকেন। এর অনেক উদহারণ রয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ

আমি যদি উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তবে প্রতি সলাতের সময় তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَوْلاَ أَنَّ رِجَالًا مِنَ المؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ

এমন কিছু মুমিন রয়েছে যাদের আমি বাহন দিতে পারি না (ফলে তারা যুদ্ধে গমন করতে পারে না)। আমি তাদের ফেলে রেখে যুদ্ধে চলে গেলে তারা (আমি যুদ্ধে-বিগ্রহে কষ্ট করছি আর তারা এলাকায় বসে আছে এই ভেবে) কষ্ট পাবে। এমন না হলে আমি প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। [বুখারী ও মুসলিম]

এছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ কয়েকদিন জামাতে তারাবীর সলাত

আদায়ের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তা ফরজ করে দেওয়া হয় কিনা এমন ভেবে তা পরিত্যাগ করেন। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

এসব হাদিস প্রমাণ করে, রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় উম্মতের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে উত্তম কাজও পরিত্যাগ করতেন।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় এমন কাজ পরিত্যাগ করতেন যা আসলে তিনি পছন্দ করতেন কিন্তু সকল মানুষ উৎসাহের সাথে তা করতে শুরু করলে আল্লাহ হয়তো তা ফরজ করে দেবেন এই ভয়ে তিনি তা পরিত্যাগ করতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

ইবনে হিযাম رحمه الله এ সম্পর্কে আলোচনা করার পর বলেন,

وإنما قلنا هذا لئلا يقول جاهل: أيجوز أن يترك عليه السلام الافضل

আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলাম কারণ হয়তো কোনো মুর্খ ব্যক্তি বলে বসতে পারে আল্লাহর রাসূল কি কোনো উত্তম কাজ পরিত্যাগ করতে পারেন? [আল আহকাম]

এখানে ঐ সকল লোকদের জন্য যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে যারা মীলাদ-মোনাজাত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে বলে, আল্লাহর রাসুল এটা করেন নি। যদি এটা উত্তমই হতো তবে রাসুল এটা পরিত্যাগ করতেন না। প্রশ্ন হলো

রাসুলুল্লাহ ﷺ কি এটা থেকে নিষেধ করেছেন? এখানে একথা বলাই কি বেশি যৌক্তিক নয় যে যদি বিষয়টি খারাপই হতো তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তা থেকে নিষেধ করতেন? তাছাড়া কিভাবে এ দাবী সঠিক হতে পারে যে উত্তম হলে রাসুলুল্লাহ এটা পরিত্যাগ করতেন না! এরা কি এটা লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহর রাসুল কেবল খারাপ মনে করার কারণে একটি বিষয় পরিত্যাগ করেন এমন নয় বরং অনেক সময় তিনি উত্তম ও পছন্দনীয় বিষয়ও পরিত্যাগ করে থাকেন যাতে উম্মতের উপর কষ্টকর না হয়। যেমন যারা ওযরের কারণে জিহাদে গমণ করতে পারে না তাদের যাতে কষ্ট না হয় সে উদ্দেশ্যে জিহাদের মতো উত্তম আমলকে তিনি পরিত্যাগ করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ যেসব কাজের উপর গুরুত্ব সহকারে আমল করেছেন সেগুলো তার সুন্নাত হিসেবে গণ্য। নেককার ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর রাসুলের সুন্নাতকে পরিত্যাগ করা মানসিকভাবে ভীষণ কষ্টকর। বুযর্গ ব্যক্তিরা তো বটেই এমনকি সাধারন মুসল্লীদের বেশিরভাগই ফরজ সলাতের আগে ও পরের সুন্নাতগুলো বিশেষ ওজর ছাড়া পরিত্যাগ করে না। কখনও পরিত্যাগ করলে মানসিকভাবে ভীষণ কষ্ট পায়। যদি সবগুলো ভাল আমল রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে আমল করে দেখিয়ে দিতেন এবং সেগুলো সুন্নাতে পরিণত হতো তবে এসব লোকেরা ভীষণ কষ্টকর পরিস্থিতিতে পড়ে যেতো। যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ মাগরিব থেকে

এশা পর্যন্ত মসজিদে বসে নিয়মিত কুরআন তেলোয়াত করতেন এবং এধরণের যত ভাল আমল আছে সেগুলোর উপর নিয়মতি আমল করে যেতেন তবে তার উম্মতের পক্ষে সেগুলোর হক আদায় করা সম্ভব হতো না। একারণে তিনি এগুলোর উপর নিজে আমল করেন নি এর অর্থ এই নয় যে এগুলো খারাপ কাজ। যেহেতু এগুলো উত্তম কাজ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে অকাট্য প্রমানাদি রয়েছে।

মোট কথা, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো কিছু পরিত্যাগ করেন কিন্তু স্পষ্টভাবে বোঝা যায় তিনি খারাপ মনে করে এটা পরিত্যাগ করেন নি বরং উম্মতের উপর সহজ করার জন্য বা সাধারন অভ্যাস অনুযায়ী তা পরিত্যাগ করেছেন তবে উক্ত কাজ পরিত্যাগ করা সুন্নাতে পরিণত হবে না। বরং বলা হবে, কাজটি ফরজ নয় বা রাসুলুল্লাহর সুন্নাত নয়। কিন্তু এরপরও কাজটি বৈধ বা এমনকি মুস্তাহাব তথা উত্তম কাজ হিসেবে গণ্য হতে পারে যদি ভিন্ন কোনো দলিল প্রমাণের আলোকে তা উত্তম হিসেবে প্রমাণিত হয়। এসব বিষয় ‘‘তারকী সুন্নাতের’’ মধ্যে গণ্য নয়। ‘তারকী সুন্নাত’ বলতে কেবল সেই সকল বিষয়কে বোঝাবে যেগুলো শরীয়তের মানদন্ডে নিন্দনীয় বা অপছন্দনীয় মনে করার কারণেই আল্লাহর রাসুল তা পরিত্যাগ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ঈদের সলাতের পূর্বে আজান বা ইকামতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। হাদীসে এসেছে রাসুলুল্লাহ ﷺ আজান

বা ইকামত ছাড়াই ঈদের সলাত আদায় করেছেন। [বুখারী ও মুসলিম] এই বিধানটির ব্যাপারে চিন্তা করলে দেখা যাবে শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে এটা অপছন্দনীয় মনে করার কারণেই রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা পরিত্যাগ করেছেন। যেহেতু আজান ও ইকামত ফরজ সলাতের জন্য বিশেষ একটি বিধান। আর শরীয়তে ফরজ ইবাদতের সাথে অন্যান্য ইবাদতের পার্থক্য রাখার বিধান রয়েছে। যাতে মানুষ ফরজ নয় এমন বিষয়কে ফরজ মনে না করে। একারণে হাদীসে ফরজ সলাত আদায় করার পর তৎক্ষনাৎ ঐ স্থানেই দাড়িয়ে নফল সলাত আদায় না করে একটু বিরতি নিয়ে বা একটু দূরে সরে গিয়ে নফল সলাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে সাধারন মানুষ ফরজ ও নফলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। একইভাবে রমজানের দু'এক দিন পূর্বে নফল রোজা রাখতে এবং সন্দেহের দিন (يوم الشك) তথা যেদিন চাঁদ দেখা যায় না সেই দিন রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে যাতে মানুষ নফল রোজাকে ফরজের সাথে মিলিয়ে না ফেলে। এই মূলনীতির আলোকেই ঈদের সলাত, বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত, সূর্যগ্রহণের সলাত, জানাযার সলাত ইত্যাদি কোনো সলাতেই আজান বা ইকামতের বিধান দেওয়া হয়নি। যেহেতু আজান বা ইকামত পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য। অন্য কোনো সলাতের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা হলে মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাতের সাথে উক্ত

সলাতকে মিলিয়ে ফেলবে এমন আশঙ্কা রয়েছে। এধরণের অবস্থায় কোনো বিষয় পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তা সুন্নাতে পরিনত হয় এবং উক্ত বিষয়ের উপর আমল করা বিদয়াত বলে গণ্য হয়। আজান ও ইকামত যদি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাতের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট না হতো তবে কেবলমাত্র রাসুলুল্লাহ ﷺ পরিত্যাগ করেছেন এই কারণে এটা বর্জনীয় হতো না। এর প্রমাণ হলো ওলামায়ে দ্বীন ঈদের সলাতে আজান ও ইকামত দিতে নিষেধ করেছেন কিন্তু "আস-সলাতু জামিয়াতুন" তথা "সলাত দাড়িয়ে গেছে" বা এই প্রকারের কোনো শব্দ উচ্চারণ করে মানুষকে ঈদের জামাত দাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অবহিত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

ইমাম শাফেঈ رحمه الله বলেন,

ولا أذان إلا للمكتوبة فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للمكتوبة وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة أو الصلاة: قال وإن قال هلم إلى الصلاة لم نكرهه وإن قال حي على الصلاة فلا بأس وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان قال ولو أذن أو أقام للعيد كرهته

ফরজ সলাত ছাড়া অন্য কোনো সলাতে আজান দেওয়ার বিধান নেই। কেননা আল্লাহর রাসুল ফরজ সলাত ছাড়া অন্য কোনো সলাতে আজান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে আমরা জানি

না। আমার নিকট পছন্দনীয় হলো ঈদের সলাতে এবং (ফরজ সলাত ছাড়া) অন্যান্য যেসব সলাত জামাতে আদায় করা হয় ইমাম সাহেব মুয়াজ্জিনকে আদেশ করবেন যেনো তিনি ‘‘আস-সলাতু জামিয়াতুন’’ (জামাত দাড়িয়ে গেছে) বলে মানুষকে জামাতের দিকে ডাকে। যদি বলে, হালুম্মা ইলাস্ সালাতি (নামাযের দিকে এসো) তবে তাও আমার নিকট অপছন্দনীয় নয়। যদি বলে ‘‘হাইয়া আলাস্ সালা’’ (সলাতের দিকে এসো) তবু সমস্যা নেই তবে এটা পরিত্যাগ করাই উত্তম যেহেতু এটা আজানের শব্দের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আজানের শব্দের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত এমন কোনো শব্দ এক্ষেত্রে ব্যাবহার না করাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর যদি সম্পূর্ণ আজান বা ইকামত দেয় তবে তা আমার নিকট অপছন্দনীয়। [কিতাবুল উম]

দেখা যাচ্ছে ইমাম শাফেঈ আজান এবং ইকামত ছাড়া অন্য যে কোনো শব্দ উচ্চারণ করে ঈদের সলাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন অথচ ঐ সকল শব্দ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলার নির্দেশ দেন নি। এমন কি আজান ও ইকামত সম্পূর্ণ উচ্চারণ না করে তার কোনো অংশ উচ্চারণ করা যেমন হাইয়া আলাস্ সলাহ বলা তিনি অপছন্দ করেন নি তবে এটা পরিত্যাগ করাই উত্তম এমন মন্তব্য করেছেন। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন করেন নি। কিন্তু সম্পূর্ণ আজান ও ইকামত উচ্চারণ করা অপছন্দনীয় বলে মন্তব্য করেছেন। এর কারণ

হিসেবে তিনি নিজেই বলেছেন, ‘‘ফরজ সলাত ছাড়া অন্য কোনো সলাতে আজান ও ইকামত দেওয়া হয়েছে বলে আমরা জানি না।’’ অর্থাৎ এটা পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণেই অন্য কোনো সলাতের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়।

জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত আছে,

أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ،

ঈদুল ফিতরের সলাতে ইমাম বের হওয়ার আগে বা পরে আজান ইকামত বা অন্য কোনো ভাবে আহ্বান করার বিধান নেই (রাসুলুল্লাহ ﷺ এসব করতে নির্দেশ দেন নি)। [সহিহ মুসলিম]

সুতরাং কেবল আজান বা ইকামত নয় বরং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময় ঈদের সলাতে কোনো শব্দ উচ্চারণ করেই মানুষকে ডাকাডাকি করা হয়নি। কিন্তু বহু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম কেবল আজান ও ইকামতের ব্যাপারটি অপছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে মত দিয়েছেন আর অন্যান্য শব্দ প্রয়োগ করে মানুষকে আহ্বান করা অপছন্দ করেন নি। কারণ আজান ও ইকামতের ব্যাপারটি পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য অন্যান্য শব্দগুলো তেমন নয়।

এর মাধ্যমে আমরা উপরে যা বলেছি তাই প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোনো বিষয় রাসুলুল্লাহ ﷺ পরিত্যাগ করলেই তা নিন্দনীয়

প্রমাণিত হবে এমন নয় বরং দেখতে হবে শারয়ী দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ তা পরিত্যাগ করেছেন কিনা।

অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে,

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْه

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রসাব করছিলেন। এমন অবস্থায় একজন ব্যক্তি তাকে সালাম দিলে তিনি তার জবাব দেন নি। [আবু দাউদ]

এখানে সালামের জবাব না দেওয়ার মাধ্যমে বিষয়টি নিন্দনীয় প্রমাণিত হয় কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়া অপছন্দ করেছেন বলেই তা পরিত্যাগ করেছেন। এটিও তারকী সুন্নাতের একটি উদাহরণ।

* তারকী সুন্নাতের বিধান কি?

উপরে আল্লাহর রাসুলের কার্যাবলী কখন সুন্নাতে পরিণত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইবাদত হিসেবে যেসব কাজ করেন সেগুলো সুন্নাত হিসেবে গণ্য। একইভাবে যখন বোঝা যায় রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো কিছু অপছন্দ করার কারণে পরিত্যাগ করেছেন তখন উক্ত কাজটি পরিত্যাগ করা সুন্নাতে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহর রাসুলের সুন্নাতের বিধান কি? সুন্নাতের অনুসরণ করা কি

ফরজ? সুন্নাতের বিপরীত আমল করা কি হারাম বা নিষিদ্ধ? এ সম্পর্কে আলোচনা করা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্তমানে কিছু লোক বলে, অমুক কাজ রাসুলুল্লাহ ﷺ করেন নি অতএব তা বিদয়াত। তারা বিদয়াতকে সর্বাবস্থায় হারাম মনে করে থাকে। এর অর্থ হলো আল্লাহর রাসুল যা কিছু করেন নি তারা সেটা হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করে। এভাবে তারা দুটি দৃষ্টিকোন থেকে ভুল করে। প্রথমতঃ আল্লাহর রাসূল যা কিছু করেন নি তারা তা নিন্দনীয় বিদয়াত মনে করে অথচ আমরা পূর্বে দেখেছি আল্লাহর রাসুল যা কিছু করেন নি তার সব নিন্দনীয় নয় বরং তার মধ্যে কিছু বৈধ এবং উত্তম কাজও রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তারা আল্লাহর রাসূলের কার্যাবলীকে অনুসরণ করা ফরজ মনে করে এবং তার সুন্নাতের বিপরীত আমল করা হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করে। অথচ এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, আল্লাহর রাসূল যে কাজের আদেশ করেন নি তবে তিনি নিজে তার উপর আমল করেছেন বিশেষ শর্তের আলোকে যদি তা সুন্নাত হিসেবে গণ্য হয় তবু তা ফরজ প্রমাণিত হয় না এবং এর বিপরীত আমল করা নিষিদ্ধ বা হারাম প্রমাণিত হয় না। বরং এটা যে করে সে সওয়াব পায় আর যে পরিত্যাগ করে সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় কিন্তু তার কোনো পাপ হয় না। তবে যে ব্যক্তি রাসূলের সুন্নাতকে অবজ্ঞা করে তার পাপ হয়। একইভাবে আল্লাহর রাসূল যা কিছু পরিত্যাগ করেন যদি চিন্তা-গবেষণার পর দেখা যায় আসলে

তিনি অপছন্দ করার কারণেই তা পরিত্যাগ করেছেন তবে সেটা পরিত্যাগ করা সুন্নাত বলে গণ্য হবে এবং পরিত্যাগ করলে সওয়াব হবে। যদি এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না পাওয়া যায় তবে কেউ এর বিপরীতে আমল করলে এবং উক্ত কাজে লিপ্ত হলে তা হারাম বা পাপের কাজ হিসেবে গণ্য হবে না বরং মাকরূহ বা অপছন্দনীয় হবে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল ওলামায়ে কিরাম এ ব্যপারে একমত।

এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো, তিন জন ব্যক্তির ঘটনা যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমল সম্পর্কে খোঁজ খবর করার জন্য মদীনায় আসে। সব শুনে তাদের নিকট আল্লাহর রাসূলের আমল কম বলে মনে হয়। তারা বলে, ‘‘আল্লাহর রাসুলের তো আগে-পিছের সব গোনা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে অতএব, তার খুব বেশি আমল না করলেও চলে কিন্তু আমাদের জন্য এটা যথেষ্ট হবে না।’’ এরপর তারা বেশি-বেশি আমল করার সংকল্প প্রকাশ করে। একজন বলে, আমি সারারাত নফল সলাত আদায় করবো, রাত্রে ঘুমাবো না। অন্য আরেকজন বলে, আমি সারা বছর সওম পালন করবো, কখনও সওম পরিত্যাগ করবো না। আরেকজন বলে, আমি কখনও বিবাহ করবো না। রাসুলুল্লাহ ﷺ এসব শুনে রাগান্বিত হয়ে বলেন,

أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

শুনে নাও আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি আল্লাহকে ভয় করি। এরপরও আমি কিছু দিন সওম পালন করি কিছু দিন সওম পরিত্যাগ করি, রাতের কিছু অংশ সলাত আদায় করি আর কিছু অংশ নিদ্রা যায় এবং আমি বিবাহ করি। যে কেউ আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার কেউ না।

[বুখারী ও মুসলিম]

“তারকী সুন্নাত” এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই হাদীসটি সর্বাধিক বেশি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যারা হাদিসটি উল্লেখ করে তাদের বেশিরভাগই এটার মূল ভাবের উপর চিন্তা-গবেষণা করে বলে মনে হয় না। এখানে প্রথমেই লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হলো, এই সকল ব্যক্তিরা আল্লাহর রাসুলের আমলকে কম মনে করেছিল এবং এত কম আমল রাসুলুল্লাহর জন্য যথেষ্ট হলেও অন্যান্য মানুষের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিল। সন্দেহ নেই যে, এটি একট ভ্রান্ত ধারণা তাছাড়া এটা আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা বলে গণ্য। তাই আল্লাহর রাসূল ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন এবং সতর্কবার্তা উল্লেখ করেছেন। সাধারনভাবে যদি কেউ আল্লাহর রাসূল ﷺ যতটুকু আমল করেন সেটাকে যথেষ্ট ও উত্তম মনে করার পরও কিছু বেশি আমল করে তবে তার ব্যাপারে এই সতর্কবার্তা প্রযোজ্য নয়। একারণে পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই পাঁচ দিন ছাড়া সারা বছর রোজা রেখেছেন বলে বর্ণিত আছে।

আল্লাহর রাসূল তিন দিনের কমে কুরআন খতম দেন নি এমন প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরামের অনেকে এক দিনে কুরআন খতম দিয়েছেন এবং পরবর্তী নেককার ব্যক্তিদের অনেকে দিনের মধ্যে আট বার কুরআন খতম দিয়েছেন বলে বর্ণিত আছে। বহু সংখ্যক নেককার ব্যক্তি সারারাত নফল সলাত আদায় করতেন বলে বর্ণিত আছে। এ সম্পর্কে কিছু কথা পূর্বে গত হয়েছে। এভাবে বেশি বেশি আমল করা কেউ পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য করেছেন বলে আমরা জানি না। উপরোক্ত হাদীসে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে,

(১) সারা বছর সওম পালন করা।

(২) সারা রাত নফল সলাত আদায় করা।

(৩) বিবাহ পরিত্যাগ করা।

এই তিনটি বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মতামত বিশ্লেষণ করলে আমরা উপরে যা কিছু বলেছি তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে।

নিষিদ্ধ দিন ব্যতিত সারা বছর রোজা রাখা সম্পর্কে ইমাম নাব্বী ﵀ আল মাজমুতে উল্লেখ করেন, যদি কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তবে এটা অপছন্দনীয় নয়। এটাই বেশিরভাগ আলেমের মত। তবে কেউ কেউ এটাকে মাকরুহ বলেছেন। দেখা যাচ্ছে বিষয়টিকে কেউ হারাম বা নিষিদ্ধ বলেন নি।

সারা রাত সলাত আদায় করা সম্পর্কে ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন, বেশিরভাগ আলেমের মতে সারারাত সলাত আদায় করা মাকরুহ, তবে কেউ কেউ বলেছেন এতে কোনো সমস্যা নেই। তিনি ইমাম মালিক ﵀ থেকে বর্ণনা করেন, তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যদি ফজরের সলাত ফওত হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা না থাকে তবে আমি এতে কোনো সমস্যা মনে করি না। [শারহে মুসলিম] ইবনে হাযার আসক্কালানী ﵀ ইমাম শাফেঈ ﵀ থেকে একই মত বর্ণনা করেছেন। [ফাতহুল বারী]

বিবাহ সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো যার ব্যাপারে জিনাতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে তার উপর বিবাহ করা আবশ্যক। আর যার ব্যাপারে এমন আশঙ্কা নেই তার জন্য বিবাহ করা উত্তম তবে ফরজ নয়। [আল-মুগনী, ইবনে কুদামা]

দেখা যাচ্ছে হাদিসে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের একটিকেও ওলামায়ে কিরাম আবশ্যক হিসেবে গ্রহণ করেন নি। বরং তাদের মধ্যে একটি অংশ এই সকল বিষয়ের ক্ষতিকর দিকটি চিন্তা করে এগুলোকে মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় বলেছেন আর অন্য একটি অংশ এগুলোকে সাধারনভাবে বৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, এই সকল কাজ শরীয়তের মানদন্ডে অপছন্দনীয় হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে নিজের উপর মাত্রাতিরিক্ত ইবাদত চাপিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই মূলত তার মধ্যে গণ্য। সুতরাং এমন মনে করার সুযোগ আছে যে, রাসুলূল্লাহ ﷺ এগুলোকে অপছন্দ করার কারণেই পরিত্যাগ করেছেন। একারণে আলেমদের একটি অংশ এসব বিষয়কে তারকী সুন্নাত হিসেবে গণ্য করে মাকরুহ বলেছেন। আরেকটি অংশ মনে করেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মতের উপর সহজ করার জন্য এসব বিষয় পরিত্যাগ করেছেন। অপছন্দনীয় মনে করার কারণে নয়। একারণে তারা এসব বিষয়কে বৈধ বলেছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কোনো কিছু তারকী সুন্নাতের মধ্যে গণ্য হলেই তা হারাম প্রমাণিত হয় না বরং মাকরুহ প্রমাণিত হয়।

ঈদের সলাতে আজান ও ইকামত দেওয়ার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। এটা বিদয়াত হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন। ইবনে রজব আল হাম্বালী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة

আলেমরা একমত হয়েছেন যে, ঈদের সলাতে আজান ও ইকামত দেওয়া বিদয়াত। [ফাতহুল বারী]

অর্থাৎ সকল ওলামায়ে কিরাম ঈদের সলাতে আজান ও ইকামত দেওয়া বিদয়াত বলেছেন, কিন্তু তারা কেউই এটাকে হারাম বলেন নি বরং মাকরুহ বলেছেন। ইমাম শাফেঈ থেকে আমরা উপরে বর্ণনা করেছি তিনি বলেছেন, যদি কেউ ঈদের সলাতে আজান দেয় তবে আমি এটা অপছন্দ করি। ইবনে রজব আল হাম্বালী ঈদের সলাত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, (والإقامة مكروهة لهذه الصَّلاة) এই সলাতে ইকামত দেওয়া মাকরুহ। [ফাতহুল বারী]

প্রসাব-পায়খানার সময় সালাম দেওয়া বা অন্য কোনো যিকির উচ্চারণ করার ব্যাপারে ইমাম নাব্বী ﵀ আল মাজমুতে অনুরূপ বিধান উল্লেখ করেছেন। তিনি বিষয়টিকে মাকরুহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, হারাম নয়। ইবনে কুদামা ﵀ আল মুগনীতে একই কথা বলেছেন। ইমাম নাব্বী স্পষ্ট করে বলেছেন, (كراهة تنزيه لا تحريم) এটা মাকরুহে তানযিহী, মাকরুহে তাহরীমী নয়। অর্থাৎ এতে লিপ্ত হলে পাপ হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

মোট কথা রাসুললুল্লাহ ﷺ যদি কোনো কাজ অপছন্দ করে পরিত্যাগ করেন কিন্তু তা থেকে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ না করেন এবং সেটা নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য কোনো কারণ না পাওয়া যায় তবে এটা পরিত্যাগ করা সুন্নাত হিসেবে গণ্য ফরজ বা ওয়াজিব নয়। তাই এর বিপরীতে আমল করলে তা বিদয়াত হিসেবে

আখ্যায়িত হবে। তবে বিষয়টি হারাম (حرام) বা নিষিদ্ধ নয় বরং মাকরুহ (مكروه) বা অপছন্দনীয় হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ এতে লিপ্ত হলে পাপ হবে না তবে এটা পরিত্যাগ করাই উত্তম।

সাদ্দে জারিয়া’ (سد الذريعة) তথা অবৈধ কাজের পথ বন্ধ করার জন্য বৈধ ও উত্তম বিষয়ও পরিত্যাগ করা।

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে আর তা হলো, পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীন বিদয়াতকে ঘৃণা করা এবং বিদয়াত হতে মানুষকে নিষেধ করার ব্যাপারে অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তারা অনেক সময় এমন অনেক বিষয় থেকে মানুষকে নিষেধ করতেন যা মূলত বৈধ বা উত্তম কিন্তু এমন আশঙ্কা রয়েছে যে, তাতে লিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাস পরিবর্তীত হয়ে বিদয়াত সৃষ্টি হবে বা অন্য কোনো অনিষ্ট হবে। উপরে আমরা এ ধরণের কিছু উদাহরণ পেশ করেছি। আবু মুসা আল-আশয়ারী رضي الله عنه সলাতের মধ্যে একজন ব্যক্তি কিছু উত্তম কথা উচ্চারণ করলে তাকে তিরষ্কার করার ঘটনা, আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল رضي الله عنه ও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه নিজ নিজ সন্তানকে দোয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা ইত্যাদি ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীযুগের ওলামায়ে কিরাম

থেকেও এধরণের বর্ণনা রয়েছে। মালেকী মাজহাবের আলেম আবু বকর আত-তুরতুশী তার 'হাওয়াদিস ওয়াল বিদা' নামক গ্রন্থে এধরণের বহু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত আছে তিনি কুরআন খতমের পর দোয়া করা অপছন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি কাউকে এমন করতে দেখি নি। সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব ও হাসান থেকে বর্ণিত আছে, তারা তারাবী বা অন্য কোনো সলাতে সরাসরি মুসহাফ (কুরআন) দেখে দেখে তেলোয়াত করা অপছন্দ করেছেন। পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে, তারা মসজিদে বসে যারা ওয়াজ-নসীহত করতো তাদের তিরষ্কার করতেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঐ সকল ব্যক্তিরা ওয়াজ নসীহতে মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করতো বিধায় ওলামায়ে কিরাম তাদের নিষেধ করেছেন কিন্তু কিছু লোক এই সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা না করেই কেবল মূল ঘটনাটি বর্ণনা করে মসজিদে বসে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাহিনী বর্ণনা করা বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করে। ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, তিনি কিছু লোককে মসজিদে যিকির করতে দেখে রাগান্বিত হয়ে তাদের বের করে দেন। আমরা দেখেছি ঐ সকল লোকেরা আসলে মুসলিমদের সমাজ পরিত্যাগ করে নির্জনতা অবলম্বনের কারণে ইবনে মাসউদ رضي الله عنه তাদের তিরষ্কার করেছেন। কেবল মসজিদে বসে আল্লাহর নাম স্মরণ করার কারণে নয়। কিন্তু

কিছু লোক এই ঘটনাকে মসজিদে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কিছু লোকের অভ্যাস হলো, সাহাবায়ে কিরাম ও ওলামায়ে দ্বীনের কিছু কিছু বক্তব্য বাছাই করে উপস্থাপণ করা। উক্ত বিষয়ে বর্ণিত দলিল প্রমাণ ও অন্যান্য ওলামায়ে দ্বীনের মতামত উল্লেখ না করে কেবল পছন্দমত মতটি উল্লেখ করে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য ওলামায়ে দ্বীন থেকে এ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত আছে আমরা পূর্বে সেসবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আমরা বলেছি, কোনো একজন সাহাবী অনেক সময় আল্লাহর রাসুলের কোনো হাদীস না জানার কারণে বা অন্য কোনো কারণে কোনো বিষয়ে অধিক কঠোরতা করতে পারেন। যেমন, উমর رضي الله عنه তামাত্তু হজ্জ এবং গোসল ফরজ হলে পানি না পেলেও তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। আবু যর رضي الله عنه যাকাতের মাসয়ালাতে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه মুতয়া বিবাহ বৈধ মনে করতেন। উসমান رضي الله عنه যখন পবিত্র কুরআন একটি কিরাতের উপর একত্রিত করেন আর বাকী কিরাতগুলো মুছে ফেলেন তখন সকল সাহাবায়ে কিরাম তার সাথে একমত হলেও ইবনে মাসউদ رضي الله عنه তার বিরোধিতা করেন। কুরআনে নুকতা ও যের-

যবর সংযুক্ত করা এবং সূরার নাম লেখার ব্যাপারে ইবনে মাসউদ ও তার অনুসারী বেশ কিছু তাবেঈ থেকে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। আমরা পূর্বে এটা উল্লেখ করেছি। এই সকল বর্ণনা যদি একপেশে ভাবে উপস্থাপণ করা হয় তবে এমন অনেক বিষয়কে বিদয়াত ও গোমরাহী প্রমাণ করা যায় যেগুলো উত্তম ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে পরবর্তীতে ওলামায়ে দ্বীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সুতরাং কোনো একজন বা কয়েকজন আলেমের মতামত উল্লেখ করে এবং বাকী ওলামায়ে দ্বীনের মতামত পরিত্যাগ করে আলোচনা করা হলে তার মাধ্যমে সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। বরং উভয়পক্ষের মতামত ও তাদের দলিল প্রমাণ উল্লেখপূর্বক কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত কি সেটা নির্ধারণের চেষ্টা কারাই সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার একমাত্র রাস্তা। এই গ্রন্থে আমাদের উদ্দেশ্যও সেটা। এখানে আমরা উভয় পক্ষের মতামত বর্ণনা করেছি। এবং দলিল প্রমাণের আলোকে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছি। পূর্বে আমরা সমন্বয়ের দুটি পদ্ধতির কথা বলেছি,

১. নতুন সৃষ্ট যেসব বিষয় সম্পর্কে কোনো সাহাবী বা তাবেঈ কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন বলে বর্ণিত আছে উক্ত বিষয়ে রাসুলুল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি বিদ্যমান থাকার ব্যাপারটি হয়তো তিনি জানতেন না। একারণে তিনি বিষয়টিকে অপছন্দ করেছেন।

২. আমরা পূর্বে বলেছি যেসব বিষয় আল্লাহর রাসুল অপছন্দনীয় মনে করে পরিত্যাগ করেছেন সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হিসেবে গণ্য এবং তার বিরোধিতা করা অপছন্দনীয়। আর যেসব বিষয় তিনি অভ্যাসগতভাবে বা অন্য কোনো কারণে পরিত্যাগ করেছেন সেগুলো আসলে সুন্নাত নয়। আর যদি এগুলোকে সুন্নাত নামকরণ করা হয় তবু সেটা পূর্বের প্রকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ফলে এগুলোর বিপরীতে আমল করা নিন্দনীয় নয়। তবে সাধারন অবস্থায় রাসুলের আমলের সাথে হুবহু মিল রেখে চলা প্রশংসার যোগ্য। একারণে কিছু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম এসব ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের আমলের সাথে হুবহু মিল রেখে চলার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। অতএব, এসব বিষয়ে তাদের নিষেধাজ্ঞা নিরুৎসাহিত করার অর্থে, নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় প্রমাণ করার জন্য নয়।

এ দুটি ব্যাখ্যার বাইরে এই সব ঘটনার আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। ওলামায়ে কিরাম অনেক সময় কোনো অবৈধ কাজের পথ বন্ধ করার জন্য এমন কি বৈধ ও উত্তম কাজও পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিতেন। উসুলের পরিভাষায় এই বিষয়টিকে বলা হয় সাদ্দে জারিয়া' (سد الذريعة) তথা ‘‘অবৈধ ও অনিষ্ট কাজের পথ বন্ধ করা’’। অর্থাৎ ওলামায়ে দ্বীন এমন অনেক বিষয় থেকে মানুষকে নিষেধ করতেন যেগুলো আসলে বৈধ বা উত্তম কিন্তু

তাতে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দিলে মানুষ আস্তে আস্তে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উদাহরণস্বরুপ, সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ গোসল ফরজ অবস্থায় পানি না পেলেও তায়াম্মুম করার অনুমতি না দেওয়ার মত ব্যক্ত করলে আবু মুসা আল-আশয়ারী ﵁ তাকে আল্লাহর কিতাবের ঐ আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেন যেখানে স্ত্রী সহবাসের পর পানি না পেলে তায়াম্মুম করার বিধান বর্ণিত আছে। ইবনে মাসউদ ﵁ এবার যুক্তি দেখিয়ে বলেন,

لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ

যদি আমরা মানুষকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দিই তবে আশঙ্কা রয়েছে যে, তারা পানি একটু ঠান্ডা হলেই গোসল না করে তায়াম্মুম করবে। [সহীহ বুখারী]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল সফরে চার রাকাত সলাত দু'রাকাত আদায় করা। হজ্জের সময়ও তিনি তাই করেছেন। উসমান ﵁ এর খেলাফতকালে তিনি হজ্জে গমণ করে কসরের সলাত দু'রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত পড়েন। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি এটা করেছিলেন যাতে দূর-দূরান্ত থেকে আগত মানুষ এমন মনে না করে যে আসলেই জোহর, আসর বা ঈশার ফরজ সলাত আসলেই দুই রাকাত। এমনও বর্ণিত আছে যে, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি উসমান ﵁ কে

হজ্জের সময় কসরের সলাত পড়তে দেখে বাড়ি ফিরে সারা বছর চার রাকাত বিশিষ্ট সলাত দু'রাকাত সলাত আদায় করে। পরে এটা শুনে উসমান ﵁ সফরে দু রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত সলাত আদায় করতেন।

বেশ কিছু সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতি বছর নিজে নিয়মিত কুরবানী করেছেন এবং অন্যদের কুরবানী করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস, আবু মাসউদ এবং অন্যান্য বেশ কিছু সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে তারা সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী দেননি যাতে মানুষ কুরবানী দেওয়া ফরজ মনে না করে।

ইমাম মালিক ﵀ তার মুয়াত্তাতে বর্ণনা করেন, উমর ﵁ একবার রাত্রে স্বপ্নদোষ হলে তিনি গোসল করে এবং নিজের পরিধেয় কাপড়টি পরিবর্তন না করে সেটির যেখানে কিছু লেগেছে বলে মনে হয় সেখানে ধুয়ে নেন আর অন্য স্থানে পানি ছিটিয়ে দেন। আমর ইবনুল আস তাকে বললেন, আমাদের নিকট তো নতুন কাপড় রয়েছে আপনি ঐ কাপড়টি পরিবর্তন করে নেন। উমর ﵁ বলেন, আমি এমন করলে মানুষ ভাববে এমন করা জরুরী।

এধরণের অনেক ঘটনা রয়েছে যা সুবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এসব ঘটনা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের

পরবর্তী ওলামায়ে দ্বীন অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় অনেক সময় বৈধ বা উত্তম কাজও পরিহার করে চলতেন।

আব্দুর রহমান আল-জাওজী ﷀ বলেন,

فان ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا

যদি কেউ এমন কোনো বিদয়াত তৈরী করে যা শরীয়তের বিপরীত নয়, পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীনের বেশিরভাগ এমন বিষয়কেও অপছন্দ করতেন। তারা প্রতিটি বিদয়াত (নতুন সৃষ্ট বিষয়) পরিত্যাগ করতেন যদিও সেটা বৈধ হয়। [তালবিসু ইবলিস]

সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের পরবর্তী ওলামায়ে দ্বীনের কর্মপন্থার উপর গবেষণা করলে এ কথার সত্যতা পাওয়া যায়। দেখা যায় তারা এমন অনেক বিষয় হতে মানুষকে নিষেধ করেছেন যা আসলে বৈধ বা উত্তম। এর মাধ্যমে তারা অন্য কোনো অবৈধ বিষয়ের পথ বন্ধ করতে চেয়েছেন। এই বিষয়ে সঠিক ধারনা না থাকার কারণে বর্তমানে দ্বিমুখি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

একঃ কিছু লোক শরীয়তের মানদন্ডে বৈধ বা উত্তম প্রমাণিত হলেই কোনো বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে বলে মনে করে। এ ব্যাপারে তারা কোনোরূপ সতর্কতা অবলম্বনের

চেষ্টা করে না। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় বৈধ বা উত্তম কাজ পরিত্যাগ করাই সমীচীন তারা এ মুলনীতিটি সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা অনেক সময় কোনো একটি বিষয়কে অতিরিক্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে। এর ফলে অনেক সময় ঐ বিষয়ে সাধারন মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়ে বিদয়াত সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরুপ, আমাদের দেশের সাধারন মানুষ দরুদে হাজারী, দরুদে লাখী ইত্যাদি নামের বহু সংখ্যক স্বরচিত দরুদ অত্যাধিক গুরুত্বের সাথে পাঠ করে থাকে। অনেক সময় এসব দরুদের ব্যাপারে মিথ্যা ফজিলত বর্ণনা করা হয়। ফলে সাধারন মানুষ দরুদে ইব্রাহীমী অপেক্ষা এসব দরুদকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। সন্দেহ নেই যে, যে কোনো উত্তম ভাষায় আল্লাহর রাসুলের উপর দরুদ পাঠ করা বৈধ। তবে এসব দরুদের ব্যাপারে মিথ্যা ফজিলত বর্ণনা করা বা এগুলোকে হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত দরুদ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা নিশ্চয় বিদয়াত। তাছাড়া এধরণের দোয়া-দরুদ রচনা করার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হলে এসবের ভিড়ে হাদীসে বর্ণিত দরুদ চাপা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে বরেণ্য ওলামায়ে দ্বীন নিজের ভাষায় দোয়া-দরুদ পাঠ করার বৈধতা স্বীকার করার পরও যতদূর সম্ভব এগুলো এড়িয়ে চলার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন এবং যতদূর

সম্ভব হাদীসে বর্ণিত যিকির ও দোয়া বেশি বেশি উচ্চারণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন।

এভাবে একত্রিত হয়ে দোয়া-মোনাজাত ও যিকির আযকার করার ব্যাপারে শরীয়তে সাধারন অনুমতি থাকার কারণে ওলামায়ে দ্বীন এর অনুমতি দিয়েছেন। তবে এগুলোকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিনত করা বা জন-সাধারনের সামনে অত্যাধিক গুরুত্বসহকারে আদায় করার ব্যাপারটি তারা অপছন্দ করেছেন যাতে মানুষ এসব বিষয়কে ফরজ বা সুন্নাতের সমপর্যায়ের মনে না করে। ওলামায়ে দ্বীনের এই কর্মপন্থাটি আমাদের গুরুত্বসহকারে স্মরণ রাখা উচিৎ যাতে আমরা বিদয়াতের রাস্তা বন্ধ করার ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারি।

দুইঃ এর বিপরীতে কিছু লোক সাহাবায়ে কিরাম বা পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীন কোনো ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করেছেন এমন প্রমাণ থাকলেই উক্ত বিষয়টিকে স্বতন্ত্রভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করে তার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যায়। যে কেউ উক্ত কাজে লিপ্ত হলে তারা তাকে বিদয়াতী ও গোমরাহ আখ্যায়িত করে। এমনকি কাফির মুশরিক ফতোয়া দিতেও দেরি করে না। অবৈধ কাজের পথ বন্ধ করার নামে এরা অনিষ্টের পথ খুলে দেয়। এরা “অবৈধ কাজের পথ বন্ধ করা” এই মূলনীতিটির সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি

অজ্ঞ। নিচে আমরা সেসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরলাম।

১. সাদ্দে জারিয়ার ক্ষেত্রে পারিপার্শিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্ব।

এরা ভুলে যায় যে, পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীন অনেক সময় অবৈধ কিছু ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা থাকলে বৈধ ও উত্তম বিষয়কেও পরিত্যাগ করতেন। এখানে মূল বিষয়টি নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় নয় বরং বৈধ বা উত্তম। যে আশঙ্কার কারণে কাজটিকে অপছন্দ করা হচ্ছে যদি কোনো সময় তা দূর হয়ে যায় তবে আর বিষয়টিকে নিন্দা করা চলে না। উদাহরণস্বরুপ কিছু মানুষ ফরজ সলাত চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত মনে করতে পারে এই আশঙ্কায় উসমান ﵁ রাসুলুল্লাহর সুন্নাত পরিত্যাগ করে সফরে দু রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত আদায় করেন। উসমান ﵁ যেহেতু খলীফা ছিলেন এবং সকল মানুষ তার আমলকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতো আর যেহেতু সে সময় এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞানের কমতি ছিল তাই তখনকার পরিস্থিতিতে এই যুক্তিটি সঠিক ছিল। কিন্তু যার অবস্থা উসমান ﵁ এর মত নয় এবং যে সময় এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রচার প্রসার হওয়ার কারণে ফরজ সলাতের রাকাত সম্পর্কে ভুল ধার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দূরিভূত হয় তখন এ যুক্তি প্রযোজ্য নয়। এখন

যদি কেউ এই যুক্তিতে সফরে সলাত চার রাকাত আদায় করে তবে তা প্রশংসনীয় হতে পারে না। ইবনে আব্বাস ﵁ ও অন্যান্য বেশ কিছু সাহাবা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না দেওয়ার ঘটনার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। তখনকার মানুষ কল্যাণকর কাজের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট ছিল। তারা সাহাবায়ে কিরামের আমলকে ভীষণ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতো। যেহেতু সাহাবায়ে কিরামই ছিলেন আল্লাহর রাসুলের সুন্নাতের ধারক-বাহক ও ব্যাখ্যাকার। সকল সাহাবায়ে কিরাম গুরুত্বসহকারে কুরবানী আদায় করলে মানুষ ধারণা করতো কুরবানী দেওয়া ফরজ। একারণে কিছু কিছু সাহাবা ইচ্ছাকৃতভাবে কুরবানী পরিত্যাগ করেছেন। এটা তৎকালীন পরিস্থিতিতে যথাযোগ্য একটি সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ নীতি প্রয়োগ করা যাবে না। মানুষ এখন বস্তুবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। আল্লাহর বিধান পালনের পরিবর্তে যতটা সম্ভব সুযোগ সন্ধান করাই তাদের অভ্যাস। এমতাবস্থায় যদি আলেম-ওলামা ও অনুসরণীয় ব্যাক্তিরা কুরবানী পরিত্যাগ করার নীতি গ্রহণ করেন তবে মানুষ হয়তো চিরতরে ইসলামের এই বিধানটির উপর আমল করা ছেড়ে দেবে। তাই এখন সম্পূর্ণ উল্টো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এখন আলেম ওলামা ও নেককার ব্যক্তিদের উচিৎ অধিক গুরুত্বের সহিত কুরবানী আদায় করা এবং মানুষকে এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা। সুতরাং কোনো

একজন সাহাবা বা পূর্ববর্তী কোনো একজন আলেম একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো বৈধ বা উত্তম বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন অতএব ঐ বিষয়টি কিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে বা ঐ বিষয়ে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে বিদয়াতী আখ্যায়িত করে মানহানী করতে হবে এটা সঠিক পথ নয়। বরং দেখতে হবে যে ধরণের পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে বিষয়টি হতে নিষেধ করা হয়েছিল এখনও সে ধরণের পরিস্থিতি টিকে আছে কিনা।

২. অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার নিশ্চিত বা অধিক সম্ভাবনা থাকা।

কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত হতে পারে এই আশঙ্কায় বৈধ কাজও পরিত্যাগ করার ব্যাপারটি কেবল তখন প্রযোজ্য হয় যখন এ বিষয়ে নিশ্চিত বা অধিক সম্ভাবনা থাকে। দূরবর্তী সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে কোনো বৈধ বিষয় অবৈধ ঘোষণা করা হলে বেশিরভাগ জিনিসই অবৈধ হয়ে যাবে। যেহেতু দূরবর্তী সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিলে দেখা যাবে বেশিরভাগ বিষয়ই কোনো না কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা রাখে। উদাহরণস্বরুপ রাস্তায় বের হলে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে, গাছে উঠলে পড়ে যেতে পারে, মাছ খেতে গেলে গলায় কাঁটা বেঁধে মারা যেতে পারে ইত্যাদি। এই

সকল যুক্তির উপর নির্ভর করা কোনো বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা করা কখনও বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

ইবনে রিফয়া এধরণের বিষয়কে বাড়াবাড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। [বাহরে মুহীত]

এর উদাহরণে বলা যায় আঙ্গুরের রস দ্বারা মদ তৈরী করা হয় এই যুক্তিতে যদি কেউ আঙ্গুর চাষ করা বন্ধ করতে চায় তবে তা সঠিক হবে না। এ যুক্তিতে আঙ্গুরের চাষ অবৈধ ঘোষণা করা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আল-কারাফী ইজমা উল্লেখ করেছেন। [বাহরে মুহীত]

৩. অনিষ্টের পথ বন্ধ করতে যেয়ে অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকা।

অবৈধ কাজের পথ বন্ধ করার জন্য বৈধ বা উত্তম বিষয়ও পরিত্যাগ করার এই মূলনীতিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, একটি অনিষ্টের পথ বন্ধ করতে যেয়ে তার সমপর্যায়ের বা তাদাপেক্ষা বেশি ক্ষতিকর বিষয়ে লিপ্ত না হওয়া বা তার পথ খুলে না দেওয়া। যেমন, অনিষ্টের পথ বন্ধ করার নামে ফরজ ত্যাগ করা বা হারামে লিপ্ত হওয়া। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ ﷻ

মুশরিকদের উপাস্যদের নিন্দামন্দ করতে নিষেধ করেছেন যেহেতু এর ফলে তারাও মহান আল্লাহকে নিন্দা করে। এই যুক্তিতে বর্তমানে কিছু চিন্তাবিদ! বিধর্মীদের ধর্ম সম্পর্কে যে কোনো প্রকার সমালোচনা ও তাদের আক্বীদা বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করা নিষিদ্ধ এমন মন্তব্য করে। যেহেতু তাদের ধর্ম নিয়ে সমালোচনা করা হলে তারাও আমাদের ধর্ম নিয়ে সমালোচনা করবে। বর্তমানে এই যুক্তির মারাত্মক কু প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিছু লোক বিধর্মীদের শিরক-কুফর পরিত্যাগ করে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার বিষয়টিকেও অপছন্দ করতে শুরু করেছে। আল্লাহকে গালি দেওয়া হবে বা আল্লাহর দ্বীনের সমালোচনা করা হবে এই ভয়ে দ্বীনের দাওয়াত পরিত্যাগ করা হলে যে, একসময় আল্লাহর নাম ও তার দ্বীনের বিধান দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এ চিন্তা তাদের নেই। তাছাড়া ভিন্ন ধর্মের লোকদের দ্বীনের দা'ওয়াত দেওয়া ফরজ এবং কোনো যুক্তিতেই এই ফরজ দায়িত্বে অবহেলা করা যায় না এই চিন্তাও তাদের মাথায় ঢোকে না।

একইভাবে বর্তমানে কিছু লোক অনিষ্টের পথ বন্ধ করা বলতে কেবল বিদয়াতের রাস্তা বন্ধ করা বোঝে। এ বিষয়ে তারা এতটা বাড়া-বাড়ি করে যে, অনেক সময় বিদয়াতের রাস্তা বন্ধ করতে যেয়ে সাধারন মুসলিমদের মধ্যে রক্তা-রক্তি ও বিভক্তির সৃষ্টি করার মতো সুস্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। নেককার ও

ধর্ম প্রাণ মুসলিমদের বিদয়াতী, ফাসেক ইত্যাদি নিকৃষ্ট উপাধীতে আখ্যায়িত করে নিন্দা মন্দ করে। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকের কাজ আর মুসলিমদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া কাফিরের কাজ।

[মুসলিম]

এই সকল লোকেরা এ সম্পর্কে মোটেও সতর্ক নয় যে, অনিষ্টের পথ বন্ধ করা বলতে কেবল বিদয়াতের পথ বন্ধ করা বোঝায় না বরং সকল প্রকার অনিষ্টের পথ বন্ধ করা বোঝায়। যে কোনো ক্ষতিকর বিষয় এড়িয়ে চলার জন্য অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর বিষয়কে সহ্য করাকেই বলা হয় অনিষ্টের পথ বন্ধ করা। একটি সুন্নাতের উপর আমল করা বা কোনো একটি বিদয়াতের বিরোধিতা করার অজুহাতে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়াও বৈধ এমন নয় বরং ফেতনা ফাসাদ ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটানোর জন্য প্রয়োজনে কিছু সময়ের জন্য কোনো একটি সুন্নাত পরিত্যাগ করাও অনিষ্টের পথ বন্ধ করার মধ্যে গণ্য। একারণে উসমান রضي الله عنه কসরের সলাত দু রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত আদায় করেছেন, ইবনে আব্বাস রضي الله عنه এবং অন্যান্য কিছু সাহাবা কুরবানীর মতো গুররুত্বপূণ ইবাদত পরিত্যাগ করেছেন।

কুরাইশরা সম্পদের অভাবে কা’বা ঘরের নির্মাণে কিছু তারতম্য করেছিল আর কা’বা ঘরের দরজা করেছিল একটু উঁচুতে যাতে সাধারন মানুষ তাদের অনুমতি ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ আয়েশা رضي الله عنها কে বলেন,

وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ

যদি এমন আশঙ্কা না হতো যে তোমার সম্প্রদায় (কুরাইশরা) নও মুসলিম হওয়ার কারণে বিষয়টি অপছন্দ করবে তবে আমি কা’বা ঘরের বাইরের অংশটুকু তার সাথে জুড়ে দিতাম এবং তার দরজাটি নিচে নামিয়ে আনতাম। [বুখারী ও মুসলিম]

সুতরাং কা’বা ঘর নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাসুলুল্লাহ ﷺ সংশোধন করেন নি কেবল এই ভয়ে যে কিছু লোক সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা হয়তো কা’বা ঘর ভেঙে সংশোধন করতে দেখলে সন্দেহে পতিত হবে এবং দ্বীন ত্যাগ করে পুনরায় কাফির হয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এটা পূর্বে উল্লেখিত একটি হাদীসের সাথে পুরোপুরি সমার্থবোধক। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا

মানুষের জন্য সহজ করো তাদের উপর কঠিন করো না আর তাদের সুসংবাদ দাও তাদের দূরে সরিয়ে দিয়ো না। [বুখারী ও মুসলিম]

এটা জেনে নেওয়ার পর ঐ সকল লোকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন ভীষণ জরুরী যারা বিদয়াতের রাস্তা বন্ধ করার যুক্তিতে বৈধ ও উত্তম বিষয়াবলীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাতে লিপ্ত সাধারন মুসলিমদের বিদয়াতী ও পথভ্রষ্ট আখ্যা দিয়ে থাকে, তাদের মান-সম্মান বিনষ্ট করে। প্রয়োজনে তাদের সাথে হানা-হানি ও খুনোখুনিতে লিপ্ত হতেও পিছপা হয় না। এভাবে তারা একটি অনিষ্টের পথ বন্ধ করতে যেয়ে শত-সহস্র অনিষ্টের জন্ম দেয়। দ্বীনের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকদের চিন্তাধারা এমনটাই হয়ে থাকে। আল্লাহর নিকট এধরণের মুর্খতা থেকে আশ্রয় চাই।

৪. অবৈধ কাজের আশঙ্কায় বৈধ বা উত্তম কাজ কখন পরিত্যাগ করা যায় সে সম্পর্কে দ্বিমত।

সাধারনভাবে এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সাদ্দে জারিয়া (سد الذريعة) তথা অবৈধ কাজের আশঙ্কায় বৈধ কাজ পরিত্যাগ করা সম্পর্কিত মুলনীতিটি সকল ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। উসুলে ফিকহের গ্রন্থে সাধারনত এ বিষয়ের পক্ষে ইমাম মালিক ও মালেকী মাজহাবের ওলামায়ে কিরামের মতামত উল্লেখ করা হয় এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে দ্বিমত করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। তবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কিছু শর্ত স্বাপেক্ষে প্রায় সকল ওলামায়ে

কিরামই বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। আমরা উপরে সেসব শর্তাবলী উল্লেখ করেছি। ঐ সকল শর্তের উপর চিন্তা করলে দেখা যাবে একটি নির্দিষ্ট মাসয়ালাতে সাদ্দে জারিয়ার বিধান প্রযোজ্য হবে কিনা সেটা ব্যাপক চিন্তা-গবেষণার বিষয়। পরিবেশ পরিস্থিতি ও শরীয়তের বিধানের আলোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। একারণে ওলামায়ে কিরাম অনেক সময় নির্দিষ্ট কিছু মাসয়ালাতে এটা প্রয়োগ করার ব্যাপারে পরষ্পরের মধ্যে দ্বিমতে জড়িয়ে পড়েন। উদাহরণস্বরুপ, হাদীসে এসেছে, রমজানের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি সওম পালন করলে সারা বছর সওম পালন করার সওয়াব পাওয়া যাবে। [আবু দাউদ] কিন্তু ইমাম মালিক বলেছেন, যেহেতু রমজানের পর সওম পালন করলে মানুষ মনে করতে পারে এটা রমজানের ফরজ সওমের মতো (ফজর) তাই এটা না রাখাই উচিৎ। শাফেঈ মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে তার মতের বিরোধিতা করেছেন। তারা হাদীস অনুযায়ী শাওয়াল মাসের ছয়টি সওম পালন করাকে উত্তম মনে করেছেন।

ইমাম নাব্বী ﵀ উল্লেখ করেন, ইমাম মালিক ﵀ এ বিষয়ে বলেন,

وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه

আলেমরা এটা (রমজানের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি সওম পালন করা) অপছন্দ করতেন এবং এটা বিদয়াত হবে এমন আশঙ্কা করতেন। তারা আশঙ্কা করতেন হয়তো অজ্ঞ লোকেরা এটাকে রমাজনের সওমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত মনে করবে (ফরজ মনে করবে)।

ইমাম নাব্বী ﷺ এই কথার উপর আপত্তি করে বলেন,

وقولهم لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف لأنه لا يخفى ذلك على أحد ويلزم على قوله إنه يكره صوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه وهذا لا يقوله أحد

তারা যে বলেছেন, হয়তো কিছু লোক না জানার কারণে এটাকে রমাজানের সওমের মতো আবশ্যক মনে করবে এটা দূর্বল যুক্তি, কেননা এটা (রমজানের সওম ছাড়া অন্য কোনো সওম যে ফরজ নয় এই ব্যাপারটা) কারো অজানা নয়। তাছাড়া এভাবে বললে তো আরাফার দিন বা আশুরার দিন সওম পালন করা এবং অন্যান্য দিনে নফল সওম পালন করাও মাকরুহ হয়ে যায় (যেহেতু সেক্ষেত্রেও এমন আশঙ্কা রয়েছে যে কেউ না কেউ এটাকে ফরজ মনে করতে পারে)। কিন্তু এ কথা কেউ বলতে পারে না।

[শারহে মুহাজ্জাব]

ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত আছে তিনি মসজিদে ফরজ সলাতের পর বা কোনো মজলিসে সম্মিলিত মোনাজাত করা অপছন্দ

করেছেন কারণ এর মাধ্যমে যিনি দোয়া করছেন তার অন্তরে কিছু অহংকার সৃষ্টি হতে পারে। [আল-হাওয়াদিস ওয়াল বিদা]

মালেকী মাজহাবের অন্য কিছু আলেম এ ব্যাপারটির বৈধতার পক্ষে মত দিয়ছেন। তারা বলেছেন,

بل الغالب علي من ينصب نفسه لذلك التواضع والرقة فلا يهمل أمره بل يفعل

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যিনি দোয়া করেন তার মধ্যে অহংকার নয় বরং বিনয় প্রকাশ পায় সুতরাং দোয়া করা পরিত্যাগ করবে না বরং দোয়া করবে। [আল-ফাওয়াকিহ আদ্ দাওয়ানি]

দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে ক্ষতির আশঙ্কা আছে কিনা এবং তার পথ বন্ধ করার জন্য বিষয়টি পরিত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে সম্পর্কে দুজন আলেমের মত দুরকম হতে পারে। তাদের একজন অন্য জনকে তিরষ্কার করতে পারবে না। একজন আরকজনকে বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারবে না। এটা ইজতিহাদী তথা গবেষণামূলক বিষয়। এর উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা মারাত্মক অপরাধ।

৫. অবৈধ কাজের আশঙ্কায় বৈধ কাজ পরিত্যাগ করার বিধান।

এখানে যে বিষয়টি অত্যাধিক গুরুত্বসহকারে স্মরণ রাখা প্রয়োজন তা হলো, কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কার কারণে বৈধ কাজ পরিত্যাগ করা সম্পর্কে যে মূলনীতিটি রয়েছে তার উপর নির্ভর করে কোনো বিষয়কে হারাম বা নিষিদ্ধ প্রমাণ করা যায় না। বরং বিষয়টি হতে মানুষকে অনুৎসাহিত করা যায়। অন্য কোথায় বিষয়টিকে মাকরুহ বলা যায়। এ বিষয়ে প্রমাণ হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী,

الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

হালাল স্পষ্ট, হারাম স্পষ্ট আর এর মাঝে রয়েছে কিছু অস্পষ্ট বিষয়। এসব বিষয়ে বেশিরভাগ মানুষ জানে না। যে কেউ এসব বিষয় পরিত্যাগ করে তার দ্বীন ও দুনিয়া নিরাপদ হয়ে যায় আর যে অস্পষ্ট বিষয়সমূহে লিপ্ত হয় সে ঐ রাখালের মতো যে নিষিদ্ধ এলাকার আশেপাশে পশু চরায়। এমন আশঙ্কা রয়েছে যে, সে হয়তো নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়বে। [বুখারী]

এখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ অস্পষ্ট বিষয়কে সরাসরি হারাম বলেন নি। বরং অস্পষ্ট বিষয়ে লিপ্ত হলে হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাই অস্পষ্ট বিষয় পরিত্যাগ করাই উত্তম এমন

বলেছেন। এটা প্রমাণ করে, অস্পষ্ট বিষয়ে লিপ্ত হওয়া সরাসরি হারাম নয় তবে অপছন্দনীয় বা মাকরুহ।

ইবনে হাযার আসক্কালানী ﵀ বলেন,

واختلف في حكم الشبهات فقيل التحريم وهو مردود وقيل الكراهة وقيل الوقف

অস্পষ্ট বিষয় সমূহের বিধান কি সে বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে কেউ কেউ বলেছেন এটা হারাম। এই মতটি পরিত্যক্ত। কেউ বলেছেন এটা মাকরুহ (অপছন্দনীয়) কেউ কেউ এ ব্যাপারে নিরাবতা অবলম্বন করেছেন। [ফাতহুল বারী]

এ বিষয়ে ইবনে হিযাম ﵀ আলইহকাম ফি উসুলিল আহাকাম নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ করেছেন, হারামের দিকে যেতে পারে এমন কাজে লিপ্ত হওয়া হারাম বলা যায় না তবে সাধারন লোকদের এ থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়।

এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক সময় শরীয়তে কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের পথ বন্ধ করার জন্য অন্য কিছু বিষয়কে হারাম করা হয়েছে। যেমন জেনার পথ বন্ধ করার জন্য মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া বা কোনো মেয়ের সাথে নির্জনে অবস্থান করা শরীয়তে হারাম করা হয়েছে। অতএব, এসব বিষয় এখন হারাম বলেই গণ্য হবে। যেহেতু এগুলো কেবলমাত্র জেনার দিকে নিয়ে যায় একারণে হারাম নয় বরং শরীয়তে

এগুলোর ব্যাপারে পৃথক নিষেধাজ্ঞা আছে তাই হারাম। এর সুস্পষ্ট দলীল হলো মেয়েদের মুখ খোলা রেখে চলা-ফেরা করার কারণে অনেক সময় জেনাতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একারণে বিষয়টিকে মাকরুহ বলা যেতে পারে তবে হারাম বলা সঠিক নয়। যেহেতু শরীয়তে মুখ খুলে চলা-ফেরা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে যদি কোনো বিবাহিত পুরুষের স্ত্রী যথেষ্ট সুন্দর হয় এবং সে এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত থাকে যে অন্য কোনো মহিলার দিকে দৃষ্টি দিলে সে জিনাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে না। তার ক্ষেত্রেও অন্য মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হারাম হবে। যেহেতু সেটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

একইভাবে যেসব বিষয়ে লিপ্ত হলে নিশ্চিত ভাবে হারামে লিপ্ত হতে হয়, সজ্ঞানে সেগুলোতে লিপ্ত হওয়াও হারাম। যেহেতু এর অর্থ হলো হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আর হারাম কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও হারাম। কিন্তু যেসব বিষয় সরাসরি শরীয়তের দলীল প্রমাণে হারাম প্রমাণিত নয় আবার সেগুলোতে লিপ্ত হলে নিশ্চিতভাবে হারাম কাজে লিপ্ত হতে হয় এমনও নয় তবে তাতে লিপ্ত হলে হারামে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব বিষয়কে নিশ্চিতভাবে হারাম বলা যায় না। তবে ক্ষেত্রবিশেষে সেসব বিষয়কে মাকরুহ বলা যায়।

উপরে আমরা যা কিছু বলেছি তার উপর গুরুত্বসহকারে চিন্তা করলে ঐ সকল লোকদের কার্যকলাপের অসারতা প্রমাণিত হবে যারা দোয়া-মোনাজাত, মিলাদ-মাহফিল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম প্রমাণিত হওয়ার পরও মানুষ এগুলোকে ফরজ বা সুন্নাত মনে করতে পারে এই আশঙ্কার কারণে এসবে লিপ্ত হওয়া হারাম হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং এসবে লিপ্ত ব্যক্তিদের ভীষণভাবে তিরষ্কার করে। তারা একদিকে যেমন শরীয়তের মুলনীতি সম্পর্কে অবগত নয় একইভাবে তারা বর্তমান যুগের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবগত নয়। চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যাবে বর্তমান যুগের মানুষ দ্বীনী কার্যক্রমের ব্যাপারে এমনিতেই নিরুৎসাহিত হয়ে রয়েছে। যেগুলো ফরজ বা সুন্নাত সেগুলো কিভাবে পরিত্যাগ করা যায় তারা এখন সেসব যুক্তি-প্রমাণ খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেটা ফরজ নয় বা সুন্নাত নয় সেটাকে ফরজ বা সুন্নাত মনে করার মতো পরিবেশ এখন আর নেই। মসজিদে মোনাজাত বন্ধ করে দিলে মানুষ সেই সময়টুকু চায়ের দোকানে অশ্লীল সিনেমা দেখে বা বেহুদা বাক্যালাপে ব্যয় করবে। রাসুলের জন্মদিনে বৈধ ভাবে আনন্দ ফুর্তি করার অনুমতি না দিলে যুবকরা ইংরেজী নববর্ষ বা ভালবাসা দিবসে আনন্দ ফূর্তি করে সেটা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই মানুষ যতটুকু ভাল কাজ করছে সেগুলোর বিরুদ্ধে না লেগে তারা যেসব ভাল কাজ পরিত্যাগ করেছে

সেগুলোর প্রচার-প্রসারে সময় লাগানোই অধিক জরুরী। এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো ভাল কাজকে মানুষ ফরজ বা সুন্নাত মনে করতে পারে এ আশঙ্কা থাকলে যেমন অনেক সময় সেটা পরিত্যাগ করা উত্তম হয়। একইভাবে কোনো অপছন্দনীয় কাজ পরিত্যাগ করলে যদি তদাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে উক্ত কাজের অনুমতি দেওয়া উচিৎ। এখানে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো স্থান নেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ উল্লেখ করেন, একজন মুসলিম বাদশা পবিত্র কুরআনের সাজ সজ্জার পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যায় করে। আহমাদ ইবনে হাম্বাল ﵀ কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب

তাকে ছেড়ে দাও। (নিষেধ করো না) সে যেসব কাজে সম্পদ ব্যয় করে তার মধ্যে এটাই উত্তম।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেন, আহমদ ইবনে হাম্বালের মত হলো, পবিত্র কুরআনের সাজ-সজ্জার নিমিত্তে অতিরিক্ত ব্যয় করা মাকরুহ। কিন্তু এই বাদশাকে যদি এটা করতে নিষেধ করা হয় তবে সে এমন জায়গায় অর্থ ব্যয় করবে যাতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।

যেমন, হয়তো অশ্লীল বই পুস্তক বা রোম পারস্যের কিচ্ছা-কাহিনীর পিছনে অর্থ ব্যায় করবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, (أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد) "কিছু ব্যক্তির জন্য এমন কাজও উত্তম হিসেবে গণ্য হয় যা নেককার মুমিনরা অপছন্দ করে থাকে।"

তিনি আরও বলেন,

كثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك ، أو الأمر به . ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة

যারা বিদয়াতের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুন্নাতের উপর আমল করা এবং মানুষকে এ ব্যাপারে আদেশ করার ব্যাপারে গাফেল। সম্ভবত তাদের বেশিরভাগের অবস্থা যারা ঐ সকল অপছন্দনীয় (বিদয়াতী) কাজে লিপ্ত তাদের চেয়ে খারাপ।

এসব উল্লেখ করার পর ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, (فتفطن لحقيقة هذا الدين) অতএব, এই দ্বীনের মূল তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করো। [ইক্তিদায়ে সিরাত]

মালেকী মাজহাবের প্রখ্যাত আলেম আবু বকর আত-তুরতুশী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ দামেশকের

মসজিদটি অত্যন্ত সুন্দর করে নির্মাণ করেন। রোম থেকে মুল্যবান পাথর নিয়ে এসে খুবই সুন্দরভাবে সু-সজ্জিত করেন। হাদীসে মসজিদ অত্যাধিক সাজে সজ্জিত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। আল্লাহর রাসুল ﷺ নিজেও তার মসজিদকে সজ্জিত করেন নি। তাছাড়া অত্যাধিক সুসজ্জিত মসজিদে সলাত আদায়ে মনোনিবেশ করা দূরহ হয়ে পড়ে। একারণে উমর ইবনে আব্দুল আজীজ رحمه الله খলীফা হওয়ার পর দামেশকের মসজিদটির মূল্যবান পাথর সমূহ সরিয়ে নিয়ে তা বিক্রি করে সে অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। দামেশকের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা এ কাজে আপত্তি জানায়। তারা বলে মুসলিমরা এটা নির্মাণের পিছনে কত কষ্ট করেছে আর আপনি এটা নষ্ট করে ফেলবেন। এর ফলে তিনি মসজিদটি আগের অবস্থায়ই রেখে দেন। তবে সাজ-সজ্জার স্থানগুলো পর্দা দ্বারা ঢেকে নিতে বলেন যাতে মুসল্লীদের সলাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। পরে কিছু খৃষ্টান পাদ্রী দামেশকের মসজিদটি দেখে আফসোস করে বলে আমাদের রাজারা তো এমন উপাসনালয় নির্মাণ করে না এবং এই ধরণের আরও কিছু কথা-বার্তা বলে। এটা শুনে উমর ইবনে আব্দিল আজিজ رحمه الله বলেন,

لا أرى مسجد دمشق إلا غيظا للكفار

আমি তো দেখছি দামেশকের মসজিদ দেখে কাফিরদের অন্তর্জ্বালা হয়।

এরপর তিনি পর্দাগুলো পুড়িয়ে ফেলেন এবং মসজিদটি উম্মুক্ত করে দেন।

এসব ঘটনা প্রমাণ করে অনেক সময় অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে কোনো অপছন্দনীয় বিষয়ও উত্তম হিসেবে গণ্য হতে পারে।

সুতরাং বর্তমান অবস্থায় দোয়া-মোনাজাত বা রাসুলের জন্ম দিন পালনের মতো উত্তম বিষয় হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা এবং এর স্বপক্ষে সাদ্দে জারিয়াকে যুক্তি হিসেবর ব্যবহার করা মোটেও যৌক্তিক নয়।

তাছাড়া যদি ধরেও নিই মানুষ এসব বিষয়কে ফরজ মনে করবে বা ঈদে মীলাদুন্নাবীকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার মতো শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান মনে করবে এই আশঙ্কায় এটা থেকে দূরে থাকা উচিৎ। তবু তো এ যুক্তিতে বিষয়টি থেকে মানুষকে কেবল নিরুৎসাহিত করা যায়। এগুলো হারাম হিসেবে আখ্যায়িত করা এবং তাতে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করে লাঞ্চিত করা কিভাবে বৈধ প্রমাণিত হয়!

বিদয়াতের তিনটি মূলনীতি:

উপরোক্ত আলোচনার উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে কোনো কিছুকে বিদয়াত বলার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে তিনটি মুলনীতির অনুসরণ করা হয়।

ক) যে কোনো ব্যাপারে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে ভূল বুঝ।

অর্থাৎ কোনো ব্যাপারে শরীয়তের যে রায় তার বিপরীত রায়কে শরীয়তের রায় বলে মনে করা। উদাহরণস্বরুপ, মিসওয়াক করা সুন্নাত। যদি কেউ এটাকে ফরজ বলে তবে বিদয়াত হবে। একইভাবে মদ পান করা পাপের কাজ কিন্তু শিরক-কুফর নয়। যদি কেউ মনে করে মদ পান করলে একজন মুসলিম কাফিরে পরিনত হয়, তবে এটা বিদয়াত বলে গণ্য হবে। মোট কথা, ছোট কিংবা বড় যে কোন বিষয়ে শরীয়তের বিধানের বিপরীত বিধান শরীয়তের নামে চালানো হলে তা বিদয়াত বলে গণ্য হবে। খারেজী, মু'তাজিলা, মুরজিয়া, জাহামিয়্যা, মুজাস্সিমা ইত্যাদি ফিরকাকে বিদয়াতী বলা হয় কারণ তারা বিভিন্ন ব্যাপারে শরীয়তের বিপরীত আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিল।

খ) সুন্নাতের বিপরীতে আমল করা।

রাসুলূল্লাহ ﷺ উত্তম মনে করে যে কাজ করতেন তা সুন্নাতে পরিনত হয়। একইভাবে রাসুলূল্লাহ ﷺ অপছন্দ করে যে কাজ পরিত্যাগ করতেন তা সুন্নাতে পরিণত হয়। এ বিষয়টিকে বলা হয় তারকী সুন্নাত। উপরে আমরা এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো কিছু করলেই তা সুন্নাতে পরিনত হয় এমন নয় বরং দেখতে হবে উক্ত বিষয়টি তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে করেছেন নাকি অভ্যাসগত ভাবে করেছেন। একইভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ যে কাজ পরিত্যাগ করেছেন সর্বক্ষেত্রে তা পরিত্যাগ করতে হবে এমন নয়। যেহেতু অনেক সময় তিনি এমন বিষয় পরিত্যাগ করেন যা আসলে উত্তম। হয়তো সাধরনভাবে নির্দিষ্ট একটি সময়ে সবগুলো ভাল কাজ করে দেখানো সম্ভব নয়। একারণে অথবা উক্ত বিষয়ে আমল করলে তা সুন্নাতে পরিণত হবে এবং উম্মতের উপর সেটা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে একারণে তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন। এসকল কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ যে কাজ পরিত্যাগ করেন তাকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়তি করা যায় না। কেবল সেই ক্ষেত্রে বিদয়াত শব্দ প্রয়োগ করা যায় রাসুলুল্লাহ ﷺ যা অপছন্দ করে পরিত্যাগ করেছেন। যেমন ঈদের সলাতের আগে রাসুলুল্লাহ ﷺ আজান ও ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন নি। একারণে এটা বিদয়াত হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন। [ইবনে রজব,

ফাতহুল বারী] তবে এ বিষয়টি হারাম বা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হবে না বরং মাকরুহ বা অপছন্দনীয় হবে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় আল্লাহর রাসূল যা কিছু করেন নি তার সবই বিদয়াত এ ধারণা সঠিক নয়। বরং রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন অপছন্দ করে কোনো কাজ পরিত্যাগ করেন কেবল তখন তা বিদয়াতে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রেও বিষয়টি হারাম নয় বরং মাকরুহ হিসেব গণ্য হয়।

গ) যেসব কাজ নিজে বৈধ বা উত্তম তবে তাতে লিপ্ত হলে বিদয়াত সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে।

এমন কিছু কাজ রয়েছে যা নিজে বৈধ বা উত্তম কিন্তু তাতে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দিলে মানুষ ক্রমেই বিদয়াতের দিকে ধাবিত হবে। ওলামায়ে দ্বীন এই সকল বিষয়কেও বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। আমরা উপরে বলেছি, বিদয়াতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় বৈধ বিষয়ও পরিত্যাগ করা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের সাধারন অভ্যাস ছিল। এ থেকে আমরাও বিদয়াতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা পায়। তবে যে কেউ যে কোনো বিষয়কে বিদয়াতরে পথ হিসেবে গণ্য করে বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করতে পারে না। বরং এ বিষয়ে বেশ কিছু শর্ত মেনে চলতে হয়। সে সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। সেই সাথে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদয়াতের দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কার কারণে যেসব বিষয়কে

বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় সেগুলোকে নিষিদ্ধ বা হারাম বলা যাবে না। বরং মাকরুহ বা অপছন্দীয় বলতে হবে।

যে কেউই কোনো কিছুকে বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করতে চায় সে এই তিনটি মূলনীতির কোন একটির আলোকেই তা করে থাকে। যারা বিদয়াত সম্পর্কে উদাসীন তারা এসকল মুলনীতির কোনো একটি বা সবকটিকে উপেক্ষা করে। আর যারা বিদয়াত সম্পর্কে বাড়া-বাড়ি করে তারা এসকল মূলনীতির কোনো একটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে বিদয়াত নয় এমন কাজকেও বিদয়াত প্রমাণের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সঠিক কর্মপন্থা হলো এই সকল মূলনীতিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করা। এগুলোর কোনটিকে উপেক্ষা করা যাবে না আবার এগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে অতিরঞ্জনও করা যাবে না। এ উদ্দেশ্যে আমরা এসব বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে পাঠক এসব বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং এ বিষয়ক যে কোনো বিভ্রান্তি হতে বেঁচে থাকতে পারেন।

এখন এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিষয়ে আলোচনা করা জরুরী মনে করছি। নিচে সেসব ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

* আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক বুঝ বলতে কি বোঝায়?

উপরে আমরা বলেছি, বিদয়াত বলতে বোঝায় আল্লাহর দ্বীনের যে কোনো বিধান সম্পর্কে ভুল বুঝ। আল্লাহ ﷻ তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন বিষয় আসবে সে সবের সঠিক বিধান তিনি বর্ণনা করেছেন। কোনো ব্যাপারে আল্লাহর দ্বীনের যে বিধান তার বিপরীত কোনো বিধান আল্লাহর বিধান হিসেবে দাবী করার নামই হলো বিদয়াত। উপরের আলোচনায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা গত হয়েছে। এখন একটি প্রশ্ন এ বিষয়টির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট। আর তা হলো, ‘‘দ্বীনের সঠিক বুঝ বলতে আমরা কি বুঝবো?’’

বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু আধুনা চিন্তাবিদদের একটি বিরাট অংশ মনে করে, পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত ও গোটা কয়েক হাদীস একত্রিত করে একজন ব্যক্তির নিকট যে বিধানটি সঠিক বলে মনে হয় সেটিই দ্বীনের সঠিক বিধান। এটা সঠিক কথা নয় বরং কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত কি তা নির্ণয় করতে হলে, কুরআন-হাদীসের উপর ব্যাপক গবেষণা ও আরবী ভাষার বাচনভঙ্গীর উপর দক্ষতা থাকা একান্ত জরুরী। সেই সাথে কোনো আয়াত বা হাদীস কোন প্রেক্ষাপটের সাথে সংশ্লিষ্ট সেটিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

এর মৌলিক কারণ হলো, কুরআন ও হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়। অনেক

সময় কোনো শব্দ রুপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহ ﷻ সাহরী খাওয়ার সময় বর্ণনা করে বলেন,

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}

তোমরা খাও এবং পান করো যতক্ষণ না সাদা সুতা কালো সুতা হতে পৃথক হয়ে যায়। [বাকারা/১৮৭]

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে এই আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য অনুযায়ী কোনো কোনো সাহাবা বালিশের নিচে সাদা ও কালো রঙের দুটো সুতা রাখতেন এবং দুটো সুতাকে যতক্ষণ না আলাদাভাবে চেনা যায় ততক্ষণ সাহরী খেতেন। ফলে তারা অধিক সময় ধরে পানাহার করতেন। পরে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বলে দেন যে আসলে এখানে প্রকৃত সুতা বোঝানো হয়নি বরং আকাশের সাদা রঙ ও কালো রঙকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সুতা শব্দটি রুপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে প্রকৃত অর্থে নয়।

একইভাবে অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا}

যে কেউ কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার পুরষ্কার হলো জাহান্নাম। সে সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। [নিসা/৯৩]

অন্য একটি আয়াতে সুদ গ্রহণ করলে চিরকাল জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে। [বাকারা/২৭৫] সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বেশ কিছু হাদীসে বংশ তুলে গালি দেওয়া, বিলাপ করে কাঁদা, নিজের বাবা ছাড়া অন্য কাউকে বাবা বলে পরিচয় দেওয়া ইত্যাদি বিষয়কে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে আত্মহত্যা করলে চিরকাল জাহান্নামে শাস্তি হবে এমন বলা হয়েছে। এই সকল হাদীসের উপর নির্ভর করে খারেজীরা এই সকল কাজকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করে কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের অনুসারী নেককার ওলামায়ে দ্বীন এসব হাদীসকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তারা এখানে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন নি বরং রুপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, এ বিষয়ে খারেজীদের মত ভ্রান্ত ও বাতিল। অতএব তারা বিদয়াতী।

একটি হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (فإن الله خلق آدم علي صورته) "নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ আদমকে সৃষ্টি করেছেন তার নিজ আকৃতিতে" [সহীহ মুসলিম] এই হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করে একদল লোক দাবী করে আল্লাহ দেখতে মানুষের মতো [নাউযু বিল্লাহ]। এদের বলা হয় মুজাসসিমা (مجسمة) অর্থাৎ যারা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করে। সমস্ত ওলামায়ে কিরাম একমত যে, এই আক্বীদা ভ্রান্ত এবং এই আক্বীদার লোকেরা বিদয়াতী।

কাদরিয়ারা বলে, বান্দার ভাগ্য আগে থেকে লেখা নেই। কে কি করবে এটা আল্লাহ আগে থেকে জানেন না বরং যখন উক্ত ঘটনা ঘটে তখন জানতে পারেন [নাউযু বিল্লাহ]। তারা পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতকে নিজেদের মতের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে ব্যবহার করে। মুসলিমরা উহুদ যুদ্ধে বাহ্যত পরাজয় বরণ করলে আল্লাহ ﷻ তাদের শান্তনা দিয়ে বলেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

(উহুদের ময়দানে) যেদিন দুটি দল (মুসলিমরা ও কাফিররা) যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল সেদিন যা ঘটেছে (মুসলিমরা পরাজিত হয়েছে) তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটেছে। যাতে তিনি জেনে নিতে পারেন কে মুমিন আর কে মুনাফিক। [আলে ইমারান/১৬৬,১৬৭]

এই আয়াতের উপর নির্ভর করে তারা বলতে চায়, কে মুমিন আর কে মুনাফিক তা আল্লাহ পূর্বে জানতেন না বরং উহুদ যুদ্ধের পর জানতে পারেন [নাউযু বিল্লাহ]।

অনেক সময় কোনো কিছু আমভাবে বলা হয় কিন্তু উদ্দেশ্য হয় খাস। যেমন, পবিত্র কুরআনে চোরের হাত কেঁটে দিতে বলা হয়েছে [মায়েদা/৩৮] এবং জিনাকারী মেয়ে হোক বা ছেলে হোক তাদের একশ বেত মারতে আদেশ করা হয়েছে [নূর/২]। কিন্তু হাদীসে এসেছে, চোর যদি এক দীনারের এক চতুর্থাংশের

কম চুরি করে তবে তার হাত কাঁটা হবে না এবং জেনাকারী বিবাহিত হলে তাকে রজম করতে হবে অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। খারেজীরা বিবাহিত জেনাকারীকে রজম করার বিধানটি অস্বীকার করে। তারা বলে, এ বিধান কুরআনের বিপরীত তাই পরিত্যক্ত। কিন্তু ওলামায়ে কিরাম বলেন, এটা কুরআনের বিপরীত নয় বরং কুরআনের বিধানের ব্যাখ্যা। যেহেতু পবিত্র কুরআনে সব কিছু সংক্ষেপে বলা হয় আর হাদীসে সেটা ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন কুরআনে সলাত আদায় করতে বলা হয়েছে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময় নির্ধারন করে দেওয়া হয়নি। একইভাবে যাকাত দিতে বলা হয়েছে কিন্তু যাকাতের পরিমাণ কত তা বলে দেওয়া হয় নি। এধরণের সাধারনভাবে উল্লেখিত বিধানের সঠিক ব্যাখ্যা না জেনে সেগুলো অনুসরণ করলে বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও বিদয়াত সৃষ্টি হবে।

এর বিপরীতে অনেক সময় কোনো কিছু খাসভাবে বলা হয় কিন্তু উদ্দেশ্য হয় আম। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}

যখন আপনার রব ফেরেশতাদের আদমকে সাজাদা করতে আদেশ করেন, তারা সকলে সাজদা করেছিল কেবল ইবলীস

সাজদা করেনি। সে ছিল একজন জিন। সে তার রবের আদেশ অমান্য করেছিল।

[কাহফ/৫০]

আল্লাহ ফেরশতাদের উদ্দেশ্যে আদমকে সাজদা করার নির্দেশ দেন। ইবলীস তো ফেরেশতা ছিলো না সে ছিল জিন। তাহলে এ নির্দেশ তার উপর প্রযোজ্য হলো কিভাবে? আসলে এটা ভাষার একটি রীতি। একজনের ব্যাপারে যে কথা বলা হয় অনেক সময় তা অন্যের উপর প্রযোজ্য হয়। বাংলা ভাষায় বিষয়টিকে বলা হয়, ‘‘ঝী-কে মেরে বৌকে শিক্ষা দেওয়া।’’

এর আরেকটি উদাহরণ হলো, পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে খাসভাবে নবীর স্ত্রীদের পর্দা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য মহিলারা পর্দা করবে না। [আহযাব/৩২]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}

যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় যার কোনো সন্তান নেই কিন্তু একটি বোন থাকে তবে ঐ বোন তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। [নিসা/১৭৬]

এই আয়াতে কেবল সন্তান না থাকলেই কোনো ব্যক্তির বোন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে এমন বলা হয়েছে কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী সকল ওলামায়ে কিরামের মতে এখানে যদিও কেবল সন্তানের কথা বলা হয়েছে কিন্তু আসলে উদ্দেশ্য হলো পিতা ও সন্তান। একারণে তারা বলেছেন, যার সন্তান নেই কিন্তু পিতা আছে তার বোন থাকলেও সে তার সম্পত্তিতে অংশ পাবে না। তবে শীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা এই আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্যের উপর নির্ভর করে বলেছে, যার সন্তান নেই তার পিতা থাকলেও তার বোন তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

এধরণের আরও অনেক বিভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাস রয়েছে। যারা এই সব আক্বীদা বিশ্বাসে বিশ্বাসী তারা নিজেদের মতের স্বপক্ষে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস উপস্থাপণ করে থাকে। ঐ সকল আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে তাদের মতামত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। এসব কিছুর পরও তারা সকলের নিকট ভ্রান্ত পথাবলম্বী ও বিদয়াতী হিসেবে চিহ্নিত। কারণ কুরআন-হাদীসের সঠিক বুঝ বলতে কেবল কিছু আয়াত ও হাদীস সামনে রেখে নিজের মন মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বোঝায় না বরং যেসব সাহাবায়ে কিরাম কুরআন নাযিল হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিলেন এবং প্রতিটি শব্দের সঠিক অর্থ সম্পর্কে অবগত, তাদের মতামত এবং তাদের অনুসারী পরবর্তী যুগের

ওলামায়ে দ্বীনের মতামতের আলোকে কুরআন হাদিসের সঠিক অর্থ নিরুপন করতে হবে।

কাদরিয়ারা কিছু প্রশ্ন করে খলীফা উমর ইবনে আব্দিল আজিজ ﵀ এর নিকট একটি চিঠি লিখে পাঠালে তিনি জবাবে বলেন,

وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا لِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَءُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ، وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ، وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ

তোমরা যদি বলো আল্লাহ অমুক অমুক আয়াত কেনো নাযিল করেছেন? আমি বলবো, সাহাবায়ে কিরাম ঐ সকল আয়াত পাঠ করেছেন এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা তারা জানতেন, যা তোমরা জানো না। একারণে তারা ঐসকল আয়াত পাঠ করার পরও এটা বিশ্বাস করতেন যে, তাকদীর পূর্ব হতেই লেখা রয়েছে।

[আবু দাউদ]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ﵁ যখন পথভ্রষ্ট খারেজীদের সাথে আলোচনা করতে যান তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْأَنْصَارِ لِأُبَلِّغَكُمْ مَا يَقُوْلُوْنَ الْمُخْبِرُوْنَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ هُمْ أَعْلَمُ بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ وَ فِيْهِمْ أُنْزِلَ وَ لَيْسَ فِيْكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ

আমি তোমাদের নিকট এসেছি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের পক্ষ থেকে। আমি এসেছি তাদের মতামত

তোমাদের শোনাতে যেহেতু তাদের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তারাই ওহী সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক অবগত। আর তোমাদের মধ্যে তাদের কেউ নেই।

[হাকিম তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং আজ-জাহাবী সহীহ বলেছেন।]

দেখা যাচ্ছে, সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম ভ্রান্ত মতবাদের লোকদের সাথে বিতর্কের ক্ষেত্রে সামাধানের পথ হিসেবে সাহাবায়ে কিরামের মতামতকে চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করতেন। যেহেতু কুরআন হাদীস তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে অতএব, তারাই এটার অর্থ সম্পর্কে অধিক অবগত।

আল্লাহ্ ﷻ এবং তার রসুল ﷺ আমাদের একই শিক্ষা দিয়েছেন।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

তোমাদের উপর আবশ্যক হলো আমার পথ এবং সত্যপন্থী খলীফাদের পথ অবলম্বন করা। তার উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকবে। আর নতুন মতবাদ সৃষ্টি করো না। কেননা যে কোনো নতুন মতবাদ বিদয়াত আর প্রত্যেকটি বিদয়াত পথভ্রষ্টতা।

[আবু দাউদ]

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا}

তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছো যদি তারা সেভাবে ঈমান আনয়ন করে তবে তারা সত্য পথ প্রাপ্ত হবে।

[বাকারা/১৩৭]

এই আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মতো ঈমান আনাকে হেদায়েত তথা সত্য পথ প্রাপ্ত হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

যে কেউ হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পরও রসুলের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয় এবং মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য কোনো পথ অনুসরণ করে আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেবো আর তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। নিশ্চয় জাহান্নাম খুবই নিকৃষ্ট স্থান। [নিসা/১১৫]

ইমাম শাফেঈ এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম এই আয়াত থেকে উম্মতের ঐক্যমত তথা ইজমাকে অনুসরণ করা আবশ্যক প্রমাণ

করেছেন। যেহেতু এখানে মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করাকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। [ইমাম সুয়ূতীর মিফতাহুল জান্নাহ্]

শরীয়তের বিধি-বিধান সঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের নিকটবর্তী যুগের ওলামায়ে দ্বীনের মতমত অনুসরণ করার বিষয়টি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব সাহাবায়ে কিরাম সরাসরি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট হতে দ্বীন শিক্ষা করেছেন, যাদের উপস্থিতিতে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে তারাই যে শরীয়তের বিধানাবলী এবং কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা সসম্পর্কে অধিক জ্ঞাত থাকবেন এটা কে অস্বীকার করতে পারে! একইভাবে সাহাবায়ে কিরামের ছাত্ররা এবং তাদের নিকটবর্তী যুগে আগমনকারী ওলামায়ে কিরাম শরীয়ত সম্পর্কে অধিক অবগত হবেন এটাই স্বাভাবিক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আমার সাহাবারা তারপর পরবর্তী যুগ এবং তাদের পর তাদের পরবর্তী যুগ [সহীহ বুখারী]।

ফলে তাদের মতামত ও চিন্তা-দর্শন পরিত্যাগ করে হাদীস-কুরআনের উপর মতামত ব্যক্ত করা পথভ্রষ্টতা ভিন্ন কিছু নয়।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের অনুসারী পরবর্তী ওলামায়ে দ্বীনের মতামতের আলোকে যারা কুরআন-হাদীস বোঝার চেষ্টা করে তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত। তাদের বলা হয় আহলুসুন্নাহ ওয়াল জামায়া (أهل السنة والجماعة)। আর যারা নিজেরা কুরআন-হাদীস থেকে যা বোঝে তার অনুসরণ করে তাদের বলা হয় আহলুল-আহওয়া (أهل الأهواء) বা মুবতাদিয়া (مبتدعة) অর্থাৎ বিদয়াতী।

হাফিজ ইবনে হাযার আল-আসক্কালানী رحمه الله বিদয়াতী কারা এ বিষয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে বলেন,

والمبتدع أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة

বিদয়াতী হলো সে যে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বিপরীতে কোনো আক্বীদা রাখে। [ফাতহুল বারী]

এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে স্মরণ রাখতে হবে। বর্তমানে দেখা যায় কুরআন হাদীসের দু'একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে যে যার মতো ফতোয়া দিয়ে দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তীযুগের ওলামায়ে দ্বীনের মতের বিপরীতে মত ব্যক্ত করে। তারাই আবার নিজের মতের বিরুদ্ধে যারা আছে তাদের পথভ্রষ্ট ও বিদয়াতী আখ্যায়িত করে। এই নির্বোধরা এটা জানে না যে আসলে তারাই হলো বিদয়াতী। তারা খারেজী, মু'তাজিলা, শীয়া ইত্যাদি পথভ্রষ্ট ফিরকার সমপর্যায়ের লোক। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

* মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে সঠিক কর্মপদ্ধতি কি?

আমরা বলেছি দ্বীনী বিধি-বিধানের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী ওলামায়ে দ্বীনের মতামতই সঠিক হিসেবে গণ্য আর তাদের মতামতের বিপরীত মত বিদয়াত হিসেবে গণ্য। কিন্তু অনেক মাসয়ালায় দেখা যায় সাহাবায়ে কিরাম বা পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীন দ্বিমত করেছেন এই সকল বিষয়কে ইখতিলাফী বা মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয় বলা হয়। এসব বিষয়ের বিধান কি হবে?

এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর হলো, মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে যে কোনো একটি মত মেনে চলার অধিকার সবার রয়েছে তবে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে তিরষ্কার করতে পারবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই এ কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরাম এর উপর কঠোরভাবে আমল করেছেন। উপরে আমরা সহীহ বুখারীর একটি হাদিস উল্লেখ করেছি। রাসুলূল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন বনু কুরাইজায় না পৌঁছে কেউ যেন আসরের সলাত আদায় না করে। কিন্তু পথিমধ্যে আসরের সলাত ফওত হওয়ার আশঙ্কা হলে সাহাবায়ে কিরাম দ্বিমতে জড়িয়ে পড়েন। তাদের একদল বলেন, আল্লাহর রাসুল যা বলেছেন আমরা তাই করবো। বনু কুরাইজায় না পৌঁছে

আমরা আসরের সলাত আদায় করবো না। ফলে তারা সূর্য ডোবার পরে আসরের সলাত আদায় করেন। অন্য আরেক দল বলেন, আল্লাহর রাসুলের কথার উদ্দেশ্য এটা নয় বরং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তোমরা দ্রুত যাও যাতে আসরের সলাতের সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই বনু কুরাইজায় পৌঁছাতে পারো। এই সকল সাহাবারা বনু কুরাইজায় না পৌঁছেই আসরের সলাত আদায় করে নেন। হাদিসে বলা হয়েছে,

فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

আল্লাহর রাসুল তাদের কাউকেই তিরষ্কার করেন নি। [সহীহ বুখারী]

অন্য হাদিসে এসেছে,

إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

যখন কেউ ইজতিহাদ করে রায় দেয় আর তার রায় সঠিক হয় তার দুটি সওয়াব আর তার রায় ভুল হলে তার একটি সওয়াব। [সহীহ বুখারী]

এসব হাদিস প্রমাণ করে কুরআন হাদীসের উপর অভিজ্ঞ মুজতাহীদরা যখন সঠিক মূলনীতির আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে রায় দেন যদি তাদের রায় ভুলও হয় তবু তাদের পাপ হয়

না বরং সওয়াব হয়। অতএব তাদের কোনো পক্ষকে তিরষ্কার করা সঙ্গত নয়। এটা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী যুগের নেককার ওলামায়ে দ্বীনের মতামতের আলোকে সঠিক রায় অনুধাবনের চেষ্টা করে। কিন্তু যারা তাদের মতামত পরিত্যাগ করে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করে তারাই প্রকৃত বিদয়াতী। একারণে খারেজী, মু'তাজিলা, মুরজিয়া, ক্বাদরিয়া ইত্যাদি মতবাদের লোকদের ওলামায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

মোট কথা যেসব বিষয়ে সাহাবয়ে কিরাম বা তাদের পরবর্তী যুগের অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম দ্বিমত করেন ঐ সকল বিষয়ে কোনো পক্ষকে তিরষ্কার করা বৈধ নয়। এসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে কাউকে বিভ্রান্ত বা বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করা তো মারাত্মক অপরাধ।

যেসব মাস্য়ালাতে একাধিক মত বিদ্যমান থাকে এবং উভয় পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফুকাহা ও মুজতাহিদীনদের মতামত পাওয়া যায় একজন যোগ্যতা সম্পন্ন গবেষক ঐ সকল মাস্য়ালাতে চিন্তা গবেষণা করে যেটিকে অধিক সঠিক মনে হবে সেটির উপর আমল করবেন এবং সেটির উপর ফতওয়া দেবেন কিন্তু তিনি ভিন্নমতালম্বীদের উপর নিজের মত চাপিয়ে দিতে পারবেন না। নিজের মতকে তিনি সঠিক মনে করতে পারেন

কিন্তু অন্যকে পথভ্রষ্ট মনে করার অধিকার তার নেই।

ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ

আলেমরাও মানুষকে কেবল সেই সব বিষয় হতে নিষেধ করবেন, যেসব ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে আর যেসব বিষয়ে দ্বিমত আছে সেসব ব্যাপারে কাউকে নিষেধ করা যাবে না। [শারহে মুসলিম]

এবিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَوْلٍ فَخَالَفَهُمْ رَجُلٌ كَانَ ضَالًّا وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا وَرَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا كَانَ فِي الْأَمْرِ سَعَةٌ

উমর ইবনে আব্দিল আজীজ ﵀ বলতেন, আমি এমন মনে করি না যে, সাহাবায়ে কিরাম কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যে লিপ্ত না হলেই ভাল হতো, কেননা যখন তারা কোনো বিষয়ে ঐক্যমত পোষন করেন তখন তাদের মতের বিরুদ্ধে কেউ গেলে অপরাধী হয় আর যখন তারা দ্বিমত করেন তখন তাদের মতামতসমূহের মধ্যে যে কোনোটি গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। [মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া]

তিনি আরো বলেন,

وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ : إجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ

একারণে আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলতেন, সাহাবায়ে কিরামের ইজমা অকাট্য দলীল আর তাদের ইখতিলাফ প্রশস্ত রহমত। [মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া]

আরো স্পষ্ট করে তিনি বলেন,

لَيْسَ لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُصَنِّفُونَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ : إنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ لَا تُنْكَرُ بِالْيَدِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا ؛ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَبِعَهُ وَمَنْ قَلَّدَ أَهْلَ الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا إنْكَارَ عَلَيْه

একজন আলেমের এই অধিকার নেই যে মানুষকে তার মত মেনে চলতে বাধ্য করবে। একারণে শাফেঈ মাযহাবের ও অন্যান্য মাযহাবের আলেমদের মধ্যে যারা আল-আমরু বিলমারুফ ওয়ান-নাহী আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) সম্পর্কে বই রচনা করেছেন তারা বলেছেন এই সকল ইজতিহাদী মাসয়ালাতে কোনো শক্তির প্রয়োগ করে কাউকে নিষেধ করা যাবে না। কারো এই অধিকার নেই যে, অন্যকে নিজের মত মানতে বাধ্য করবে। বরং সে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করবে তার আলোচনার মাধ্যমে

যদি কারো নিকট কোনো একটি মত সঠিক বলে মনে হয় তবে সে তার অনুসরণ করবে আর যদি কেউ অন্য মতটির তাকলীদ করে তবে তাকে নিন্দা করা যাবে না।

[মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া]

কিছু লোক আছে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন ইখতিলাফী বিষয়ের দা'ওয়াত দেয়। সলাতের ভিতর রুকুর আগে পরে হাত তোলা, আমীন জোরে বলা, সুরা ফাতিহা পড়া ইত্যাদি বিষয় এমনভাবে প্রচার করে যে, মনে হয় এগুলো ছাড়া কেউ মুসলিমই হতে পারে না। একইভাবে সলাতের পরে মোনাজাত করা, মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন পালন করা ইত্যাদি ব্যাপারে তারা এতটা কঠোরতা করে যে, মনে হয় এগুলো যে করে সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়। এমনকি তার ঈমান থাকে কিনা সেটিও সন্দেহের বিষয়। অথচ এসব ব্যাপারে আলেমদের একটি বিরাট অংশ অনুমতি দিয়েছেন। অন্য কিছু আলেম অবশ্য এগুলোকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলবো, এসব বিষয়ে ওলামায়ে দ্বীন মতপার্থক্য করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি এসব বিষয়কে বৈধ ও উত্তম মনে করে এতে লিপ্ত হয় তাকে তিরষ্কার করা বা তার পাপ হবে এমন মন্তব্য করা সঠিক নয়। যেহেতু মতপর্থক্যপূর্ণ বিষয়ে যে কোনো একটি মত গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকের

রয়েছে। এসব ব্যাপারে অত্যাধিক বাড়াবাড়ি করা অর্থ মতাপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে শরীয়তের সঠিক কর্মপন্থা পরিত্যাগ করে ভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করা। আর এটাই হলো প্রকৃত বিদয়াত।

* সকল বিদয়াতই হারাম নয় বরং তার মধ্যে মাকরুহ বা অপছন্দীয় বিদয়াতও রয়েছে যাতে লিপ্ত হলে পাপ হয় না তবে তা থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ।

উপরে আমরা দেখেছি আলেমদের একটি অংশ বিদয়াতকে ভাল, মন্দ দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। ভাষাভিত্তিকভাবে সকল নতুনসৃষ্ট বিষয়কে বিদয়াত বলা যায় এ বিষয়ে সকলে একমত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীন অনেক সময় বিদয়াতকে শাব্দিকভাবে উত্তম অর্থে প্রয়োগ করেছেন সেটিও বিভিন্ন দলীল প্রমাণের আলোকে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন উমর ﵁ এশার পর নিয়মিত জামাতে তারাবীহর সলাত আদায়ের ব্যাপারটিকে "উত্তম বিদয়াত" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমানে কিছু লোক সাহাবায়ে কিরাম বা পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম কোনো বিষয়কে বিদয়াত বলতে শুনলে উক্ত বিষয়কে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় মনে করে, এটা সঠিক কর্মপন্থা নয়। যেহেতু এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম এবং পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম বিদয়াতকে কেবল মন্দ অর্থে নয় বরং উত্তম অর্থেও প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ তারা

অনেক সময় বিদয়াত শব্দের ভাষাভিত্তিক অর্থের উপর নির্ভর করেছেন। সুতরাং তারা কোনো কিছুকে বিদয়াত বললেই তা নিন্দনীয় এমন মনে করা যাবে না যতক্ষণ না জানা যায়, তারা আসলে নিন্দনীয় অর্থেই বিদয়াত শব্দটি প্রয়োগ করেছেন না কি শাব্দিক অর্থে।

বর্তমান যুগের গবেষকদের আরেকটি ভুল হলো, পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীন কোনো বিষয়কে নিন্দনীয় বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করলেই তারা বিষয়টিকে হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করে এবং তার বিপরীতে রক্তাক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যায়। প্রকৃত সত্য হলো, বিদয়াত শব্দটি যখন নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয় তখনও তা কেবল হারাম বা নিষিদ্ধ অর্থ বোঝায় না বরং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাকরুহ (مكروه) তথা অপছন্দনীয় বা খেলাফে আওলা (خلاف الأولي) তথা "না করাই ভাল" এমন অর্থও প্রকাশ করতে পারে। পূর্বে আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি তবে বিষয়টি অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে এ সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। নিন্দনীয় বিদয়াত যে সর্ব অবস্থায় হারাম বোঝায় না বরং কখনও কখনও মাকরুহ বা খেলাফে আওলা বোঝায় এ ব্যাপারে প্রায় সকল আলেম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাদের আলোচনাতে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নিচে আমরা এ বিষয়ে চার মাজহাবের বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের মন্তব্য তুলে ধরছি।

হানাফী ফকীহ ইবনে আবেদীন ﷺ যখন মুক্তাদিরা এমনিতেই ইমামের তাকবীর শুনতে পায় তখন বিনা প্রয়োজনে কেউ মুকাব্বিরের দায়িত্ব পালন করা সম্পর্কে বলেন,

اتفق الائمة الاربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة: أي مكروهة

চার ইমাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে এ অবস্থায় মুকাব্বিরের দায়িত্ব পালন করা নিন্দনীয় বিদয়াত। অর্থাৎ এটা মাকরুহ। [হাশিয়াতু রদ্দে মুহতার]

এছাড়া বাহরুর রায়েক ও অন্যান্য হানাফী ফিকাহ গ্রন্থে বিভিন্ন মাসয়ালা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, (فهو مكروه وبدعة) এটা বিদয়াত হবে এবং মাকরুহ হবে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আনওয়ার শাহ কাশমীরী বলেন,

إلاّ أن البِدْعَةَ قد تكون مكروهةٌ تنزيهًا، وقد تكون مكروهةً تحريمًا، كالنهيِّ، فإنه قد يُفيدُ التحريم، وقد يُفِيدُ التنزيه، فيجري هذا التقسيم في البِدْعَةِ أيضًا

বিদয়াত কখনও কখনও মাকরুহে তানযিহী হয় আবার কখনও মাকরুহে তাহরীমী হয়। যেমন কোনো কিছু থেকে নিষেধ করার মধ্যমে কখনও হারাম বোঝায় আবার কখনও সেটা পরিত্যাগ করা উত্তম এমন বোঝায়। এই দুটি ভাগ বিদয়াতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। [ফায়জুল বারী]

মালেকী মাজহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ইবনে রুশদ ﵀ প্রতি ঈদে মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত করার বিষয়টিকে রেওয়াজে পরিনত করা সম্পর্কে বলেন,

هو بدعة من البدع المكروهة ، تركها أحسن من فعلها

এটা মাকরুহ বিদয়াতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত যা করার চেয়ে পরিত্যাগ করাই উত্তম।

[আল-বাইয়ান ওয়াত তাহসীল]

আল-খারাশী মুখতাসারে খলীলের ব্যাখ্যায় তাশাহুদ সশব্দে পাঠ করা সম্পর্কে বলেন,

قَوْلُهُ وَالْجَهْرُ بِهِ بِدْعَةٌ أي فهو مكروه

এটা জোরে পাঠ করা বিদয়াত অর্থাৎ এটা মাকরুহ।

শাফেঈ মাজহাবের ফিকাহ গ্রন্থ শারহে মুহাজ্জাবে ইমাম নাব্বী ﵀ ইমামুল হারামাইন আবুল মায়ালী ﵀ থেকে উল্লেখ করেন, ওজুতে চার বার হাত ধৌত করা সম্পর্কে তিনি বলেন,

والبدعة انما هي تعمد غسلة رابعة بلا سبب مع أن الرابعة وإن كانت مكروهة فليست معصية

বিদয়াত হলো, কোনো কারণ ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে (ওজুর অঙ্গ) চারবার ধৌত করা। তবে চারবার ধৌত করা মাকরূহ হলেও তা পাপের কাজ নয়।

জুময়ার খুতবাতে রাজা-বাদশাহদের নাম ধরে দোয়া করার ব্যাপারে ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

فاتفق اصحابنا على انه لا يجب ولا يستحب وظاهر كلام المصنف وغيره انه بدعة اما مكروه واما خلاف الاولي

আমাদের মাজহাবের (শাফেঈ মাজহাবের) আলেমরা একমত হয়েছেন যে, এটা আবাশ্যক নয় মুস্তাহাবও নয়। আল-মুহাজ্জাবের লেখক ও অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম বিষয়টিকে বিদয়াত বলেছেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো, এটা মাকরূহ বা খেলাফে আওলা। [শারহে মুহাজ্জাব]

ইমাম নাব্বীর উস্তাদ আবু শামা আল-মাকদেসী বিদয়াত সম্পর্কে লিখিত তার গ্রন্থ 'আল-বায়িস ফি ইনকারিল বিদায়ি ওয়াল হাওয়াদিস' এ বলেন,

وَأما الْبدع المستقبحة فَهِيَ الَّتِي أردنَا نَفيهَا بِهَذَا الْكتاب وانكارها وَهِي كل مَا كَانَ مُخَالفا للشريعة أَو مُلْتَزما لمخالفتها وَذَلِكَ منقسم الى محرم ومكروه وَيخْتَلف ذَلِك بإختلاف الوقائع وبحسب مَا بِهِ من مُخَالفَة الشَّرِيعَة تَارَة يَنْتَهِي ذَلِك الى مَا يُوجب التَّحْرِيم وَتارَة لَا يتَجَاوَز صفة كَرَاهَة التَّنْزِيه

মন্দ বিদয়াতের প্রতিবাদ করা ও তা বাতিল প্রমাণ করাই এই গ্রন্থে আমাদের উদ্দেশ্য। আর তা হলো শরীয়তের বিপরীত অথবা বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন যে কোনো বিষয়। এটা হারামও হতে পারে আবার মাকরুহও হতে পারে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং শরীয়তের সাথে কি পরিমাণ বৈপরিত্ব রাখে তার উপর এটা নির্ভর করে। কখনও কখনও এটা হারাম পর্যন্ত পৌঁছায় আবার কখনও মাকরুহে তানযীহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

ইবনে হাযার হাইতামী ﵀ বলেন,

قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ التَّبْلِيغَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ بَلَغَ الْمَأْمُومِينَ صَوْتُ الْإِمَامِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَمُرَادُهُ بِكَوْنِهِ بِدْعَةً مُنْكَرَةً أَنَّهُ مَكْرُوهٌ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزلأ

কেউ কেউ বলেছে, ইমামের কণ্ঠ যখন মুক্তাদির কানে এমনিতেই পৌঁছায় সেই অবস্থায় মুকাব্বির রাখা চার ইমামের ঐক্যমতে নিন্দনীয় বিদয়াত হিসেবে গণ্য। কেননা সে অবস্থায় সুন্নাত হলো ইমাম নিজেই এ দায়িত্ব পালন করবে। তবে এখানে নিন্দনীয় বিদয়াত বলতে মাকরুহ বোঝানো হয়েছে। এ কথা থেকে যে মনে করেছে এটা জায়েজ নয় (হারাম) তার মত সঠিক নয়। [তুহফাতুল মুহতাজ]

ইবনে কুদামা ﵀ আল-মুগনীতে বলেন,

كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقِرَاءَةَ بِالْأَلْحَانِ ، وَقَالَ : هِيَ بِدْعَةٌ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ﵀ লাহনের সাথে (মাত্রাতিরিক্ত কায়দা কসরত করে) কুরআন তিলোয়াত করা অপছন্দ করেছেন (মাকরুহ বলেছেন)। তিনি বলেছেন এটা বিদয়াত।

বিভিন্ন হাদীসে তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ও অন্যান্য দোয়া বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে সেগুলোর কোনোটিতে কোনো কোনো শব্দ অতিরিক্ত আছে। ঐ সকল বর্ণনার মধ্যে যে কোনো একটি পাঠ করা বৈধ তবে সবগুলোকে একত্রিত করে পাঠ করলে তা অপছন্দ করে ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন,

فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَيْسَ سُنَّةً بَلْ بِدْعَةٌ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا

এভাবে পাঠ করা সুন্নাত নয় বরং বিদয়াত যদিও এটা বৈধ। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

সলাতের শেষে সালাম দেওয়ার সময় যদি কেউ অতিরিক্ত শব্দ যোগ করে। তবে তা মাকরুহ হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন,

نَعَمْ يُكْرَهُ هَذَا ؛ لِأَنَّ هَذَا بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اسْتَحَبَّهُ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ

হ্যাঁ এটা মাকরুহ হবে। যেহেতু এটা বিদয়াত। কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা করেন নি এবং কোনো গ্রহণযোগ্য আলেম এটাকে উত্তম বলেন নি। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইমাম শাওকানী ؒ নীলুল আওতারে ফজরের সুন্নাত আদায়ের পর কিছুক্ষণ শয়ন করে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

الْقَوْلُ الثَّالِثُ : إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَبِدْعَةٌ

এ বিষয়ে তৃতীয় মতটি হলো এটা মাকরুহ এবং বিদয়াত।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ হতে যে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তা হলো ওলামায়ে কিরাম বিদয়াত শব্দটিকে হারাম ও মাকরুহ উভয় অর্থে ব্যবহার করতেন। মাকরুহ বলতে সেই বিষয়কে বোঝায় যা পরিত্যাগ করাই উত্তম তবে তাতে লিপ্ত হলে পাপ হয় না। যারা বিদয়াতকে ভাল মন্দ উভয় ভাগে ভাগ করেন তারা তো বটেই এমনকি যারা সকল বিদয়াতই মন্দ এমন মনে করেন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তারাও কমপক্ষে এতটুকু স্বীকার করেন যে, বিদয়াত হারাম ও মাকরুহ উভয় ভাগে বিভক্ত। সুতরাং কোনো কিছু বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করলেই তাতে লিপ্ত হওয়া মহাপাপ এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তি জঘন্য পাপী এই ধ্যান ধারনা সঠিক নয়। সেই সাথে সকল বিদয়াতের প্রতি সমান কঠোরতা প্রদর্শন করাও সঠিক কর্মপন্থা নয়। মাকরুহ বা

অপছন্দনীয় কাজের প্রতিবাদ করতে যেয়ে তদাপেক্ষা খারাপ পরিণতি বরণ করে নেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পূর্বে আমরা এ বিষয়ে কঠোরতা না করার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের দলীল প্রমাণ ও ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য তুলে ধরেছি। আমরা এটাও বর্ণনা করেছি যে, অনেক সময় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মাকরুহ কাজের প্রতিবাদ না করাই অধিক কল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে। এ বিষয়টি পাঠক অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখবেন বলে আশা করি।

* বিদয়াতের মধ্যে কোনটি হারাম কোনটি মাকরুহ তা নির্ণয় করার উপায় কি?

আমরা বলেছি, যা কিছুকে বিদয়াত নামকরণ করে নিন্দা করা হয় তার সবগুলোর বিধান এক নয়। তার মধ্যে যেমন কিছু বিষয় হারাম রয়েছে, তেমনি কিছু রয়েছে মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় তবে পাপের কাজ নয়। এমনকি কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যা খেলাফে আওলা তথা ঐ সকল বিষয়ে লিপ্ত হওয়া পাপের কাজ তো নয়ই এমনকি অপছন্দনীয় বা নিন্দনীয়ও নয়। অর্থাৎ তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে মৃদুভাবে নিষেধ করা যেতে পারে কিন্তু কোনভাবে তিরস্কার করা যাবে না। এখন পাঠকের মনে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে। তা হলো, কোন প্রকারের বিদয়াতের বিধান কি হবে তা নির্ণয় করার উপায় কি?

এই প্রশ্নটির উত্তর পেতে হলে আমাদের বিদয়াতের মুলনীতিগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। উপরে আমরা বলেছি বিদয়াতের তিনটি মূলনীতি রয়েছে।

১. আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে বিভ্রান্ত আক্বীদা।

২. আল্লাহর রাসুলের সুন্নাতের বিপরীত আমল করা।

৩. যেসব বৈধ বা উত্তম কাজে লিপ্ত হলে বিদয়াত সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এসব বিষয়ে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আল্লাহর রাসুলের সুন্নাতের বিপরীত আমল করার বিধান সম্পর্কে আমরা বলেছি যখন কোনো বিষয় সুন্নাত হিসেবে গণ্য হয় তার বিপরীত আমল করা হারাম বা অবৈধ হয় না বরং মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় হয়। এখানে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসুলুল্লাহর সুন্নাতকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করা হলে তা অবৈধ এমনকি কুফরী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তবে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা না করে কেবল পরিত্যাগ করা হলে তাতে পাপ হবে না কিন্তু বিষয়টি অপছন্দনীয় হবে। একইভাবে বিদয়াতের তৃতীয় মূলনীতি তথা যে কাজ নিজে বৈধ তবে তাতে লিপ্ত হলে পরবর্তীতে বিদয়াত সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা বলেছি, তাতে লিপ্ত হওয়া মাকরুহ তথা অপছন্দনীয়, হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। তাতে লিপ্ত হলে পাপ হবে

এমনও নয়। সুতরাং এ দুটি বিষয়ের বিধান সম্পর্কে নতুন করে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবল বিদয়াতের প্রথম মূলনীতি তথা শরীয়ত সম্পর্কে বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করার বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

এ সম্পর্কে কথা হলো, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে যে কোনো বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস যে বিদয়াত সে বিষয়ে সকল ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। একারণে তারা খারেজী, মু'তাজিলা, মুরজিয়া ইত্যাদি আক্বীদার লোকদের সর্বসম্মতিক্রমে বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে বিভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাসের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে এবং প্রতিটি প্রকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে। সুক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে বিভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট আক্বীদা বিশ্বাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. যেসব বিষয় বিভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটি পবিত্র কুরআন, সহীহ হাদীস এবং উম্মতের ইজমার আলোকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং সাধারন মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও প্রশিদ্ধ। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, রমজানের সওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ বিধান অস্বীকার করা বা মদ, জিনা, সুদ ইত্যাদি অবৈধ কাজকে বৈধ মনে করা। এই সকল বিভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাস করা হারাম এবং কুফর। এতে লিপ্ত ব্যক্তি একদিকে যেমন বিদয়াতী অন্য দিকে সে কাফির বা মুরতাদ।

২. যেসব বিষয় বিভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী ওলামায়ে দ্বীন একমত হয়েছেন। তবে ঐ সকল বিষয়ে সাধারন মুসলিমরা বিস্তারিত জানে না এবং সেগুলো সুক্ষ্ম ও অস্পষ্ট হওয়ার কারণে কুরআন সুন্নাহর উপর অভিজ্ঞ ওলামায়ে দ্বীন ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝতে সক্ষম নয়। যেমন, পবিত্র কুরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর সৃষ্ট নয়, পিতাকে হত্যাকারী সন্তান পিতার সম্পত্তিতে ওয়ারিছ হবে না, কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা যাবে না ইত্যাদি। এইসকল আক্বীদাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিদয়াতী এবং পাপী তবে কাফির নয়। অর্থাৎ এই ধরণের বিভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাস হারাম হিসেবে গণ্য কুফরী নয়। একারণে ওলামায়ে দ্বীন খারেজী, মু'তাজিলা, মুজাসসিমা ইত্যাদি ফিরকাকে সর্বসমম্মতিক্রমে বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের কার্যকলাপকে হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আমরা উপরে ইজ্জুদ্দিন আব্দুস সালাম رحمه الله থেকে উল্লেখ করেছি, তিনি বিদয়াতকে হারাম, মাকরুহ, ফরজ, মুস্তাহাব ও মুবাহ এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং হারাম বিদয়াতের উদাহরণে খারেজী, মু'তাজিলা, মুরজিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ফিরকার বিদয়াতী আক্বীদা-বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য ওলামায়ে কিররামও এই সকল বিদয়াতী ফিরকাকে পথভ্রষ্ট হিসেবেই গণ্য করেছেন তবে বেশিরভাগ ওলামায়ে দ্বীন তাদের কাফির বলেন নি।

৩. উপরে আমরা বলেছি যেসব বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে মতপার্থক্য চলে আসছে ঐ সকল বিষয়ে উভয়পক্ষের মতই গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে কোনো একটি মতকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করা বা কোনো এক পক্ষকে বিভ্রান্ত বলার সুযোগ নেই। তবে যেসব ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম বা তাদের পরবর্তী ওলামায়ে দ্বীন ইজমা করেছেন সে বিষয়ের বিরোধিতা করা যাবে না। ইজমা অর্থ হচ্ছে, কোনো এক যুগের সকল ওলামায়ে দ্বীনের ঐক্যমত। যদি একজন আলেমও কোনো বিষয়ে দ্বিমত করে থাকেন তবে তা ইজমা বলে গণ্য হবে না। তাই তার বিরোধিতা করা হারাম বা কুফরী বলেও গণ্য হবে না। কিন্তু কোনো একটি বিষয়ে যখন প্রায় সকল আলেমের মত পাওয়া যায় আর তার বিপরীতে খুবই নগণ্য সংখ্যক আলেমের বক্তব্য পাওয়া যায় তখন বিষয়টিকে ইজমার কাছাকাছি বলে গণ্য করা হয়। উসুলবিদ ওলামায়ে কিরামের কেউ কেউ এ ধরণের মাসয়ালাকে শিবহুল ইজমা (شبه الإجماع) তথা “উপ ইজমা” বা “প্রায় ইজমা” বলে অভিহিত করেন। এর বিপরীত মতটিকে শায (شاذ) তথা বিরল মত বলা হয়। যেমন, ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর তাবারীর মতে জানাযার সলাতে ওজুর প্রয়োজন নেই, শাফেঈ মাজহাবের আল-ইস্তেখারীর মতে ঈশার সলাত অর্ধ রাত্রির পর শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ রাত বারোটার পর যে ব্যক্তি মুসলিম হয় বা ঐ সময় যদি হায়েজগ্রস্থ মহিলা পবিত্র

হয় তবে তার উপর ঈশার সলাত ফরজ নয়, ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, এক বৈঠকে তিন তালাক দেওয়া হলে তা এক তালাক বলে গণ্য হবে ইত্যাদি। প্রাই সকল ওলামায়ে কিরাম এসব ব্যাপারে বিপরীত মত দিয়েছেন। এধরণের শায মতের অনুসরণ করা নিষিদ্ধ বা হারাম নয় বরং মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। শরীয়তের দলীল প্রমাণ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের উচিৎ এধরণের শায মত অনুসরণ করার ব্যাপারে অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা। এগুলো পরিহার করাই কল্যাণকর তবে অভিজ্ঞ কোনো মুজতাহিদ দলীল প্রমাণের উপর ব্যাপক গবেষণা করে এসব মতের কোনো একটিকে গ্রহণ করলে তাকে বিদয়াতী আখ্যায়িত করে নিন্দা করা যাবে না তবে তার এ কাজটিকে অপছন্দ করা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি অধিকাংশ মাসয়ালাতে এধরণের শাজ মত অনুসরণ করে তাকে অবশ্যই বিদয়াতী বলা হবে এবং তার এ কাজ হারাম বা অবৈধ বলে গণ্য হবে। এই ব্যক্তির নিকট ফতোয়া গ্রহণ করা যাবে না।

* মূলত বৈধ এমন কোনো কাজ দলবদ্ধভাবে বা নিয়মিত আদায় করার বিধান।

বর্তমানে একটা ধারনা সাধারনভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করেছে যে, কোনো একটি কাজ আল্লাহর রাসুল যেভাবে আদায়

করেছেন হুবহু সেভাবে আদায় করাই আবশ্যক। আল্লাহর রাসুল যদি একাকী আদায় করে থাকেন তবে তা দলবদ্ধভাবে আদায় করা বিদয়াত, তিনি যদি অনিয়মিতভাবে আদায় করে থাকেন তবে তা নিয়মিত আদায় করা বিদয়াত ইত্যাদি। এর উপর নির্ভর করে কয়েকজন লোক একত্রিত হয়ে দোয়া-দরুদ পাঠ করলে তাকে বিদয়াত আখ্যায়িত করা হয়। কেউ কেউ তো এতটা বাড়া-বাড়ি করে যে, একটু সুন্দর কণ্ঠে সূর করে দোয়া-দরুদ পাঠ করা হলে তা বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করে। তারা বলে আল্লাহর রাসুল কি এভাবে সূর করে এগুলো পাঠ করেছেন? এই সকল লোকেরা কিছু কিছু আলেম-ওলামার বক্তব্য উপস্থাপণ করে যারা দলবদ্ধভাবে নিয়মিত কোনো বৈধ কাজ করার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপণ করেছেন। কিন্তু তারা এটা লক্ষ্য করে না যে ঐ সকল ওলামায়ে কিরাম কেবল রাসুলুল্লাহ ﷺ করেন নি বিধায় এই সকল কাজ দলবদ্ধভাবে নিয়মিত আদায় করা অপছন্দ করেছেন এমন নয়। বরং এভাবে দলবদ্ধভাবে নিয়মিত আদায় করলে মানুষ বিষয়টিকে আবশ্যক ও অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে এমন আশঙ্কার কারণে তারা এ থেকে নিষেধ করতেন। এই দুটি চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য হলো যারা আল্লাহর রাসুল ﷺ দলবদ্ধভাবে বা নিয়মিত কোনো কাজ করেন নি তাই তা দলবদ্ধভাবে বা নিয়মতি করা বিদয়াত এমন মনে করে তারা কোনো অবস্থাতেই এভাবে আদায় করা বৈধ বলে না। কিন্তু যারা

বলে, কোনো ভাল কাজ দলবদ্ধভাবে বা নিয়মিত আদায় করা আসলে বৈধ বা উত্তম কিন্তু এভাবে আদায় করলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে তাই তা পরিত্যাগ করা উচিৎ তারা কিছু শর্ত সাপেক্ষে এসব কাজের অনুমতি প্রদান করে থাকে। যেমন, হয়তো কেউ দলবদ্ধভাবে আদায় করলো কিন্তু নিয়মিত করলো না বা ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত আদায় করলো কিন্তু প্রকাশ্যে জমায়েত হয়ে আদায় করলো না ইত্যাদি। আর যদি জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, কোনো কাজ দলবদ্ধভাবে নিয়মিত আদায় করলেও মানুষ বিভ্রান্ত হবে না তবে তারা সেটা দলবদ্ধভাবে নিয়মিত আদায় করাও বৈধ বলবেন। সুতরাং কোনো কিছু আল্লাহর রাসুল করেন নি তাই বিদয়াত এমন বলা আর বিষয়টি মূলত বৈধ তবে এভাবে আদায় করলে বিদয়াত সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কায় তা বর্জন করা একই বিষয় নয়। যেহেতু প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়টি নিজেই বিদয়াত হিসেবে গণ্য হয় এবং সাধারনভাবে সকল অবস্থায়ই তা নিন্দনীয় প্রমাণিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা নিজে বিদয়াত নয় বরং বিদয়াত সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কায় বর্জনীয় হয়। ফলে এই আশঙ্কা দূরিভূত হলে তাতে লিপ্ত হওয়া বৈধ বলে গণ্য হয়।

উদাহরণস্বরুপ, রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন মাগরিবের সলাতের পর মসজিদে বসে এশা পর্যন্ত কুরআন পাঠ করতেন এমন বর্ণনা

পাওয়া যায় না। এখন যদি কেউ নিয়মিত মাগরিবের পর হতে এশা পর্যন্ত পবিত্র কুরআন তিলওয়াত করা অভ্যাসে পরিণত করে তবে প্রথম দলের মতে তা বিদয়াত হওয়া উচিৎ যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা করেন নি কিন্তু দ্বিতীয় দলের মতে এটা বিদয়াত নয়। যেহেতু দু'এক জনের ব্যক্তিগত আমলের কারণে সমাজের লোকের আক্বীদা-বিশ্বাস পরিবর্তীত হওয়ার আশঙ্কা নেই। এখন যদি দেখা যায় পাড়াশুদ্ধো লোক একত্রিত হয়ে নিয়মিত মাগরিবের সলাতের পর হতে এশা পর্যন্ত কুরআন তিলওয়াত করে তবে এমন আশঙ্কা রয়েছে যে অজ্ঞ লোকেরা বিষয়টিকে ফরজ বা সুন্নাত মনে করে বসবে তাই বিষয়টি হতে মানুষকে বিরত রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে।

এই পার্থক্যটি বুঝে নেওয়ার পর এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আলেমরা যখন দলবদ্ধভাবে নিয়মিত কোনো কাজ করার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেন তখন তারা এটা উদ্দেশ্য করেন না যে কোনো কাজ দলবদ্ধভাবে আদায় করা বা নিয়মিত আদায় করা নিজে থেকেই নিন্দনীয় একটি বিষয়। যেহেতু কোনো কাজ দলবদ্ধভাবে আদায় করার ফজিলত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُم

যদি আমার বান্দা আমাকে নির্জনে একাকী স্মরণ করে তবে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি আর যদি সে আমাকে কোনো মজলিসে অনেক মানুষের মধ্যে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে তদাপেক্ষা উত্তম মজলিসে (ফেরেশতাদের মসলিসে) স্মরণ করি। [সহীহ বুখারী]

এছাড়া সহীহ বুখারীতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে এসেছে, একদল লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ ﷻ তাদের ক্ষমা করে দেন। এমনকি ঐ ব্যক্তিকেও ক্ষমা করে দেন যার নিয়ত শুদ্ধ ছিল না। এই হাদীসটি প্রমাণ করে একদল লোক একত্রিত হয়ে কোনো ভাল আমল করলে তাদের মধ্যে যাদের অন্তরে ইবাদতের প্রতি একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার অভাব তারাও ক্ষমা পেয়ে যায়। অথচ একাকী ইবাদত করলে তাদের এই ইবাদত গ্রহণযোগ্য হতো না।

অতএব, কোনো কাজ দলবদ্ধভাবে আদায় করা নিন্দনীয় মনে করার কোনো যুক্তি নেই। একইভাবে কোনো আমল নিয়মিত আদায় করার ব্যাপারে হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হলো ঐ আমল যা নিয়মিত আদায় করা হয় যদিও তা পরিমানে কম হয়। [বুখারী ও মুসলিম]

কোনো আমল নিয়মিত আদায় করা এবং তা অভ্যাসে পরিনত করার বিষয়টিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অনেক সময় উক্ত অভ্যাস জারি রাখার স্বার্থে অপছন্দনীয় সময়ও আমল করার অনুমতি প্রদান করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ রমজানের দু'এক দিন পূর্বে নফল সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন যাতে মানুষ সেটাকে রমজানের অংশ মনে না করে। কিন্তু যার সওম পালনের নির্দিষ্ট কোনো অভ্যাস থাকে যেমন মাসের শেষ দুই দিন সওম পালন করা বা প্রতি সোমবার সওম পালন করা ইত্যাদি আর এই অভ্যাস অনুযায়ী রজমানের এক দিন বা দুই দিন পূর্বে সওম পালনের সময় হয় তবে নিয়মিত অভ্যাস ধরে রাখার স্বার্থে তাকে রমজানের একদিন বা দুই দিন পূর্বে সওম পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْه

তোমরা রমজানের দু'একদিন আগে সওম পালন করবে না তবে যদি কারো নির্দিষ্ট কোনো দিনে সওম পালনের অভ্যাস থাকে সে রাখতে পারে। [মুসলিম]

সুতরাং কোনো কাজ নিয়মিত করা বা অভ্যাসে পরিণত করা শরীয়তে অত্যাধিক ফজীলতপূর্ণ।

কোনো উত্তম কথা সুন্দর কণ্ঠে সূর করে পাঠ করার ব্যাপারটিও একটি স্বাভাবিক ও সাধারন বিষয়। এটা নিন্দনীয় বিদয়াত হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই সূর করে কবিতা পাঠ করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, খন্দকের যুদ্ধে যখন সাহাবায়ে কিরাম পরীখা খনন করছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও তাদের সাথে সহযোগীতা করছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা رضي الله عنه আল্লাহর প্রশংসা সূচক একটি কবিতা আবৃতি করছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও তার সাথে কণ্ঠ মিলাচ্ছিলেন। কবিতাটির ভাষা ছিল এমন,

হে আল্লাহ আপনার দয়া না হলে আমরা সঠিক পথ পেতাম না।

আমরা দান-খয়রাত করতাম না, সলাত আদায় করতাম না।

অতএব, আমাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করুন।

শত্রুর সাথে মোকাবিলার সময় আমাদের পদযুগলকে দৃঢ় রাখুন।

ওরাই তো আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করেছে।

যখন তারা আমাদের পথ ভ্রষ্ট করতে চেয়েছে আমরা অস্বীকার করেছি।

হাদিসটির শেষে বলা হয়েছে, (ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا) কবিতাটির শেষের অংশ রাসুলুল্লাহ ﷺ টেনে বলছিলেন।

তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দফ বাজিয়ে গান করার ঘটনা বর্নিত আছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের নিষেধ করেন নি।

সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলোয়াত করার ফজীলত সম্পর্কেও হাদীস বর্ণিত আছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ

কোনো নবী যখন সুন্দর কণ্ঠে সুর করে সশব্দে কুরআন তেলোয়াত করেন আল্লাহ তা অত্যাধিক সন্তুষ্টির সাথে শ্রবণ করেন। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

زينوا القرآن بأصواتكم

তোমরা সুন্দর কণ্ঠের মাধ্যমে কুরআনকে সজ্জিত কর (তেলোয়াত করো)।

ইমাম বুখারী তার সহীহতে হাদীসটিকে সনদবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাযার আসক্কালানী ﷺ সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় হাদীসটির বিভিন্ন সনদ উল্লেখ করেছেন এবং তার কোনো কোনোটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

সুতরাং সুন্দর কথা, সুন্দর কণ্ঠে সুর করে পাঠ করাতে দোষের কিছু নেই। অতএব তা বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। একইভাবে বৈধ যে কোনো পন্থায় কোনো ভাল আমল করা হলে তা দোষনীয় নয় বরং উত্তম হিসেবেই বিবেচিত হবে। এটিই সাধারন ও স্বাভাবিক বিধান। যে সকল ওলামায়ে কিরাম নির্দিষ্ট কোনো অবস্থা ও পদ্ধতিতে কোনো ভাল আমল করা অপছন্দ করেছেন তারা ভিন্ন কোনো কারণে এটা করেছেন। আসলেই কাজটি অবৈধ এটা বোঝানোর জন্য নয়। ঐ অবস্থায় ঐ পদ্ধতিতে ভাল আমলটি করলে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে এমন মনে করে তারা বিষয়টি পরিহার করার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু এধরণের আশঙ্কা না থাকলে তারা এগুলো থেকে নিষেধ করতেন না। এর উদহরণে আহমাদ ইবনে হাম্বালের ঐ কথাটি পেশ করা যায় যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আরাফার দিনে বিভিন্ন এলাকার মসজিদে একত্রিত হয়ে দোয়া-মোনাজাত করা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

لا بأس به إنما هو دعاء وذكر الله فقيل له تفعله أنت قال : أما أنا فلا

এতে কোনো সমস্যা নেই। এটা তো দোয়া আর যিকির। তখন তাকে বলা হলো তবে আপনি কি অংশগ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, আমি নিজে এতে অংশগ্রহণ করবো না। [আল-মুগনী]

অর্থাৎ তিনি সাধারন মানুষকে এসবে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দিলেও নিজে তাতে লিপ্ত হন নি যাতে মানুষ বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে না করে। এতে প্রমাণিত হয় এভাবে একত্রিত হয়ে কোনো ভাল কাজ করা নিজে বিদয়াত নয় তবে তা থেকে বিদয়াত সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে। তাই বিদয়াত যাতে সৃষ্টি না হতে পারে এমন সতর্কতা অবলম্বন করে তাতে লিপ্ত হওয়া বৈধ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷫ এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তিনি বলেন,

أَوْ يُقَالُ فِي التَّعْرِيفِ : إِنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ أَحْيَانًا لِعَارِضٍ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ سُنَّةً رَاتِبَةً . وَهَكَذَا يَقُولُ أَئِمَّةُ الْعِلْمِ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ : تَارَةً يَكْرَهُونَهُ وَتَارَةً يُسَوِّغُونَ فِيهِ الِاجْتِهَادَ وَتَارَةً يُرَخِّصُونَ فِيهِ إذَا لَمْ يُتَّخَذْ سُنَّةً وَلَا يَقُولُ عَالِمٌ بِالسُّنَّةِ : إنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ . فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُقَالُ فِيمَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ لَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسُنَّ وَلَا أَنْ يَشْرَعَ

আরাফার দিন একত্রিত হওয়া সম্পর্কে কথা হলো ক্ষেত্র বিশেষে (যদি বিদয়াত সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে) এমন বলা যায় যে এতে কোনো সমস্যা নেই। যদি এটাকে নিয়মিত সুন্নাতে

পরিণত না করে। এ বিষয়ে এবং এই প্রকৃতির অন্যান্য বিষয়ে আলেমরা এমনটাই বলে থাকেন। তারা কখনও কখনও এধরণের বিষয়কে অপছন্দ করেন আবার কখনও কখনও এটার অনুমতি প্রদান করেন যদি সেটাকে সুন্নাতের মর্যাদা দেওয়া না হয়। তবে কোনো আলেম কখনওই এমন বলেন না যে, এসব কাজ মুসলিমদের জন্য (রাসুলুল্লাহর) সুন্নাত হিসেবে গণ্য। যেহেতু এমন কথা কেবল সেই সকল কাজের ক্ষেত্রে বলা যায় যা রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে চালু করেছেন। কারণ অন্য কারো জন্য শরীয়তের কোনো বিধান চালু করা বা শরীয়ত প্রণয়ন করার ইখতিয়ার নেই। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, যে কাজ নিজে বৈধ তা দলবদ্ধভাবে নিয়মিত আদায় করা বা সুন্দর কণ্ঠে আদায় করাও বৈধ। তবে যদি এমন আশঙ্কা থাকে, যে এভাবে আদায় করলে সাধারন মানুষ মনে করবে এভাবে আদায় করাই রাসুলুল্লাহর সুন্নাত তাহলে তাতে লিপ্ত হওয়া মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় হবে এবং তা পরিহার করাই উত্তম হবে। আর যদি কোনো ভাবে মানুষকে এমন ধারনা করা হতে বিরত রাখা যায় এবং এ থেকে অন্য কোনো অনিষ্ট সৃষ্টি না হয় তবে তাতে লিপ্ত হতে কোনো সমস্যা নেই।

উপসংহার

এ অধ্যায়ে আমরা বিদয়াতের সংজ্ঞা প্রকারভেদ ও প্রতিটি প্রকারের বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে বলা যায়, “শরীয়তের বিধান নয় এমন কোনো মতবাদ শরীয়তের নামে চালানোই হলো বিদয়াত”। বর্তমানে কিছু লোক বিদয়াতের সংজ্ঞায় বলে, সওয়াবের কাজ নয় এমন বিষয়কে সওয়াবের কাজ মনে করা বিদয়াত। এই সংজ্ঞাটি সঠিক তবে সম্পূর্ণ নয়। এখানে বিদয়াতকে আংশিকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য হলো বিদয়াতের সম্পর্ক কেবল সওয়াবের সাথে নয়। বরং পাপ-পুন্য, ফরজ-মুস্তাহাব, মাকরুহ-মোবাহ ইত্যাদি যে কোনো প্রকার বিধানের বিপরীত মতামত ব্যক্ত করাই বিদয়াত। সওয়াবের কাজ নয় এমন কাজকে সওয়াবের কাজ মনে করা যেমন বিদয়াত একইভাবে সওয়াবের কাজকে সওয়াবের কাজ মনে না করাও বিদয়াত। উদাহরণস্বরুপ বর্তমানে কিছু লোক কুরআনের অর্থ অনুধাবনের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলে, অর্থ না বুঝে সারাদিন কুরআন তেলোয়াত করলেও কোনো সওয়াব হয় না। পবিত্র কুরআনের অর্থ অনুধাবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা একটি উত্তম কাজ কিন্তু অর্থ না বুঝে কুরআন তেলোয়াত করলে কোনো সওয়াব হয় না এটি আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে একটি ভুল বুঝ। কারণ, পবিত্র কুরআনের হুরুফে মুকাত্তায়াত সমূহ যেমন আলীফ-লাম-

মীম, হা-মীম ইত্যাদি তেলোয়াত করলেও সওয়াব হয় অথচ আমরা সেগুলোর অর্থ বুঝি না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

যে কেউ আল্লাহর কিতাবের একটি হরফও তেলোয়াত করে তার জন্য একটি নেকি লেখা হয় এবং প্রতিটি নেকিকে দশ গুণ বৃদ্ধি করা হয়। আমি বলবো না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ। [তিরমিযী]

এতে প্রমাণিত হয় পবিত্র কুরআনের যে কোনো হরফ বুঝে হোক, না বুঝে হোক তিলাওয়াত করলে দশটি নেকি হয়। এধরনের একটি সওয়াবের কাজকে সওয়াবের কাজ নয় এমন মন্তব্য করা বিদয়াত। একইভাবে বৈধ কাজকে হারাম মনে করা বা হারামকে হালাল মনে করা ইত্যাদি যে কোনো বিভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাস বিদয়াত হিসেবে পরিগণিত।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বা সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنه যা কিছু করেন নি তা করা বিদয়াত। আমরা উপরে দেখেছি, এ কথাটিও পুরোপুরি সঠিক নয়। আল্লাহর রাসুল ﷺ কোনো কাজ না করলেই উক্ত কাজটি নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। যেহেতু তিনি অনেক সময় বৈধ বা এমন কি উত্তম কাজও পরিত্যাগ করতেন।

উম্মতের উপর কষ্ট হবে এমন ভেবে বা কাজটি যে আসলে ফরজ নয় তাই তা পরিত্যাগ করা যায় এমন প্রমাণ করার জন্য তিনি এটা করতেন। অতএব, আল্লাহর রাসুল ﷺ কোনো কাজ করেন নি কেবল এই কারণে কাজটিকে নিন্দনীয় প্রমাণ করা যায় না বরং দেখতে হবে তিনি উক্ত কাজ অপছন্দ করার কারণে পরিত্যাগ করেছেন নাকি ভিন্ন কোনো কারণে। সাহাবায়ে কিরাম যেসব কাজ পরিত্যাগ করেছেন সে ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। পবিত্র কুরআনে যের-যবর ও নুক্তা সংযোজন, উসুলে হাদীস ও উসুলে ফিকহ প্রণয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন উদহারণ রয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল না এমন কাজও উত্তম হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এমন বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই যে, এসব কাজ উত্তম হলে সাহাবায়ে কিরাম অবশ্যই তা করতেন। বরং একথা বলাই অধিক সঙ্গত যে, এসকল কাজ নিষিদ্ধ হলে আল্লার রাসুল এবং সাহাবায়ে কিরাম তা থেকে অবশ্যই নিষেধ করতেন।

কেউ কেউ বিদয়াতের তৃতীয় মূলনীতিটির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। তারা বিদয়াত হতে পারে এই আশঙ্কায় বহু সংখ্যক বৈধ কাজকে হারাম ঘোষণা করে থাকে। এ বিষয়ে তারা মন্দ কাজের পথ বন্ধ করার জন্য ভাল কাজ পরিত্যাগ করার মূলনীতি ব্যবহার করে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে যায়। প্রথমত তারা ভুলে যায় যে, মন্দ

কাজের আশঙ্কায় যে ভাল কাজটি পরিত্যাগ করা হচ্ছে সেটা নিজেই কোনো মন্দ কাজ নয়। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো কাজটি পরিত্যাগ করতে হচ্ছে কিন্তু এটা চিরন্তন বিধান নয়। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে উক্ত কাজটি আবার বৈধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তারা এটাও ভুলে যায় যে, মন্দ ও অনিষ্টের পথ বন্ধ করা বলতে কেবল বিদয়াতের পথ বন্ধ করা বোঝায় না। বরং এর অর্থ হলো, যে কোনো বড় ধরণের মন্দ কাজের পথ বন্ধ করার জন্য তদাপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে চলা। বিদয়াত সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কায় যেমন অনেক সময় বৈধ বা উত্তম কাজ পরিত্যাগ করা উচিৎ একই ভাবে যেসব কাজ বিদয়াত কিন্তু হারাম বা কুফর নয় বরং মাকরুহ বা খেলাফে আওলা ক্ষেত্র বিশেষে মুসলিমদের মাঝে হৈ হট্টোগোল ও হানা-হানি রদ করার জন্য বা অন্য কোনো কারণে ঐ সকল বিদয়াতের প্রতিবাদ না করা উচিৎ। একটি অনিষ্টের পথ বন্ধ করতে যেয়ে তদাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজের পথ খুলে দেওয়া সঠিক কর্ম পন্থা নয়।

এই সকল বিষয়ে সঠিক ধ্যান-ধারনা ও চিন্তা-দর্শন বিদ্যমান না থাকার কারণে বর্তমানে বিদয়াত সম্পর্কে একদিকে দেখা যায় কিছু লোক অত্যাধিক কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি করছে অপর দিকে কিছু লোক বিদয়াতের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুন।

বিদয়াতের কিছু উদাহরণ

উপরে আমরা দেখেছি বিদয়াত সম্পর্কে বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম ভুল বুঝ ও বিকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে। এইসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কারণে কোনটি বিদয়াত, কোনটি বিদয়াত নয় এ ব্যাপারেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ এমন কিছু কাজকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করছে যেগুলো আসলে উত্তম কাজ। হয়তো আলেমরা সকলে বা তাদের বেশিরভাগ অংশ ঐ সকল কাজকে পছন্দ করেছেন। বিপরীত দিকে যেসব কাজ আলেমরা সবর্সম্মতিক্রমে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন মানুষ সেগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ। এসব কাজ যে বিদয়াত হতে পারে এমন ধ্যান ধারনাই তাদের নেই। উপরে আমরা বিদয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন বিভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাসের খন্ডায়ন করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বিদয়াতের সঠিক উদাহরণ কোনগুলো সে সম্পর্কে কথা বলব। যাতে পাঠক স্পষ্ট বুঝে নিতে পারেন বর্তমান যুগে কাদের বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করা উচিৎ এবং কাকে বিদয়াতী বলা অনুচিৎ। আমরা এ সম্পর্কিত আলোচনা দুটি ভাগে বিভক্ত করবো। প্রথমেই আমরা ঐ সকল বিষয়ে আলোচনা করবো যে সম্পর্কে বর্তমানে ব্যাপক বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এক পক্ষ ঐ সকল বিষয়কে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে হারাম ও নিকৃষ্ট কাজ হিসেবে ঘোষণা

করছে অন্য পক্ষ এসব বিষয়কে উত্তম বা কমপক্ষে বৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করে সাধরন মানুষকে তাতে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করছে। আমরা উপরে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে এ বিষয়ে সঠিক কর্মপদ্ধতি কি তা নির্ণয় করার চেষ্টা করবো। এরপর আমরা বিদয়াতের এমন কিছু উদাহরণ উল্লেখ করবো যেগুলো নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় বিদয়াত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তী সকল ওলামায়ে কিরাম একমত কিন্তু বর্তমানে বিদয়াত সম্পর্কে ভুল বুঝ সৃষ্টি হওয়ার কারণে মানুষ সেসব বিষয়কে বিদয়াত মনে করে না। পরিশেষে এই উভয় প্রকার বিষয়ের কোনটির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া উচিৎ আমরা সে বিষয়েও সংক্ষেপে কিছু নির্দেশনা দিয়ে আলোচনার ইতি টানবো ইনশা-আল্লাহ।

** যেসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিদয়াতী ও পথভ্রষ্ট বলা সঠিক নয়।*

বর্তমানে যারাই বিদয়াত সম্পর্কে আলোচনা করে বা বিদয়াতের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার দাবী করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ছোট-খাটো ও অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অত্যাধিক বাড়াবাড়ি করে থাকে। বিদয়াত বলতে তারা মীলাদ, মোনাজাত, শবে বরাত, ঈদে মীলাদুন্নাবী, আল্লাহ আল্লাহ বলে যিকির করা, পবিত্র কুরআনে চুম্বন করা, মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা ইত্যাদি বিষয়কে বুঝিয়ে থাকে। আল্লাহর রাসুল ﷺ বিদয়াত

সম্পর্কে যেসব সতর্কবার্তা উল্লেখ করেছেন তারা সেগুলো এই সকল বিষয়ের উপর প্রয়োগ করে। উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি এই সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনোরূপ যৌক্তিকতা নেই। যদি এসব বিষয়ের কোনোটির মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কিছু পাওয়া যায় তবে তা পরিত্যাক্ত হবে অন্যথায় এগুলো মূলত বৈধ তবে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এগুলোর কোনো কোনোটি অপছন্দনীয় বলে গণ্য হতে পারে। উপরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে। এই সকল বিষয়ে আমাদের কী পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ সে আলোচনাও গত হয়েছে। সাধারন ভাবে এতটুকু আমরা জেনেছি যে, কোনো বিষয় কেবল নতুন হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় হবে এমন নয়। বরং দেখতে হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে কাজটি গ্রহণযোগ্য নাকি অগ্রহণযোগ্য। যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো কাজ উত্তম হিসেবে গণ্য হয় তবে কেবল রাসুল করেন নি বা সাহাবায়ে কিরাম করেন নি এই যুক্তিতে তা বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না। কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন বিষয় আমাদের সামনে আসবে এই মুলনীতির আলোকে তার উপর বিধান প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং সকল নতুন বিষয়ে পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এসব বিষয়ের মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে বর্তমানে অত্যাধিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ সকল বিষয়ের পক্ষে

বিপক্ষে নানা রকম যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করা হচ্ছে। এই সকল বিষয়ের উপর সংক্ষেপে কিছু আলোচনা পেশ করা অধিক কল্যাণকর হবে বলে মনে হয়। নিচে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো।

১. মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (إنما الأعمال بالنيات) “সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল” [সহীহ বুখারী] এই হাদীসের কারণে সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, সলাত, সওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সকল ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত। কিন্তু নিয়ত বলতে বোঝায় অন্তরে সংকল্প করা, মুখে উচ্চারণ করা শর্ত নয়। মুখে উচ্চারণ করা যে শর্ত নয় এ ব্যাপারে সকলে একমত। যদি কেউ মনে করে মুখে নিয়ত উচ্চারণ না করলে ইবাদত কবুল হবে না তবে এটা বিদয়াত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন যদি কেউ স্বীকার করে যে, মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা শর্ত নয় তবু মুখে নিয়ত উচ্চারণ করে তার বিধান কি হবে? এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত হয়েছে। একদল আলেম বলেছেন, এটা বিদয়াত হবে অন্য একদল আলেম বলেছেন এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে পরবর্তী যুগের বেশিরভাগ আলেম বলেছেন এটা বৈধ। ‘চার মাজহাবের ফিকাহ’ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে,

يسن أن يتلفظ بلسانه بالنية، كأن يقول بلسانه أصلي فرض الظهر مثلاً، لأن في ذلك تنبيهاً للقلب

মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা উত্তম। যেমন হয়তো কেউ বলল, আমি জোহরের ফরজ সলাত আদায় করার নিয়ত করছি। কেননা এর মাধ্যমে অন্তরকে সজাগ রাখা যায়।

এরপর তিনি বলেন, (وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة) এ বিধানের ব্যাপারে শাফেয়ী ও হাম্বালী মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম একমত।

পরবর্তীতে তিনি মালেকী ও হানাফী মাজহাবের মতামত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তারা বলেছেন, সাধারন ভাবে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা অনুত্তোম তবে যে ব্যক্তির অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় (নিয়ত করেছে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়) তার ক্ষেত্রে মুখে উচ্চারণ করাই উত্তম।

তবে হানাফী ও মালেকী মাজহাবের পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরামের বেশিরভাগ অংশ নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার পক্ষে রায় দিয়েছেন।

ইবনে নুজাইম বলেন,

وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ الْمَشَايِخِ فِي التَّلَفُّظِ بِاللِّسَانِ فَذَكَرَهُ فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَهُو الْمُخْتَارُ

হানাফী মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম মুখে নিয়ত উচ্চারণের ব্যাপারে দ্বিমত করেছেন। মুনইয়াতুল মুছল্লী নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটা মুস্তাহাব আর এই মতটিই গ্রহণযোগ্য। [বাহরে রায়েক]

আয-যাইলায়ী বলেন, وَأَمَّا التَّلَفُّظُ بِهَا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَكِنْ يَحْسُنُ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِه

নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা শর্ত নয় তবে এটা উত্তম। কেননা এর মাধ্যমে অন্তরের সংকল্প দৃঢ় হয়।

[তাবঈনুল হাক্বাইক্ব]

মোল্লা আলী ক্বারী আল-হানাফী বলেন,

فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مُسْتَحَبٌّ لِيَسْهُلَ تَعَقُّلُ مَعْنَى النِّيَّةِ، وَاسْتِحْضَارُهَا

বেশিরভাগ আলেম বলেছেন, অন্তরে নিয়ত করার পাশা-পাশি মুখে উচ্চারণ করাও উত্তম যাতে করে নিয়তের অর্থ অনুধাবন করা এবং মনে রাখা সহজ হয়। [আল-মিরকাত]

যারা বলে, রাসুলুল্লাহ ﷺ মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেন নি তাই এটা করা উচিৎ নয় তাদের জবাবে তিনি বলেন,

نسلم إنها بدعة لكنها مستحسنة

আমরা এটা মানি যে, এটা (মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা) বিদয়াত (নতুন সৃষ্ট বিষয় যা রাসুলের যুগে ছিল না) তবে এটা উত্তম বিদয়াত। [আল মিরকাত]

মালেকী মাজহাবের ফিকাহ গ্রন্থ আশ-শারহুল কাবীরে বলা হয়েছে,

تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول: نويت صلاة فرض الظهر مثلا (واسع) أي جائز بمعنخلاف الاولى، والاولى أن لا يتلفظ لان النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها

সলাত আদায়ের সময় যদি মুছল্লী বলে আমি জোহরের ফরজ সলাত আদায়ের নিয়ত করছি বা এমন কিছু বলে তবে তা বৈধ হবে কিন্তু এটা না করাই উত্তম। যেহেতু নিয়তের স্থান হলো অন্তর, মুখে উচ্চারণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

আল্লামা দুসুকী উপরোক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তির অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হয় তার ক্ষেত্রে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করাই উত্তম হবে।

শাফেয়ী মাজহাবের প্রখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ আল-মাজমুতে ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب ولا يجب اللفظ باللسان معها: ولا يجزئ وحده وان جمعها فهو آكد وأفضل هكذا قاله الاصحاب واتفقوا عليه

ওযুতে যে নিয়ত ফরজ তা হলো অন্তরে সংকল্প করা মুখে উচ্চারণ করা ফরজ নয়। কেবল মাত্র মুখে উচ্চারণ করলে (যদি অন্তরে সংকল্প না থাকে) যথেষ্ট হবে না। আর যদি দুটো এক সাথে করে (অন্তরে সংকল্প করে এবং মুখে নিয়ত করে) তবে তা বেশি শক্ত ও অধিক উত্তম বলে বিবেচিত হবে। আমাদের সাথীরা (শাফেয়ী মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম) এই মত দিয়েছেন এবং এর উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

শাফেয়ী মাজহাবের অন্য একটি ফিকাহ গ্রন্থ ‘আসনাল মাতালিব’–এ ওজুর সময় মুস্তাহাব কাজগুলো কি কি সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

(وَالتَّلَفُّظُ بِهَا) لِيُسَاعِدَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ

এবং মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা যাতে এর মাধ্যমে অন্তরের সংকল্প দৃঢ় হয়।

হাম্বালী মাজহাবের ফিকাহগ্রন্থ আল-ইনসাফে বলা হয়েছে,

لَا يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَ : هُوَ الصَّوَابُ ، الْوَجْهُ الثَّانِي : يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِهَا سِرًّا وهو المذهب

এক মতে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা মুস্তাহাব নয় ইমাম আহমাদ থেকে এই মতটি সরাসরি বর্ণিত আছে। শায়েখ তাক্বী উদ্দীন এটা উল্লেখ করেছেন এবং এই মতটিকে তিনি সঠিক বলেছেন।

দ্বিতীয় মতে অনুচ্চ স্বরে নিয়ত উচ্চারণ করা মুস্তাহাব এটিই আমাদের মাজহাব (হাম্বালী মাজহাব)।

কাশফুল কিনা নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে,

وَاسْتَحَبَّهُ أَيْ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ سِرًّا مَعَ الْقَلْبِ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ

মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার বিষয়টিকে পরবর্তী যুগের বহু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম পছন্দ করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা বা না করা সম্পর্কে ওলামায়ে কিরাম দ্বিমত করেছেন। বিষয়টির পক্ষে বিপক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলেমের মতামত রয়েছে। আমাদের বক্তব্য হলো এধরণের একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলিমদের পথভ্রষ্ট বা বিদয়াতী আখ্যায়িত করা যাবে না। একারণে কারো উপর কঠোরতাও করা যাবে না। আমরা কেবল সেই ব্যক্তিকে নিন্দা করবো যে মুখে নিয়ত করা ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত মনে করে। সেই সাথে সাধারন মানুষকে আমরা শেখাবো যে, মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা আবশ্যক কোনো বিষয় নয়। তবে আবশ্যক মনে না করে কেউ এটা করলে তাকে আমরা নিন্দা করবো না। এসব বিষয় নিয়ে আমরা মুসলিমদের মাঝে দলাদলি বা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করবো না। আল্লাহ আমাদের সৎ পথে পরিচালিত করুন।

২. ঈদে মীলাদুন্নাবী।

বর্তমান যুগে যেসব বিষয়কে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হয় তার মধ্যে ঈদে মীলাদুন্নাবী অন্যতম। যারা বিদয়াত নিয়ে আলোচনা করেন তাদের বেশিরভাগ অংশই সর্বাগ্রে ঈদে মীলাদুন্নাবীকে বিদয়াতের জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। 'ঈদ' (عيد) শব্দটির সরল অর্থ হলো 'বাৎসরিক উৎসব' আর মীলাদ (ميلاد) অর্থ জন্মের সময় বা জন্মদিন। সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নাবী অর্থ হলো আল্লাহর রাসুলের জন্মদিন উপলক্ষে বাৎসরিক ভাবে উৎসব করা। আল্লাহর রাসুলের দুনিয়াতে আগমণের বিষয়টি যে একটি খুশির সংবাদ সে ব্যাপারে কেউই সন্দেহ করতে পারে না। সুতরাং এই খুশিতে কিছু আনন্দ উৎসব (অবশ্যই তা বৈধ পন্থায়) করা হলে তা কেনো বিদয়াত হবে সেটা স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন যে কারও নিকট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আল্লাহর রাসুল দুনিয়াতে আগমণ করেছিলেন একারণে খুশি হয়ে আনন্দ প্রকাশ করা পাপের কাজ হবে এমন উদ্ভট কথা সাধারন বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। সম্ভবত একারণেই অনবরত ফতোয়াবাজীর পরও আল্লাহর ইচ্ছায় বেশিরভাগ মুসলিম আজ পর্যন্ত রাসুলের জন্মদিবসে উৎসবের আয়োজন করে থাকে। সকল প্রসংশা আল্লাহর।

যারা বিষয়টিকে অপছন্দ করেন তারা বেশ কিছু যুক্তি উপস্থাপণ করে থাকেন। এখানে তাদের যুক্তিগুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করে সদুত্তর প্রদানের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

ক. আল্লাহর রাসুলের জন্মদিবস পালন করার বিপক্ষে মৌলিকভাবে যে যুক্তিটি উপস্থাপণ করা হয় তা হলো আল্লাহর রাসুল নিজে বা তার সাহাবায়ে কিরাম এটা পালন করেন নি। যদি এটা ভাল কিছু হতো তবে তারা অবশ্যই তা পালন করতেন। আমরা কি রাসুলকে সাহাবায়ে কিরামের চেয়ে অধিক ভালবাসি!

এসব যুক্তি অনেকের নিকট খুবই চমকপ্রদ মনে হয়। সাধারনত ইসলাম সম্পর্কে কম জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তিরাই এসব যুক্তিতে অধিক বিভ্রান্ত হয়। পূর্বে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তার আলোকে এই যুক্তিটির অসারতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখেছি রাসুলুল্লাহ ﷺ বা তার সাহাবায়ে কিরাম কোনো কাজ করেন নি এর অর্থ এই নয় যে কাজটি হারাম বা নিষিদ্ধ। যেহেতু অনেক সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তম কাজও পরিত্যাগ করতেন। তাছাড়া আল্লাহর রাসুল বা সাহাবায়ে কিরাম করেন নি এমন বহু বিষয় পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমতের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন যেসব বিষয়ের উদাহরণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব দলিল-প্রমাণের কারণে মুসলিম উম্মাহর ওলামায়ে দ্বীনের নিকট সঠিক রায় হলো,

রাসুলের যুগে ছিল না বা সাহাবায়ে কিরামের যুগে ছিল না কেবল এই যুক্তিতে যে কোনো বিষয়কে নিন্দা করা যাবে না বরং দেখতে হবে বিষয়টি শরীয়তের মুলনীতিতে গ্রহণীয় নাকি বর্জনীয়।

এই মূলনীতির আলোকে চিন্তা করলে আমরা দেখবো আল্লাহর রাসুলের জন্মোৎসব পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অতি উত্তম একটি আমল যার বিরোধিতা করা মারাত্মক অন্যায়। প্রথমত রাসুল ﷺ এর জন্ম আল্লাহর পক্ষ হতে একটি বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া। যেহেতু আল্লাহ তাকে সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শক ও মুক্তির আলোকবার্তিকা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}

আমি তো আপনাকে জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরণ করেছি। [আম্বিয়া/১০৭]

আর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া পাওয়ার পর খুশি হওয়া একটি সৎ স্বভাব। স্বয়ং আল্লাহর রব্বুল আলামীন তার দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির পর খুশি হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

{قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}

হে নবী আপনি বলুন এটা (কুরআন অবতীর্ণ হওয়া, হেদায়েত পাওয়া ইত্যাদি বিষয়) আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া। অতএব তারা একারণে আনন্দিত হোক। [ইউনুস/৫৮]

সুতরাং, একথা বলার অধিকার কারো নেই যে, আমি রাসুলের জন্ম গ্রহণে খুশি হয় নি। এটা যে বলে তার ঈমান-আক্বীদা সুরক্ষিত নয়। এমনটি কেউ বলেও না। এখানে কিছু লোকের বক্তব্য হলো আনন্দ করতে দোষ নেই তবে সেটা হতে হবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরামের দেখানো পথে। যে পদ্ধতিতে তারা উৎসব করেন নি সে পদ্ধতিতে উৎসব করা যাবে না। উদাহরণস্বরুপ তারা বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন একারণে তিনি সেদিন সওম পালন করার কথা বলেছেন অতএব কেউ যদি রাসুলের জন্মদিন পালন করতে চায় তবে সওম পালন করুক। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই যুক্তিটি সঠিক মনে হলেও এখানে একটি বড় ধরণের ফাঁক রয়েছে। প্রকৃত কথা হলো, আনন্দ প্রকাশ করা যদি বৈধ হয় তবে যে যার ইচ্ছা মত যে কোনো বৈধ পন্থায় আনন্দ প্রকাশ করার অধিকার পাবে এটিই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ শরীয়তে দুই ঈদের দিন আনন্দ প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম কেউ দফ বাজিয়ে, কেউ তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগীতা করে আনন্দ প্রকাশ করেছেন বলে প্রমাণ আছে। তারা এভাবে আনন্দ প্রকাশের পূর্বে রাসুলের নিকট অনুমতি নেওয়ার

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। তবে রাসুল ﷺ তাদের এসব কাজকে নিন্দা করেন নি। এখন মুসলিমরা বিভিন্নভাবে ঈদের আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। বন্ধু-বান্ধবদের দা'ওয়াত দেওয়া, তাদের বাসায় বেড়াতে যাওয়া, মোটর সাইকেল বা অন্য কোনো যানবাহনে দলবদ্ধভাবে ভ্রমণে বের হওয়া, পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ভ্রমণ করে বাড়ি ফিরে আসা ইত্যাদি। সাহাবায়ে কিরাম বিশেষভাবে ঈদ উপলক্ষে মানুষকে দা'ওয়াত করে খাইয়েছেন বা প্রমোদ ভ্রমণ করেছেন এমন প্রমাণ যদি না-ই পাওয়া যায় তবু কি এগুলো বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত হবে? বিয়ের অনুষ্ঠানে শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে আনন্দ-ফূর্তি করার ব্যাপারে শরীয়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর অর্থ কি এই যে হুবহু যেভাবে সাহাবায়ে কিরামের যুগে বিবাহ অনুষ্ঠান পালন করা হতো সেভাবে পালন করতে হবে নাকি শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে যে কোনো বৈধ পন্থায় তা করা যায়? উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশে বিয়ে উপলক্ষে গেট সাজানো হয়, বাসর সাজানো হয়, গাড়ি বহর নিয়ে বরযাত্রী আসে ইত্যাদি। হুবহু এই ভাবে সাহাবায়ে কিরাম বিবাহ অনুষ্ঠান করেছেন বলে প্রমাণিত নেই। তাহলে কি এগুলো বিদয়াত হবে? প্রকৃত সত্য হলো, যদি প্রতিটি পদে পদে এভাবে মানুষকে বিদয়াতের ভয় দেখানো হয় তবে তারা আনন্দিত হওয়ার চেয়ে

আতংকিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আনন্দ প্রকাশের অর্থই হলো নিজের মনের ভাব মোটামুটি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা। বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও জাতির নিজস্ব কিছু রসম-রেওয়াজ ও কৃষ্টি-কালচার রয়েছে। তারা সেগুলোর উপর নির্ভর করে আনন্দ-ফুর্তি প্রকাশ করে থাকে। যদি তার মধ্যে হারাম কিছু থাকে তবে তা থেকে তাদের নিষেধ করা হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেগুলো হারাম নয় যদি সেগুলো থেকেও নিষেধ করা হয় তবে সেটা কখনও আনন্দ প্রকাশ বলে গণ্য হতে পারে না।

আল্লাহর রাসূলের জন্ম দিবস উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের বিষয়টি কিছুমাত্র ব্যাতিক্রম নয়। আনন্দ মিছিল, সীরাত মাহফিল, হামদ-নাত, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি যে কোনো বৈধ পন্থায় এটা পালন করাতে দোষের কিছু নেই। উপরে উল্লেখিত একটি হাদীস এ বিষয়ে শিক্ষণীয়। আমরা দেখেছি, কোনো এক যুদ্ধ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিরাপদে বিজয়ী অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলে একজন মহিলা সাহাবী নিয়ত করেন তার সামনে দফ বাজিয়ে গান করে আনন্দ প্রকাশ করবেন। রাসুলুল্লাহ দফ বাজিয়ে গান করার বিষয়টি অপছন্দ করা স্বত্ত্বেও যেহেতু বিষয়টি বৈধ তাই এটার অনুমতি দেন। এখানে আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম কি হবে তা কিন্তু উক্ত মহিলা সাহাবী নিজেই ঠিক করে নিয়েছিলেন। আপনাদের কি মনে হয়, যদি তিনি কুরআন তেলোয়াত, দোয়া-

দরুদ পাঠ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তবে কি রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে নিষেধ করতেন? স্বাভাবিক বুদ্ধির যে কারও নিকট এটা স্পষ্ট যে তিনি তাকে নিষেধ করতেন না। সুতরাং আল্লাহর রাসুলের আগমণ উপলক্ষে খুশি হয়ে যে কোনো বৈধ পন্থায় আনন্দ প্রকাশ করা হতে নিষেধ করার আদৌ কোনো কারণ নেই। বরং এটা অত্যাধিক ফজিলত পূর্ণ কাজ হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে আবু লাহাব রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম উপলক্ষে খুশি হয়ে একটি দাসী মুক্ত করে। পরবর্তীতে তার পরিবারের কেউ স্বপ্ন দেখে যে একারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের মধ্যে সামান্য পরিমাণ পানি পান করার সুযোগ দেন। এটা একটি স্বপ্ন যা ভুলও হতে পারে ঠিকও হতে পারে কিন্তু আল্লাহর রাসুলের জন্ম উপলক্ষে কোনো মুসলিম যদি খুশি হয় তবে তার ব্যাপারে সুউচ্চ সম্মান লাভের সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে সঠিক। একারণে ইমাম সুয়ূতী এই হাদিসটিকে রাসুলের জন্ম দিন পালন করার স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

খ. এখানে আরেকটি সংশয় প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলে, রাসুলের জন্মদিন ১২ ই রবিউল আওয়াল কিনা সেটা তো নিশ্চিত নয় বরং বহু সংখ্যক আলেমের মতে অধিক সঠিক মত হলো ৮ তারিখ বা ৯ তারিখ। সুতরাং ১২ তারিখ রাসুলের জন্ম দিন পালন করা কিভাবে সঠিক হয়। কেউ কেউ আবার

বিষয়টিকে অধিক শক্ত করার জন্য বলে, বর্তমানে জ্যোতির্বিদ্যার উপর অভিজ্ঞ কোনো কোনো পন্ডিত গবেষণা করে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, রাসুলের জন্ম রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে হতে পারে না। সুতরাং পূর্বে এ বিষয়ে কিছু দ্বিমত থাকলেও এখন আর দ্বিমত করার সুযোগ নেই। এর সাথে কেউ কেউ এটাও যোগ করে যে, ১২ ই রবিউল আওয়ালে তো রাসুল ﷺ মুত্যুবরণ করেন বলে বর্ণিত আছে সুতরাং ঐ দিন আনন্দ-উৎসব করলে তো রাসুলের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (إنما الأعمال بالنيات) “নিঃসন্দেহে নিয়ত অনুযায়ী কাজের বিচার হবে।” যারা ১২ ই রবিউল আওয়াল এ আনন্দ উৎসব করে তারা রাসুলের জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে নাকি তার মৃত্যু উপলক্ষে সেটা খুবই স্পষ্ট। আল্লাহ তাদের নিয়ত সম্পর্কে অবহিত এবং সে অনুযায়ীই তাদের বিচার করবেন। ১২ ই রবিউল আওয়ালে প্রকৃতই রাসুলের জন্ম হয়েছিল কিনা সেটা এখানে কোনো সমস্যা হিসেবে গণ্য নয়। বিভিন্ন হাদীসে ২৭ শে রমজান কদরের রাত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রাখে এমন বলা হয়েছে এবং কদর রাত যারা তালাশ করে তাদের বিশেষভাবে ২৭ তারিখে ইবাদত বন্দেগী করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন যদি কেউ ব্যাস্ততা বা অন্য কোনো কারণে পুরো রমজান মাস বা রমজান মাসের শেষ দশকে অতিরিক্ত ইবাদত বন্দেগী

না করে কেবল ২৭ তারিখে ইবাদত বন্দেগী করে আর ঘটনাক্রমে ঐ দিন শবে কদর না হয় তবে কি এই ব্যক্তি গোনাহগার হবে! এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো ঐ ব্যক্তি যদি শবে কদরের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় তবু শবে কদর তালাশ করার কারণে আল্লাহ তাকে পুরষ্কৃত করবেন। রাসুলের জন্ম দিন সম্পর্কে আলেমরা মতপার্থক্য করেছেন। ৮, ৯, ১২ ইত্যাদি দিনগুলোর মধ্যে কোনটি যে রাসুলের জন্ম দিন সেটা নিঃশ্চিত করে বলা যায় না। এ মতপার্থক্য কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। দু একজন পণ্ডিত এখন জ্যোতির্বিদ্যার উপর গবেষণা করে একটা রায় দিলেই পুরো মুসলিম উম্মাহ তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে এমন কখনও নয়। এধরণের দাবী করা স্পষ্ট বোকামী ছাড়া কিছু নয়। অতএব, যে ব্যক্তি রাসুলের জন্ম দিন মনে করে ১২ তারিখে আনন্দ প্রকাশ করে যদি ঐ দিন রাসুলের জন্ম দিন হয় তবে তো উত্তম আর যদি তা না হয় তবু এই ব্যক্তি নুন্যতম কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কেউ ইজতিহাদ করে এবং তার রায় সঠিক হয় তার দুটি সওয়াব হয় আর যদি তার রায় ভুল হয় তবে তার একটি সওয়াব হয়।

কেউ কেউ বলে, রাসুলূল্লাহ ﷺ ১২ ই রবিউল আওয়ালে জন্ম গ্রহণ করেছেন কিনা এ বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও ঐ দিন তিনি যে মৃত্যুবরণ করেছেন এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। একথা

অজ্ঞ লোকেরা বলে। সত্য কথা হলো রাসুলুল্লাহ এর জন্ম দিন সম্পর্কে যেমন দ্বিমত রয়েছে তার ওফাতের দিন সম্পর্কেও দ্বিমত রয়েছে। অনেক সীরাত গ্রন্থাকার ১২ ই রবিউল আওয়াল রাসুলের মৃত্যু দিন হতে পারে না এমন মন্তব্য করেছেন। আস-সুহাইলি তার সীরাত গ্রন্থ 'আর-রাওদ আল-উনুফ'-এ বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এসব বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে চায় না। আমাদের কথা হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্মের মাধ্যমে যে কল্যাণ আমরা পেয়েছি তা কি তার মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে? নিশ্চয় তা নয়। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও মৃত্যুবরণের মাধ্যমে শেষ হয়ে যান নি বরং তিনি মহান রবের সান্নিধ্যে সুউচ্চ সম্মান ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। আল্লাহর রাসূলের জন্ম বা মৃত্যু দুটোই আমাদের জন্য কল্যাণময়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

حياتي خير لكم تحدثون وتحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم

আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণময়। তোমরা আমার সাথে কথা বলছো আমিও তোমাদের সাথে কথা বলছি। একইভাবে আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য কল্যাণময়। তোমাদের আমল আমার সামনে পেশ করা হবে যদি ভাল কিছু দেখি তবে তো

আল্লাহর প্রসংশা করবো আর যদি খারাপ কিছু দেখি তবে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। [বাযযার]

আল-হাইছামী বলেছেন হাদীসটির রাবীরা সহীহ হাদিসের রাবী।

অতএব, রাসুলের জন্ম ও মৃত্যুকে একত্রিত করলে শোকে শোকিভূত হওয়ার তুলনায় আনন্দে আভিভূত হওয়াটাই যৌক্তিক।

ইমাম সুয়ূতী এ বিষয়ে আরো একটি উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শরীয়ত শোক-দুঃখ প্রকাশ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে না বরং তা গোপন করতে নির্দেশ দেয় কিন্তু আনন্দিত হলে তা প্রকাশ করার ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে। তাই রাসুলের ওফাতে আমরা ব্যাথিত হলেও সে কারণে শোক মিছিল বের করা উচিৎ নয়। তবে তার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করতে বাধা নেই।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}

আপনার রবের নেয়ামত সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করুন।
[দোহা/১১]

গ. কেউ কেউ বলে, জন্ম দিবস পালন করার বিষয়টি বিজাতীয় প্রথা। খৃষ্টানরা ঈসা عليه السلام এর জন্ম দিবস পালন করে। সম্ভবত

তাদের অনুসরণেই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম দিন পালনের রেওয়াজ শুরু হয়েছে। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের ভিন্ন সম্প্রদায়কে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে কেউ কোনো সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত। [আবু দাউদ]

অন্যান্য হাদীসের মতো এই হাদীসটিও এরা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। একটা সহজ প্রশ্নের মাধ্যমেই বিষয়টি সমাধান করা যায়। প্রশ্নটি হলো,

- ভিন্ন সম্প্রদায়কে অনুসরণ করা বলতে কি বোঝায়? তারা যা করে তা করা নাকি তারা যেভাবে করে সেভাবে করা?

উদাহরণসরূপ ইয়াহুদীরা টুপি পরিধান করে আমরাও টুপি পরিধান করি কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মাথা ঢেকে টুপি পরিধান করি আর তারা কেবল মাথার উপরের অংশটি আবৃত করার মতো ছোট আকারের টুপি পরিধান করে। এখানে মুসলিমরা ইয়াহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রেখেছে একথা বলার সুযোগ আছে কি?

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় এটা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখা বলতে বোঝায় যেসব বিষয়

তাদের প্রতীক ও পরিচয় হিসেবে গণ্য ঐ সকল বিষয়ে তাদের হুবহু অনুকরণ করা। কোনো একটি কাজ তারা যেভাবে করে তার চেয়ে ভিন্নভাবে করা কখনও অনুকরণ বলে গণ্য হতে পারে না।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে গমণ করে দেখলেন ইয়াহুদীরা আশুরার দিন সওম পালন করে। তিনি প্রশ্ন করলে তারা বলে, এই দিন মুসা عليه السلام ফিরআউনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তাই আমরা এ দিন সওম পালন করি। এটা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِصَوْمِهِ

আমরা তোমাদের চেয়ে মুসার বেশি আপন।

এরপর তিনি মুসলিমদের ঐ দিন সওম পালন করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে তিনি ইয়াহুদীদের সাথে অমিল রাখার জন্য আশুরার আগে বা পরে একদিন অতিরিক্ত সওম পালনের নির্দেশ দেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে ইয়াহুদীরা যার জন্য সওম পালন করতো, যে কারণে সওম পালন করতো এবং যেদিন সওম পালন করতো এই সকল বিষয়ে মিল থাকা সত্ত্বেও কেবল সওমের সংখ্যার পার্থক্যের কারণে বিষয়টিকে অনুকরণ হিসেবে গণ্য করা

হয়নি। আর রাসুলের জন্ম দিন পালন করার ব্যাপারে খৃষ্টানদের সাথে অমিল এর তুলনায় অনেক বেশি। খৃষ্টানরা ঈসা ﷵ এর জন্ম দিন পালন করে আর আমরা মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্মদিন পালন করছি, তারা যেদিন পালন করে আমরা ভিন্ন দিনে পালন করছি, তারা সূর্যের হিসাবে পালন করে আমরা করছি চন্দ্রের হিসাবে, তারা ঐ দিন মদ পান, অবৈধ প্রেম-প্রিতী, নাচা-নাচি, গান-বাজনা ইত্যাদি সর্বপ্রকারের পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করে আর আমরা সীরাত মাহফিল, দোয়া-দরুদ পাঠ, যিকির-আযকার, হামদ-না’ত ইত্যাদি উত্তম কর্মের মাধ্যমে রাসুলের জন্মোৎসব পালন করি। সর্বোপরি ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করার কারণে কেউ আমাদের ভুল করে খৃষ্টান মনে করে না বরং এর মাধ্যমে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের বিপরীত একটি ধর্ম তথা মুহাম্মাদ ﷺ এর অনুসারী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী একদল মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীবাসী নতুন করে জানতে পারে। এরপও যারা বিষয়টিকে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের অনুকরণ বলে নিন্দা করে তাদের বোধ-বুদ্ধি যে বেজায় নিচু পর্যায়ের তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ঘ. অনেকে বলেন, ইসলামে দুটি ঈদ নির্ধারন করা হয়েছে, এর বাইরে তৃতীয় কোনো ঈদ পালন করা বিদয়াত। আমি জানি না তারা তৃতীয় কোনো ঈদ পালন করা বলতে কি বোঝায়? তারা কি অন্য যে কোনো দিনে উৎসব করা নিষিদ্ধ মনে করে নাকি অন্য কোনো দিনকে ঈদ নাম করণ করার বিরোধিতা করে?

যদি তারা বলে রাসুলের জন্ম উপলক্ষ্যে উৎসব করা তো বৈধ তবে এ দিনকে ঈদে মীলাদুন্নাবী নামকরণ করা উচিৎ নয়। কারণ মুসলামনদের ঈদ দুইটি। তবে আমরা বলবো, কোনো কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পূর্বে কমপক্ষে শরীয়তের প্রাথমিক মূলনীতিগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। কোনো একটি শব্দকে মুতলাকান (مطلقا) তথা সাধারনভাবে প্রয়োগ করা আর মুক্বইয়াদান (مقيدا) বা মুদাফান (مضافا) তথা কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কিত করে প্রয়োগ করার বিধান কি কখনও এক হতে পারে! উদাহরণ স্বরূপ যে কোনো প্রকার পানি দ্বারা ওযু করা বৈধ। কিন্তু ডাবের পানি বা গোলাপ পানি দিয়ে ওযু করা বৈধ নয়। কারণ এগুলো আসলে পানি নয়। তাই ডাব বা গোলাপের সাথে সম্পর্কিত করে ছাড়া সরাসরি কখনও এগুলোকে পানি বলা হয় না।

পবিত্র কুরআনে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্যে সলাত (দরুদ) পাঠ করতে বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কোনো সাহাবার উদ্দেশ্যে সরাসরি দরুদ পাঠ করা সঠিক নয় কিন্তু রাসুলের উপর দরুদ পাঠ করার সময় তার নামের সাথে তার পরিবার, সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারন মুসলিমদের সংযুক্ত করা বৈধ। গাভীর পেটে যে বাচ্চা আছে তা জন্ম নেওয়ার পূর্বেই পেটে থাকা অবস্থায় বিক্রি করা বৈধ নয় যেহেতু তার অবস্থা সম্পর্কে

আমরা কেউ জানি না। কিন্তু গাভীটি বিক্রি করার সময় তার পেটের বাচ্চাটির কারণে অধিক মূল্য গ্রহণ করা বৈধ।

যারা ঈদে মীলাদুন্নাবী নাম করণের বিরোধিতা করে তারাই আবার নাফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ ইত্যাদি শব্দ বেশি বেশি ব্যবহার করে। অথচ শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলতে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করাকে বোঝায়। তবে নফসের জিহাদ বা কলমের জিহাদ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা আমরা নিষিদ্ধ মনে করি না। কেননা এটা নফস বা কলমের সাথে সম্পর্কিত করেই কেবল ব্যাবহার করা হয় সাধারন ভাবে কেবল জিহাদ শব্দটি উচ্চারণ করা হলে সদা-সর্বদা তরবারীর জিহাদই বোঝায়। এই দুটি প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে ব্যপক পার্থক্য রয়েছে।

মোট কথা ঈদ শব্দটি যখন সরাসরি উল্লেখ করা হয় তখন কেবল দুই ঈদকে বোঝায়। যখন আমরা বলি, বছরে ঈদ কয়টি? একটি ছোট বাচ্চাও উত্তর দেবে দুইটি। কিন্তু যদি বলা হয় সাপ্তাহিক ঈদ কোনটি তবে উত্তর হবে জুময়ার দিন। প্রশ্ন হলো জুময়ার দিন যদি ঈদ হয় তবে তো বৎসরে ঈদ হয় ৫৪ টি। আসল কথা হলো জুময়ার দিনকে ঈদ বলা হচ্ছে বিশেষ (মুক্বয়্যাদ) অর্থে সাধারন (মুতলাক) অর্থে নয়। একইভাবে রাসুলের জন্মোৎসবকে সরাসরি কখনও ঈদ বলা হয় না। সাধারনভাবে কেউই এটা বলে না যে মুসলমানদের তিনটি ঈদ। তবে রাসুলের জন্মোৎসবের সাথে সম্পর্কিত করে ঈদ শব্দটি

প্রয়োগ করা হয়। ‘‘রাসুলের জন্মের উৎসব’’ এই কথাটি আরবীতে প্রকাশ করার জন্য বলা হয় ঈদে মিলাদুন্নাবী (عيد ميلاد النبي)। এই নামকরণে কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো যারা ঈদে মীলাদুন্নাবী নামকরণের বিপক্ষে কথা বলে তারা কিন্তু কেবল নামকরণের বিরোধী নয় বরং রাসুলের জন্ম উপলক্ষে যে কোনো প্রকার উৎসবের আয়োজন করাকেই তারা বিদয়াত বলে। তাদের কথা হলো, আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য ইসলামে দুটি ঈদ নির্ধারন করে দেওয়া হয়েছে। অতএব, এর বাইরে কোনো উপলক্ষে আনন্দ ফূর্তি করা যাবে না। কেবল নির্বোধ লোকেরাই এভাবে চিন্তা করতে পারে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ

রোজাদার ব্যক্তির দুটি আনন্দের সময়। যখন যে ইফতার করে আর যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। [বুখারী ও মুসলিম]

এর অর্থ কি এই যে, রোজাদার ব্যক্তি অন্য কোনো সময় আনন্দিত হতে পারবে না? যদি কেউ সাহরী খাওয়ার সময় আনন্দিত হয় তবে কি তার পাপ হবে?

এখন যদি কেউ বলে দুই ঈদ যেভাবে পালন করা হয় সেভাবে অন্য কোনো দিবস পালন করা যাবে না, যাতে মানুষ এই তৃতীয় উৎসবটিকেও দুই ঈদের মতো মনে না করে। তবে আমরা বলব, এই কথাটি আমরাও স্বীকার করি। কোনো বিষয়ে মানুষের সঠিক আক্বীদা বিকৃত হতে পারে এমন পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন না করাই উচিৎ যেমনটি আমরা পূর্বেও বলেছি। কিন্তু ঈদে মীলাদুন্নাবী কি দুই ঈদের মতো পালন করা হয়? দুই ঈদে মানুষ যেভাবে নতুন পোশাক ক্রয় করে, নানা রকম মজাদার খাবার রান্না করে, আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত করে, রাসুলের জন্মদিবসে কি তা করা হয়? সর্বোপরি দুই ঈদে সকালে যে অতিরিক্ত তাকবীর সহ বিশেষ সলাত আদায় করা হয় সেটা কি রাসুলের জন্মোৎসবে করা হয়? এধরণের সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কি এমন বলা যায় যে, একসময় ঈদে মীলাদুন্নাবীকে মানুষ দুই ঈদের মতো সমপর্যায়ের বিধান বলে মনে করবে! আমরা অন্তত এমনটি মনে করি না। যারা এভাবে চিন্তা করেন তারা নিজেরা ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন না করলে না করুন। এটা তাদের ব্যক্তিগত অধিকার। কিন্তু যারা ভিন্নভাবে চিন্তা করে তাদের তিরস্কার করার অধিকার তাদের নেই।

ঙ. কেউ কেউ বলে, রাসুলের জন্ম দিন পালন করতে হলে লক্ষ লক্ষ সাহাবায়ে কিরামের জন্ম দিন পালন করতে হবে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের জন্ম দিন পালন করতে হবে ইত্যাদি। সম্ভবত

এরাই সর্বাধিক নির্বোধ। কোনো একটি আয়াত তেলোয়াত করলে কি পবিত্র কুরআনের সবগুলো আয়াত তেলোয়াত করতে হবে, সুবহানাল্লাহ বললে কি সাথে সাথে আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি উচ্চারণ করা বাধ্যতামূলক হবে? একটি ভাল কাজ করলে কি দুনিয়ায় যত ভাল কাজ আছে সব গুলো আদায় করতে হবে? রাসুলুল্লাহ ﷺ ফিরআউনের হাত থেকে মুসা عليه السلام এর মুক্তি পাওয়া উপলক্ষে সওম পালন করলেন। এর পূর্বে তো আল্লাহ বহু সংখ্যক নবী-রাসুল ও নেককার ব্যক্তিকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন তিনি তাদের সবার জন্য সওম পালন করেন নি কেনো? আরবীতে একটি প্রবাদ আছে,

ما لا يؤخذ لكه لا يترك كله

কোনো কিছুর সবটুকু গ্রহণ করতে না পারলেই তার সবটুকুই বর্জন করতে হবে এমন নয়।

অর্থাৎ কল্যাণময় কাজ যতটুকু সম্ভব করে যেতে হবে। সবটকু করতে পারবো না বলে হতাশ হয়ে সম্পূর্ণ বর্জন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় বরং যেটুকু পারবো সেটুকু আদায় করতে হবে।

আমরা সমস্ত নবী-রাসুল ও নেককার ব্যক্তিদের জন্মোৎসব পালন করতে পারছি না এটা সঠিক কিন্তু যিনি তাদের নেতা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার জন্মোৎসব পালন করছি এটাই কি যথেষ্ঠ নয়!

এই হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্মোৎসব সম্পর্কে উত্থাপিত কিছু সংশয়। আমরা যার সদুত্তর প্রদান করার চেষ্টা করেছি আর আল্লাহই তৌফিকদাতা। এই আলোচনায় যারা মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপনের বিপক্ষে যেসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয় সেগুলো দূর্বল। একারণে বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের একটি বিরাট অংশ ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপনের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

এদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম নাব্বীর শায়েখ আবু শামা আল-মাকদিসী, তিনি বিদয়াতের নিন্দা করে একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম "আলবায়িস আলা ইনকারিল বিদায়ি ওয়াল হাওয়াদিস" (الباعث علي انكار البدع والحوادث)। সেখানে তিনি বলেন,

وَمن أحسن مَا ابتدع فِي زَمَاننَا من هَذَا الْقَبِيل مَا كَانَ يفعل بِمَدِينَة اربل جبرها الله تَعَالَى كل عَام فِي الْيَوْم الْمُوَافق ليَوْم مولد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الصَّدقَات وَالْمَعْرُوف واظهار الزِّينَة وَالسُّرُور فان ذَلِك مَعَ مَا فِيهِ من الاحسان الى الْفُقَرَاء مشْعر بمحبة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتعظيمه وجلالته فِي قلب فَاعله وشكرا لله تَعَالَى على مَا من بِهِ من ايجاد رَسُوله الَّذِي أرْسلهُ رَحْمَة للعالمين

আমাদের সময় যেসব উত্তম বিদয়াত (নতুন সৃষ্ট বিষয়) চালু হয়েছে তা হলো ঐ জিনিস যা ইরবিল নামক শহরে প্রথম শুরু হয়েছে। এটা হলো প্রতি বছর রাসুলের জন্মদিনে দান-সদকা, উত্তম কাজ, সাজ-সজ্জা এবং আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা। এতে এক দিকে যেমন দরিদ্রের প্রতি উত্তম আচরণ করা হচ্ছে

বিপরীত দিকে যে এটা করছে তার অন্তরে যে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি অত্যাধিক ভালবাসা ও সম্মান রয়েছে তা প্রমাণিত হচ্ছে। তাছাড়া আল্লাহ যে সমগ্র জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসেবে তার রাসূলকে এই দিন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সে ব্যাপারে শুকরিয়া আদায় করা হচ্ছে।

মালেকী মাজহাবের প্রখ্যাত ফক্বীহ্ ইবনুল হাজি আল-মাদখাল নামক কিতাবে রবিউল আওয়াল মাসে রাসুলের জন্ম উপলক্ষে অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগী করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

তবে মালেকী মাজহাবের অন্য এক ফক্বীহ আল-ফাকিহানী এ বিষয়টিকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে নিন্দা করেছেন। ইমাম সুয়ূতী তার মতামত খন্ডায়ন করে একটি রেসালা প্রণয়ন করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন, ‘‘আল-মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ’’ (حسن المقصد في عمل المولد)। উপরে আমরা এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী থেকে যেসব মতামত উল্লেখ করেছি তা এই রেসালার অন্তর্গত। এই রেসালাতে ইমাম সুয়ূতী উল্লেখ করেন, হাফেজ ইবনে হাযার আল-আসক্কালানীও এই মতের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন,

أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة، وإلا فلا

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্মোৎসব পালন করা বিদয়াত। তিনটি সোনালী যুগের কেউ এটা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে রাসুলের জন্ম উপলক্ষে এখন যা কিছু করা হয় তার মধ্যে কিছু উত্তম বিষয় রয়েছে আর কিছু নিন্দনীয় বিষয় রয়েছে। যদি কেউ এ উপলক্ষে কেবল উত্তম কাজ করে আর নিন্দনীয় কাজ থেকে দূরে থাকে তবে এটা উত্তম বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। এর অন্যথা হলে নিন্দনীয় হবে।

ইরবিলের বাদশা প্রথম এই প্রথা চালু করেন। তার সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে ইবনে কাছির رحمه الله বলেন,

وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيفَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَيَحْتَفِلُ بِهِ احْتِفَالًا هَائِلًا. وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ شَهْمًا شُجَاعًا بَطَلًا عَاقِلًا عَالِمًا عَادِلًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

তিনি রবিউল আওয়াল মাসে মাওলিদ শরীফ (পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নাবী) পালন করতেন। এ উপলক্ষে তিনি ব্যাপক উৎসবের আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন বীর, বুদ্ধিমান, এবং ন্যায়পরায়ন। রহেমাহুল্লাহ তায়ালা। [আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া]

মোট কথা বহু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা বৈধ এবং উত্তম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিপরীত দিকে কেউ কেউ এটাকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে নিন্দা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মালেকী মাজহাবের আল-

ফাকিহানী যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মালেকী মাজহাবের অন্য এক ফক্বীহ ইবনুল হাজী থেকে বিষয়টি অপছন্দ করার পক্ষে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে সেটা ব্যাখ্যাস্বাপেক্ষ। যেহেতু তিনি নিজেই রবিউল আওয়াল মাসে বেশি বেশি আমল করার এবং রাসুলের জন্ম উপলক্ষে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও বিষয়টিকে অপছন্দ করেছেন। তবে তিনি এটা স্বীকার করেছেন যে যারা এটা করে যদি তারা নিষিদ্ধ কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকে তবে তাদের প্রচুর পরিমাণ সওয়াব হয়। তিনি বলেন,

فتعظيم المولد ، واتخاذه موسمًا ، قد يفعله بعض الناس ، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده ، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ، ما يستقبح من المؤمن المسدد

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম দিবস পালন করা এবং এটাকে নিয়মিত উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করা যা কিছু লোক করে থাকে অনেক সময় এটা যারা করে তাদের প্রচুর সওয়াব হয়। তাদের সুন্দর নিয়তের কারণে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করার কারণে। [ইক্তিদায়ে সিরাত]

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই কথাটির সঠিক অর্থ অনেকের নিকট স্পষ্ট নয়। ঈদে মীলাদুন্নাবীকে বিদয়াত বলা সত্ত্বেও এটা যারা পালন করে তাদের সওয়াব হবে এমন মন্তব্য তিনি কিভাবে

করতে পারেন! যারা বিদয়াত বলতে সর্বাবস্থায় হারাম তথা পাপের কাজ বোঝেন তাদের নিকট বিষয়টি বোধগম্য না হওয়াই স্বাভাবিক। এর বিপরীতে আমরা উপরে যা বর্ণনা করেছি সে আলোকে চিন্তা করলে বিষয়টি সহজে সমাধান করা সম্ভব। আমরা বলেছি ওলামায়ে কিরাম বিদয়াত বলতে সর্বাবস্থায় হারাম বা পাপের কাজ বোঝেন না বরং অনেক সময় তারা বিদয়াত বলতে মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় কাজ বুঝিয়ে থাকেন যাতে লিপ্ত হলে পাপ হয় না। অনেক সময় এমন কাজকেও বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় যা আসলে বৈধ বা উত্তম কিন্তু তাতে লিপ্ত হলে মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাস পরিবর্তিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একারণে গভীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ওলামায়ে কিরাম তা থেকে নিষেধ করে থাকেন। কিন্তু যারা ততটা জ্ঞান গরিমার অধিকারী না হওয়ার কারণে বিষয়টির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত নয় তারা ঐ সকল কাজে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় যেহেতু মূল কাজটি উত্তম কাজ আর এর সাথে যে ক্ষতিকর প্রভাব জড়িয়ে আছে তা স্পষ্ট নয় একারণে ঐ সকল ব্যক্তিদের সওয়াব হয়। এমনও হতে পারে যে একদল আলেম কোনো একটি কাজে লিপ্ত হলে কিছু সমস্যা হতে পারে এমন মনে করার কারণে উক্ত কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করছেন কিন্তু অন্য কিছু আলেম সমস্যা মনে করছেন না তাই তাতে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি প্রদান করছেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি দলকে তাদের

নিজ নিজ গবেষণা ও বুঝ অনুযায়ী প্রতিদান প্রদান করা হবে। এখানে এক দল আরেক দলকে তিরষ্কার করা অনুচিত। এভাবে চিন্তা করলে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার উপরোক্ত বক্তব্যে কোনো জটিলতা পরিলক্ষিত হয় না। তবে এর মাধ্যমে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঈদে মীলাদুন্নাবী এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়াবলীকে যারা সুস্পষ্ট হারাম বা পাপের কাজ মনে করে ফলে এসব ব্যাপারে আজীবন সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে, এসব কারণে মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা সকল ওলামায়ে কিরামের মতামতের বিপরীত মতের উপর রয়েছে। এসব বিষয়ে আলেমদের দুটি মত রয়েছে। কেউ কেউ এগুলোকে বৈধ ও উত্তম বলেছেন অন্যরা বলেছেন মাকরুহ। এসব বিষয়কে হারাম ও পাপের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করার মতটি কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া মতপার্তক্যপূর্ণ বিষয়ে একদল অন্য দলকে পথভ্রষ্ট ও বিদয়াতী আখ্যা দেওয়াই সমীচীন নয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

৩. সাধারন মীলাদ অনুষ্ঠান।

আমাদের দেশে এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি রেওয়াজ প্রচলিত আছে। কোনো সুখের বা শোকের ঘটনা ঘটলে কিছু নেককার ব্যক্তিকে দা’ওয়াত করা হয়। সকলে একত্রিত

হয়ে দোয়া-দরুদ পাঠ করে দ্বীনী আলোচনা করে, যিকির-আযকার করে ইত্যাদি। সব শেষে আয়োজক উপস্থিত সবাইকে নিজের সাধ্য অনুযায়ী কিছু খাবার খাওয়ায় এভাবে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এধরণের অনুষ্ঠানকে মীলাদ মাহফিল বলা হয়। বর্তমানে কেউ কেউ এটাকে দোয়ার মাহফিলও বলে থাকেন। এক সময় এধরণের দোয়ার অনুষ্ঠানে বহু নিষিদ্ধ কর্মের প্রচলন ছিল যেমন, দরুদ পাঠ করার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ হাজির হয়ে যান এমন মনে করে মানুষ দাড়িয়ে যেতো, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে উর্দু ও ফার্সী কবিতা পাঠ করা হতো ইত্যাদি। আল্লাহর ইচ্ছায় বর্তমানে বেশিরভাগ এলাকায় এসব অপ্রীতিকর বিষয়ের অবসান ঘটেছে। এখন মানুষ সম্পূর্ণ বৈধ পন্থায় এধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সব জায়গায় একই পদ্ধতিতে আদায় করা হয় তা নয়। কোথাও রাসুলের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয় এবং শেষে দোয়া হয়, কোথাও কেবল দরুদ পাঠ করার পর মোনাজাত করা হয়, আবার কোথাও কিছু না করে কেবল দোয়া করে দেওয়া হয়। যখন মীলাদের মধ্যে নিষিদ্ধ কর্মকান্ডের প্রচলন ছিল তখন আলেমরা ঐ সকল কর্মের নিন্দা করেছেন। তারা মূল বিষয়টির নিন্দা করতেন না বরং এর মধ্যে যেসব নিষিদ্ধ কর্ম-কান্ড রয়েছে সেগুলোর নিন্দা করতেন। তাদের প্রচার-প্রসারের কারণে মানুষ এখন নিষিদ্ধ কর্ম-কান্ডগুলো পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু এখন কিছু লোক মীলাদ

নামক বিষয়টিকে গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলার জন্য হৈ চৈ শুরু করেছে। তাদের কথা হলো এই ভাবে একত্রিত হয়ে দোয়া-দরুদ পাঠ করা এবং শেষে তবারোক গ্রহণ করার পদ্ধতি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ বা তার সাহাবায়ে কিরাম চালু করেন নি তাই এটা বিদয়াত। এই যুক্তিটি পূর্বে খন্ডায়ন করা হয়েছে। আমরা বলেছি কেবল রাসুলুল্লাহ ﷺ করেন নি বা সাহাবায়ে কিরাম করেন নি এই যুক্তিতে কোনো কিছু নিষিদ্ধ প্রমাণিত হবে না বরং দেখতে হবে তাতে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করা হয় কিনা। এই মূলনীতিতে বিচার করলে বর্তমানে যে মীলাদ মাহফিল প্রচলিত আছে সেগুলো বৈধ প্রমাণিত হয়। যেহেতু তার মধ্যে নিষিদ্ধ কিছু নেই। আর যদি দেখা যায় কোনো এলাকাতে প্রচলিত মীলাদের মধ্যে নিষিদ্ধ কর্ম-কান্ড রয়েছে তবে উক্ত নিষিদ্ধ কর্ম-কান্ডের নিন্দা করতে হবে মীলাদকে গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলার প্রয়োজন নেই। মীলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে বর্তমানে সমালোচনার ঝড় উঠেছে আমরা নিচে সেসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরছি।

ক. মীলাদে অনেক সময় ‘‘বালাগাল উলা বিকামালিহি .....’’ পাঠ করা হয়। বর্তমানে আহলে হাদীসগণ এবং তাদের মতাদর্শে প্রভাবিত কিছু আলেম-ওলামা এই কবিতাটিকে শিরকী কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। তারা বলে ‘‘বালাগাল উলা বিকামালিহি’’ (بلغ العلي بكماله) এর অর্থ ‘‘রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ

যোগ্যতার বলে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন।" একারণে এটা একটি শিরকী বাক্য। এই সকল লোকেরা বিপরীতমুখি রোগে আক্রান্ত। একদিকে যেমন তাদের জ্ঞান-গরিমা কম ও গবেষণা শক্তি দূর্বল বিপরীত দিকে কোনো ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করার ব্যাপারে তাদের সাহস অতিরিক্ত বেশি। আমি একটা বিষয় ভেবে পায় না যে এই বাক্যটির ভিতরে যোগ্যতা কথাটি কোথা থেকে আসল। আরবী ভাষা সম্পর্কে যৎসামান্য জ্ঞান রাখে এমন যে কারও নিকট স্পষ্ট যে এখানে ব্যবহৃত কামাল (كمال) শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণতা। লিসানুল আরবে বলা হয়েছে, (الكمال التمام) কামাল অর্থ হলো পরিপূর্ণতা। তাজুল উরুসে বলা হয়েছে,

الكمال : التمام وهما مترادفان كما وقع في الصحاح وغيره

কামাল অর্থ হলো তামাম (পরিপূর্ণতা) এ দুটি পরষ্পর সমার্থবোধক শব্দ। সিহাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে এমনটিই বলা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ কি পরিপূর্ণতার দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন না? স্বয়ং রব্বুল আলামীন বলেন,

{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}

হে নবী নিঃসন্দেহে আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। [কলাম/৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

আমাকে পাঠানো হয়েছে উত্তম চরিত্রকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য।

হাকিম মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, ইমাম জাহাবীও তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; সহীহা-৪৫।

কবি নিজেও এই অর্থে রাসুলুল্লাহ ﷺ পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে আছেন বলে মন্তব্য করেছেন। তাইতো পরবর্তীতে তিনি বলেন, (حسنت جمع خصاله) "তার সকল স্বভাব-চরিত্র অতীব সুন্দর"। সুতরাং এই কবিতাটিতে যা বলা হয়েছে সেটি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে চয়ন করা হয়েছে আর নির্বোধরা এটার বিপক্ষে প্রচারে লিপ্ত হয়ে গেছে।

আমার বিশ্বাস, আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ কিন্তু উর্দু ভাষায় দক্ষ কোনো ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রথম জটিলতা সৃষ্টি করেছে। যেহেতু উর্দু ভাষায় কামাল (کمال) শব্দটি দক্ষতা, যোগ্যতা, কারামতি

ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়, "তোমহারা কামাল দেখাও" অর্থাৎ তোমার কামাল (দক্ষতা, যোগ্যতা, কারামতী, তেলেসমাতী ইত্যাদি) প্রদর্শন করো।

(فیروز اللغات) নামক উর্দু ডিকশোনারীতে কামাল (کمال) শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, پورا ہونا - সম্পূর্ণ হওয়া, ہنر - তেলেসমাতি বা কারামতি, لیاقت - যোগ্যতা, عجیب کام - বিস্ময়কর কাজ, استادی - উস্তাদী তথা কর্মদক্ষতা ইত্যাদি।

সেখানে আরও বলা হয়েছে, "কামাল দেখানা" (کمال دکھانا) এর অর্থ হলো, (ہنر یا کرتب دکھانا) তথা তেলেসমাতি ও দক্ষতা প্রদর্শন করা এবং (کرامت دکھانا) অর্থাৎ কারামতী দেখানো।

পাঠক চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যারা "বালাগাল উলা বিকামালিহি" এর অর্থ করেন, নিজ যোগ্যতায় সর্বোচ্চ মাকামে পৌঁছে যাওয়া তারা বুঝে হোক, না বুঝে হোক আসলে উর্দু অভিধান হতে অর্থটি গ্রহণ করেছেন, আরবী অভিধান হতে নয়। আর বলাই বাহুল্য যে, একটি আরবী কবিতা উর্দু অভিধানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়।

এই হচ্ছে এদের ভাষাজ্ঞান! আর শরীয়তের মুলনীতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা আরো বেশি মারাত্মক। ওলামায়ে কিরামের নিকট স্বীকৃত মূলনীতি হলো, কোনো একটি কথা যখন একাধিক অর্থ বহন করে যার একটি অর্থ কুফরী আর অন্য অর্থটি উত্তম তখন মুসলিমের উপর সুধারনা করতে হবে এবং উত্তম অর্থটি গ্রহণ করতে হবে।

বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে,

إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ

যদি দেখা যায় কোনো একটি বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে কুফরী প্রমাণিত হচ্ছে কিন্তু একটি দৃষ্টিকোন থেকে কুফরী প্রমাণিত হচ্ছে না তবে মুফতীর উচিৎ যে দৃষ্টিকোন থেকে কুফরী প্রমাণিত হচ্ছে না সেটি গ্রহণ করা। এভাবে মুসলিমের প্রতি সুধারণা বজায় রাখতে হবে।

অন্যান্য ওলামায়ে কিরামও অনুরূপ কথা বলেছেন। অথচ এই সকল হতভাগারা কল্পিত অর্থের উপর নির্ভর করে উপমহাদেশের হাজার হাজার আলেম-ওলামা ও সাধারন মানুষ শিরকে লিপ্ত আছে এমন মন্তব্য করছে যেহেতু তারা ‘বালাগাল উলা’ পাঠ করে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তারা ‘‘কামাল’’ শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরিত্যাগ করে এখন বালাগা (بلغ) শব্দের পিছনে লেগেছে। তাদের যুক্তি হলো বালাগা ফি’লে লাযিম (فعل لازم) যার অর্থ পৌঁছে যাওয়া। এখানে বলা উচিৎ ছিল আল্লাহ তার রাসুলকে পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন, রাসুল ﷺ পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছেন এভাবে বলা সঠিক নয়। অন্য লোকের ছিদ্রান্বেষণে যে ব্যক্তি ব্যস্ত থাকে তার বুদ্ধি যে কি পরিমাণ লোপ পায় তা এই সকল নির্বোধদের কার্যকলাপ না দেখলে কখনও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যখন একজন মুসলিম বলে, আমি বাড়ি পৌঁছে গেছি। এটা কি শিরক হবে? এর অর্থ কি এটাই বুঝতে হবে যে, সে বলতে চাচ্ছে আমি নিজ যোগ্যতা ও সক্ষমতায় বাড়ি পৌঁছে গেছি এখানে আল্লাহর কোনো ভূমিকা নেই? [নাউযু বিল্লাহ] সব সময় কি এমন বলতে হবে যে, আল্লাহ আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন, আজ সকালে ভাত খেয়েছি এমন না বলে বলতে হবে আল্লাহ আমাকে খাওয়ালেন? এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি করেছি, আমি বলেছি, আমি গিয়েছি এগুলো বাদ দিয়ে বলতে হবে আল্লাহ আমাকে দিয়ে করিয়েছেন, আল্লাহ আমাকে দিয়ে বলিয়েছেন ইত্যাদি। এর অন্যথা হলে কি ঈমান নষ্ট হবে? এ ধরণের চিন্তাধারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}

হে নবী নিঃসন্দেহে আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। [কলাম/৪]

এখানে তিনি কেনো বললেন না, হে নবী আমি আপনাকে সর্বোত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি? রাসুল ﷺ সর্বোত্তম চরিত্রের উপর আছেন এর অর্থ যে আল্লাহই তাকে এর উপর রেখেছেন এটা কি না বললে বোঝা যায় না?

মহান আল্লাহ এই সকল নির্বোধদের চক্রান্ত থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করুন।

খ. মীলাদে দরুদে ইব্রাহীমীর পরিবর্তে সুর করে আল্লাহুম্মা সল্লী আলা মাওলানা মুহাম্মাদ ...... বা ইয়া নাবী সালামু আলাইকা .... ইত্যাদি দরুদ পাঠ করা হয়। সুর করে কোনো কিছু পাঠ করা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি সুন্দর কথা সুন্দর কণ্ঠে পাঠ করা দোষণীয় নয়। আর দরুদে ইব্রাহীমী ছাড়া ভিন্ন কোনো দরুদ পাঠ করার ব্যাপারে কথা হলো, মুসলিম উম্মাহর সকল ওলামায়ে কিরাম একমত যে, সলাতের ভিতরে ছাড়া অন্যান্য সময় দরূদে ইব্রাহীমীর পরিবর্তে ছোট যে কোনো দরুদ পাঠ করাতে সমস্যা নেই। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নাম শুনেই আমরা বলি, সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম বা এই জাতীয় যে কোনো শব্দ, যার মধ্যে

সলাত ও সালাম কথার উল্লেখ থাকে। যারা মীলাদে দরুদে ইব্রাহীমীর পরিবর্তে ভিন্ন কোনো দরুদ পাঠ করার নিন্দা করে তারাও জুমুয়ার খুতবা বা অন্য কোনো উপলক্ষে এসব ছোট দরুদ পাঠ করে থাকে। আমাদের ওলামায়ে কিরাম যখন কোনো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তখন শুরুতে বিভিন্ন শব্দ যোগ করে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুলের উপর দরুদ পেশ করেন। যারা অবগত নয় তারা যে কোনো বরেণ্য আলেমের আরবী ভূমিকা লক্ষ্য করলে এ বিষয়ে ধারনা পেয়ে যাবেন। সুতরাং দরুদে ইব্রাহীমীর পরিবর্তে ভিন্ন কোনো দরুদ পাঠ করার বিষয়টিকে নিন্দা করার কোনো কারণ নেই। যদি কেউ সলাতের মধ্যে এমনটি করে তবে তাকে বাধা দিতে হবে কিন্তু সলাতের বাইরে যে কোনো অনুষ্ঠান বা অবস্থানে যে কোনো দরুদ পাঠ করাতে নিষেধ নেই যদি তাতে নিষিদ্ধ কোনো বিষয়ের উল্লেখ না থাকে।

গ. কেউ কেউ বলে “ইয়া নাবী সালামু আলাইকা” (يا نبي سلام عليك) বলা যাবে না কারণ এখানে নাবী শব্দটি নাকেরা করা হয়েছে। ইয়া নবী (يا نبي) না বলে বলতে হবে আয়্যুহান্নাবী (أيها النبي)। তা না হলে রাসুলকে অবমাননা করা হয়। তাদের প্রশ্ন করি যখন আমরা বলি ইয়া রাহমানু (يا رحمان) ইয়া রাহীমু (يا رحيم) তখন কি আল্লাহকে অপমান করা হয়? আয়্যুহার রাহমান বা আয়্যুহার রহীম এভাবে না বললেই কি নয়? প্রশ্ন হলো বিরোধী পক্ষের পিছনে আদাজল খেয়ে লাগার কি কোনো

প্রয়োজন আছে। যার সাথে আমার বিবাদ আছে তার ভাল-মন্দ সব কিছুকে অস্বীকার করাই কি ন্যায়পরায়নতা?

কেউ কেউ আবার ‘‘ইয়া নবী সালামু আলাইকা’’ (يا نبي سلام عليك) এর মাধ্যে সালাম শব্দটি কেনো নাকেরা হলো সেই প্রশ্ন তুলতে পারে তাদের উত্তরে আমরা বলবো আল্লাহ বলেছেন, (وسلام علي المرسلين) ‘‘রাসুলদের উপর সালাম’’ [সফফাত/১৮১] এখানে সালামকে নাকেরা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নবী এবং নেককার ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এভাবে সালাম শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব, এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা অকারণ।

অনেকে বলেন, হাদীসে এসেছে, (السلام قبل الكلام) ‘‘সালাম হবে কালাম তথা কথার আগে’’ [তিরমিযি]। সুতরাং ‘‘ইয়া নবী সালামু আলাইকা’’ (يا نبي سلام عليك) ‘‘হে নবী আপনার উপর সালাম’’ এভাবে না বলে বলতে হবে ‘‘সালামু আলাইকা ইয়া নাবী’’ (سلام عليك يا نبي) ‘‘আপনার উপর সালাম হে নবী’’। উপরোক্ত হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ কিন্তু সেটা ভুল স্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ঘটনা হলো, আমরা একে অপরকে যে সালাম দিই তা সম্ভাষণ হিসেবে। বিষয়টিকে আরবীতে বলা হয় তাহিয়্যা (تحية)। মহান আল্লাহ একে অপরকে সালাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর বলেন, (تحية من عند الله) ‘‘এটা হলো আল্লাহর পক্ষ

থেকে নির্ধারিত সম্ভাষণ'' [নুর/৬১] কারো সঙ্গে দেখা হলে বা কোথাও গমণ করলে প্রথমেই যে কাজটি করা হয় সেটিকে বলা হয় তাহিয়্যা। যেমন মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমেই যে দু'রাকাত সলাত আদায় করা হয় তাকে বলে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ। যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়ে বা কিছুক্ষণ কুরআন তেলোয়াত করে এবং পরে দু'রাকাত সলাত আদায় করে তবে তাকে আর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বলা যাবে না কারণ এটা প্রথমেই করা হয় নি। মুসলিমরা পরষ্পরের সাথে দেখা হলে যে সালাম দেয় সেটাকে বলা হয় তাহিয়্যা বা সম্ভাষণ। সেক্ষেত্রে প্রথমেই সালাম না দিলে বিষয়টি আর তাহিয়্যা বলে গণ্য হয় না এবং সুন্নাতও আদায় হয় না। একারণে এ বিষয়ে হাদিসে অত্যাধিক কঠোরতা করা হয়েছে। এমনকি কারো বাড়িতে অনুমতি গ্রহণের সময় আগে অনুমতি গ্রহণ করে পরে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে বরং আগে সালাম দেওয়ার পরে অনুমতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ''কথার আগে সালাম'' এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ» لِأَنَّهُ تَحِيَّةٌ يُبْدَأُ بِهِ فَيَفُوتُ بِافْتِتَاحِ الْكَلَامِ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهَا قَبْلَ الْجُلُوسِ

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ''কথার আগে সালাম দিতে হবে'' এর কারণ সালাম হচ্ছে তাহিয়্যা যা প্রথমে শুরু করতে হয় প্রথমে

অন্য কোনো কথা বলে পরে সালাম দিলে বিষয়টি আদায় হয় না। যেমন তাহিয়্যাতুল মাসজিদ মসজিদে প্রবেশ করার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আদায় করলে আদায় হয় না। [আল-মিরকাত]

এখন আমার প্রশ্ন হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নাম উচ্চারণ করার পর আমরা যে সালাম পেশ করি সেটা কি তাহিয়্যা বা সম্ভাষণ হিসেবে গণ্য? সম্ভাষণ তো হয় কারো সঙ্গে সাক্ষাত হলে কিন্তু আমাদের সাথে কি এখন রাসুলুলল্লাহ ﷺ এর সাক্ষাত হয়? তাহলে সঠিক কথা হলো, আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্যে এখন যে সালাম পেশ করি তা তাহিয়্যা বা সম্ভাষণ নয় বরং দোয়া। একারণে আমরা বলি, "রসুলুল্লাহ আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম"। এখানে দুটি জিনিস সালাম দেওয়ার পূর্বে উল্লেখ করা হয়। প্রথমত রাসুলুল্লাহর নামটি আগে উল্লেখ করা হয় দ্বিতীয়ত সলাত তথা দরুদ কথাটি সালামের পূর্বে উল্লেখ করা হয়। আগে সালাম দিতে হবে এ নীতি এখানে প্রয়োগ করলে বলতে হতো, আস-সালামু আলাইহি, ওয়াস-সলাতু রসুলুল্লাহ। সুস্থ মস্তিষ্কের যে কারো নিকট বিষয়টি বেজায় বেখাপ্পা মনে হবে সন্দেহ নেই।

মীলাদ মাহফিলে বলা হয় "ইয়া নাবী সালামু আলাইকা" তথা হে নবী আপনার উপর সালাম। এখানে কিন্তু সালামের মাধ্যমে তাহিয়্যা বা সম্ভাষণ উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ এখানে

হাজির নাজির নেই। এখানে আসলে দোয়া উদ্দেশ্য। আর হরফে নেদা তথা হে নবী কথাটি আসলে মাজাঝ বা রুপক অর্থে বলা হয়েছে প্রকৃত অর্থে নয়। যেমন দূর দেশে বিপদে পড়লে বা রোগাক্রান্ত হলে আমরা বলি ওমা! ও বাবা। এখানে বাবা মাকে ডাকা-ডাকি করা উদ্দেশ্য নয় যেহেতু তারা হাজির নেই। মোট কথা রাসুলের অবর্তমানে তার উপর যে সালাম পেশ করা হয় সে ব্যাপারে কথার আগে সালাম দিতে হবে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। যেহেতু এখানে সালাম সম্ভাষণ অর্থে নয় বরং দোয়া অর্থে। মিলাদের মাহফিলে সালাম আগে উল্লেখ করার ব্যাপারে কঠোরতা কেবল তারাই করতে পারে যারা রাসূল ﷺ কে হাজির নাজির মনে করে।

অনেকে অবাক হয়ে বলতে পারেন এসব বিষয়ে এত লম্বা আলোচনার কি প্রয়োজন? এ বিষয়ে আমাদের কৈফিয়ত হলো, এধরনের লম্বা আলোচনায় আমাদের দ্বিমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত যারা বর্তমানে বিদয়াতের বিরোধীতা করার ঠিকাদারী নিয়েছে তারা কত ছোট বিষয়ের উপর নির্ভর করে মুসলিম উম্মাহকে পথভ্রষ্ট ও বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত তা পাঠকের সামনে তুলে ধরা। দ্বিতীয়ত এই সকল লোকেরা শরীয়তের সুক্ষ্ম বিষয়াবলী অনুধাবনে কতটা অক্ষম তা প্রমাণ করা। আর আল্লাহই তৌফিক দাতা।

৪. সম্মিলিত মোনাজাত।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত কথা পূর্বে গত হয়েছে। আমরা দেখেছি পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর সম্মিলিত মোনাজাত রাসুলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবায়ে কিরামের সময় প্রচলিত ছিল না কিন্তু বিষয়টি সামগ্রিকভাবে শরীয়তের মানদন্ডে গ্রহণযোগ্য। যেহেতু ফরজ সলাতের পর দোয়া করা হলে তা আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে কবুল হয় বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। দোয়া করার সময় হাত উত্তোলন করার ব্যাপারেও সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। দোয়া-যিকির ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্মিলিতভাবে করার ফজিলত সম্পর্কেও হাদীস বর্ণিত আছে। এসবই আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা সঙ্গত মনে হয় না। এই সকল কারণে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পর সম্মিলিত মোনাজাত একটি উত্তম কাজ হিসেবে গণ্য যদি না কেউ বিষয়টিকে সলাতের অংশ মনে করে বা আবশ্যক মনে করে। আমরা বলেছি, এক সময় মানুষের মধ্যে এই ধরণের আক্বীদা-বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল এটা সঠিক কিন্তু এখন বেশিরভাগ মানুষ আর এমন মনে করে না। অতএব, সম্মিলিত মোনাজাত এখন আর সমস্যার বিষয় নয়। তবে আলেম-ওলামাদের সজাগ থাকতে হবে যাতে সাধারন মানুষ এবিষয়ে বিকৃত ধ্যান ধারনার বশবর্তী না হয়। মোনাজাতের সঠিক বিধান কি সে সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করাই এখানে যথেষ্ট বিবেচিত হবে। যে কোনো মূল্যে

মোনাজাতকে গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলতেই হবে এই চিন্তা ধারা সঠিক নয়। মূলত এ কারণেই যুগের পর যুগ মুসলিম সমাজে সলাতের পর সম্মিলিত মোনাজাত চালু রয়েছে। বিচক্ষণ ওলামায়ে কিরাম এটা সসর্ব বাতিল হিসেবে ঘোষণা করেন নি এবং এর বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হন নি। কেউ কেউ অবশ্য বিষয়টিকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তবে তারাও এটাকে অনুত্তম বা অপছন্দনীয় কাজ মনে করেছেন নিষিদ্ধ বা হারাম নয়। একারণে এটার বিরুদ্ধে রক্তাক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সঠিক মনে করেন নি।

মালেকী মাজহাবের ফকীহ্ ইবনে নাজি ﵀ বলেন,

واستمر العمل على جواز ذلك عندنا بأفريقية, وكان بعض من لقيته ينصره

আমাদের এখানে অর্থাৎ আফ্রিকাতে (সম্মিলিত মোনাজাত) বৈধ হওয়ার মতটিই সবার নিকট গৃহীত হয়েছে। যেসব আলেমের সাথে আমি সাক্ষাত করেছি তাদের কেউ কেউ এটার পক্ষাবলম্বন করতেন।

[মাওয়াহিবুল জালিল, আল ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানি]

ইমাম মালিক বিষয়টিকে অপছন্দ করেছেন। তিনি মনে করেছেন এর মাধ্যমে ইমামের অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হবে।

যেহেতু তাকে মুক্তাদিদের পক্ষ হতে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার ব্যাপারে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ সংশয়টির উত্তর দিয়ে ইবনে নাজি বলেন,

بل الغالب على من ينصب نفسه لذلك التواضع والرقة فلا يهمل أمره بل يفعل

বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যাকে দিয়ে দোয়া করানো হয় তিনি বিনম্রতা ও কোমলতা প্রকাশ করেন। অতএব বিষয়টি পরিত্যাগ করা যাবে না বরং করতে হবে। [আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী]

তিনি আরও বলেন,

وما كل بدعةٍ ضلالة، بل هو من البدع الحسنة، والاجتماع فيه يورث الاجتهاد فيه والنشاط

সব নতুন সৃষ্ট বিষয়ই তো আর পথভ্রষ্টতা নয় বরং তার মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে উত্তম। আর এ ধরণের কাজ সম্মিলিতভাবে আদায় করলে তাতে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। [আল ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী]

একথা উল্লেখের পর আল ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানীর লেখক বলেন,

وأقول: طلب ذلك في الاستسقاء ونحوه شاهد صدقٍ ارتضاه ابن ناجي

আমি বলব, বৃষ্টি প্রার্থনা ও অন্যান্য স্থানে যে শরীয়তে সম্মিলিত মোনাজাতের বিধান রয়েছে এটা ইবনে নাজি যা বলেছেন তার পক্ষে উত্তম দলিল।

মালেকী মাজহাবের অন্য এক ফক্বীহ ইবনে আরাফাও সম্মিলিত মোনাজাতের পক্ষাবলম্বন করেছেন।

[মাওয়াহিবুল জালিল]

কেউ কেউ বলেছেন কেবল ফজর ও আসরের পর দোয়া করা উচিৎ অন্যান্য সলাতের পরে নয় তাদের মতামত খন্ডায়ন করে ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

بل الصواب استحبابه في كل الصلوات ويستحب أن يقبل علي الناس فيدعو

সঠিক মত হলো প্রতিটি সলাতের পরই এটা (দোয়া করা) মুস্তাহাব। ইমাম সলাতের শেষে মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে দোয়া করবেন। [আল-মাজমু]

ইবনে মুফলিহ ﵀ বলেন,

وَيَدْعُو الْإِمَامُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ لِحُضُورِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمَا فَيُؤَمِّنُونَ عَلَى الدُّعَاءِ وَالْأَصَحُّ وَغَيْرُهُمَا

ইমাম ফজর ও আসরের পর দোয়া করবেন যেহেতু এই দুটি সময় ফেরেস্তারা হাজির থেকে আমিন বলেন। সঠিক মত অনুযায়ী অন্যান্য সলাতের পরও দোয়া করবেন। [আল-ফুরু]

কেউ কেউ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের শেষে সম্মিলিত মোনাজাত নিষিদ্ধ হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলে, সলাতের শেষে কিছু মাসনুন (সুন্নাত) দোয়া ও যিকির রয়েছে। সম্মিলিত মোনাজাতের কারণে মানুষ সেগুলো পরিত্যাগ করে। অতএব, সম্মিলিত মোনাজাত পরিত্যাগ করা উচিৎ। এর উত্তরে আমরা বলব, ফরজ সলাতের শেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ যেসব দোয়া পাঠ করেছেন বলে বর্ণিত আছে সেগুলোর সংখ্যা অনেক। কেউ কেউ এ বিষয়ে পৃথক পুস্তিকাও রচনা করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতি সলাতের শেষে সবগুলো দোয়া একত্রে পাঠ করতেন তা নয় বরং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতেন। অতএব, সলাতের শেষে মাসনুন দোয়া বলতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে এই সকল দোয়া একত্রে পাঠ করা বোঝায় না বরং এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি পাঠ করাই যথেষ্ট। সলাতের শেষে ইমাম মোনাজাত করার পূর্বে সাধারনত কিছু সময় অপেক্ষা করেন। এই সময়ের মাঝে মাসনুন দোয়াগুলির মধ্যে কোনো একটি আদায় করে নেওয়া সম্ভব। যার পক্ষে এটা সম্ভব না হয় বা মাসনুন দোয়া শেষ করার পূর্বেই যদি ইমাম মোনাজাত শুরু করে দেয় তবে ঐ ব্যক্তি মোনাজাতে অংশ গ্রহণ না করে দোয়া পাঠ চালিয়ে যেতে পারে। যে মোনাজাত করতে চায় না তাকে তো মোনাজাত করতে বাধ্য করা হচ্ছে না। এই সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যারা মাসনুন দোয়া পাঠ করে না,

তাদের ক্ষেত্রে কি একথা বলা যায় যে, ইমাম মোনাজাত না করলে তারা মাসনুন দোয়া পাঠ করতো? সামান্য চিন্তা করলে দেখা যাবে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। ইমাম মোনাজাত করে বিধায় বেশিরভাগ লোক মোনাজাতের আশায় বসে থাকে এবং কিছু দোয়া-দরুদ পাঠ করে। যদি ইমাম মোনাজাত না করতেন তবে সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই তারা মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়তো। তাছাড়া অনেক সময়ই ইমাম নিজেই মোনাজাতের মধ্যে কোনো না কোনো মাসনুন দোয়া পাঠ করেন এবং মুছল্লীরা আমীন বলার মাধ্যমে তাতে শরীক হয়। এভাবে দোয়াটি যার মুখস্থ নেই সেও এর ফজিলত প্রাপ্ত হয়। এ পদ্ধতিতে মাসনুন দোয়াগুলো শিখে নেওয়াও মুছল্লীদের জন্য সহজ হয়। দেখা যাচ্ছে, সম্মিলিত মোনাজাত মাসনুন দোয়া পাঠের ব্যাপারে বাঁধা তো নয়ই বরং সহযোগী।

সুতরাং সলাতের পর বা অন্য যে কোনো সময় সম্মিলিত মোনাজাত করার ব্যাপারটি নিয়ে কঠোরতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

৫. শবে বরাত।

বর্তমানে বিদয়াতের বিরুদ্ধে প্রচারের ক্ষেত্রে শবে বরাত সম্পর্কে অত্যাধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়। কিছু লোক শবে বরাতের যে আদৌ কোনো ফজিলত আছে তা স্বীকার করে না

এবং এ রাত উপলক্ষে কোনো ইবাদত করা বৈধ মনে করে না। অথচ শরীয়তে এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে দলিল প্রমাণ রয়েছে এবং এ রাতে ইবাদত করার ব্যাপারে বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের মতামত রয়েছে। পৃথক একটি গ্রন্থে আমরা এসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষিপ্ত কথা হলো, শবে বরাতের ফজিলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত আছে। তার মধ্যে কিছু জাল-জয়ীফ আর কিছু সহীহ। সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن

আল্লাহ ﷻ শাবান মাসের মাঝ রাতে তার সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে তাদের সকলকে ক্ষমা করেন। কেবল মুশরিক এবং অন্য মুসলিমের সাথে বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তি ছাড়া। [তিবরানী, ইবনে হিব্বান]

আল-হাইছামী এই হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, (رجاله ثقات) এর রাবীরা বিশ্বস্ত। শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; সহীহা/১১৪৪।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة

শা’বান মাসের অর্ধ রজনীর ফজিলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত আছে, যা প্রমাণ করে এ রাতের ফজিলত রয়েছে। [ইক্তেদায়ে সিরাত]

তিরমিযির ব্যাখ্যা গ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযিতে এসেছে,

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا

জেনে নাও, শা’বান মাসের অর্ধ রজনীর ফজিলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস এসেছে যা প্রমাণ করে বিষয়টির শারয়ী ভিত্তি রয়েছে।

যারা বলে শা’বান মাসের ফজিলত সম্পর্কে কোনো হাদীস নেই তাদের সম্পর্কে শায়েখ আলবানী বলেন,

ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق

যদি কেউ একথা বলে তবে সে এ বিষয়ে বর্ণিত বিভিন্ন বর্ণনা একত্রিত করে তার উপর গবেষণা না করেই তাড়াহুড়া করে এটা বলেছে। [সহীহা/হাঃ১১৪৪]

অনেকে অবশ্য এখানে একটি সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তারা বলেন, রাত্রে ক্ষমা ঘোষণার বিষয়টি তো সব রাত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেহেতু হাদীসে বলা হয়েছে প্রত্যহ শেষ রাত্রে আল্লাহ

প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং ক্ষমা করার জন্য মানুষকে আহ্বান করেন। অতএব, এখানে শা'বান মাসের বিশেষ কোনো ফজিলত প্রমাণিত হয় না। বিষয়টির প্রকৃত ব্যাখ্যা উল্লেখ করার পূর্বে প্রথমেই আমরা বলবো, রাসুলুল্লাহ ﷺ যে, প্রতি রাতে ক্ষমা ঘোষণা করার খবর দেওয়ার পর বিশেষভাবে শা'বান মাসের মাঝ রাতে ক্ষমা ঘোষিত হওয়ার খবর দিয়েছেন এটাই কি শা'বান মাসের মাঝ রাতের বিশেষ ফজিলত প্রমাণ করে না? তা না হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে এ রাতের কথা কেনো বললেন? এতটুকু চিন্তা করতে যারা সক্ষম নয় শরীয়তের বিধি বিধানের ব্যাপারে কোনোরূপ মন্তব্য করা কি তাদের শোভা পায়?

এখন উপরোক্ত সংশয়টির প্রকৃত উত্তর হলো অন্যান্য রাতের ব্যাপারে ক্ষমা ঘোষণা করার বিষয়টি শেষ রাতের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে কিন্তু শা'বান মাসের মধ্য রজনীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রাতের কথা বলা হয়েছে। মোল্লাহ আলী ক্বারী আল-হানাফী ؒ আল মিরকাতে অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

অনেকে বোকার মতো বলেন, শা'বান মাসের অর্ধ রজনীর ফজিলত রয়েছে তা তো না হয় মানলাম কিন্তু এ রাত্রে ইবাদত বন্দেগী করতে হবে তা কি হাদীসে বলা হয়েছে? প্রশ্ন হলো, হাদীসে শা'বান মাসের ফজিলত সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য কি? মানুষ এসব ফজিলত শুনে সারা

রাত নাকে তেল দিয়ে ঘুমাক এটাই কি উদ্দেশ্য নাকি মানুষ এ রাত্রে ক্ষমা পাওয়ার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করুক এটা উদ্দেশ্য? সুস্থ মস্তিষ্কের যে কারো নিকট এ প্রশ্নের উত্তর অজানা নয়। একারণে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম এ রাত্রে ইবাদত বন্দেগী করেছেন এবং অন্যান্য মানুষকে তা করতে উৎসাহিত করেছেন।

ইমাম নাব্বী, ইবনে রজব আল হাম্বালী, ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ ওলামায়ে কিরাম বেশ কিছু তাবেয়ী হতে শা'বান মাসের অর্ধ রজনীতে ইবাদত বন্দেগী করার কথা বর্ণনা করেছেন। তারাও এ রাতে ইবাদত বন্দেগী করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে আর তা হলো, শা'বান মাসের অর্ধ রজনীর ফজিলত সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে কিন্তু উক্ত রজনীর পর যে দিন আসে তার ফজিলত সম্পর্কে কিছুই বর্ণিত নেই। ঐ দিন সওম পালন করা বা অন্য কোনো ইবাদত করার ব্যাপারেও বিশেষ কোনো নির্দেশনা নেই। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি ভীষণ দুর্বল যার উপর নির্ভর করা যায় না। সুতরাং শা'বান মাসের অর্ধ রজনীর পরবর্তী দিবসে সওম পালন করা বা অন্য কোনো ইবাদত করার বিশেষ কোনো ফজিলত নেই, তবে এটা অন্যান্য দিনের মতো একটি দিন তাই অন্যান্য দিনে যা কিছু আমল করা যায় তা এদিনও করা যায়। যদি এর জন্য বিশেষ কোনো সওয়াব আছে এমন মনে না করা হয়।

শা'বান মাসের অর্ধরজনীতে বাতি প্রজ্বলিত করা, হালুয়া রুটি খাওয়া ইত্যাদি কর্মকান্ডের কোনো ভিত্তি নেই। তাই এগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। এ রাত্রে বিশেষ নিয়মে ১০০ রাকাত সলাত আদায় করা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত আছে তাও ভিত্তিহীন। এসব কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

এ রাতে ভাগ্য লেখা হয় কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে দুটি মত রয়েছে। বেশিরভাগ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো এ রাতে ভাগ্য লেখা হয় এই ধারণা সঠিক নয় বরং শবে কদরের রাতে ভাগ্য লেখা হয়।

এ রাতকে শবে বরাত নামকরণ করা সম্পর্কে কথা হলো, শব শব্দটি ফার্সী যার অর্থ রাত। আর বরাত শব্দটির ব্যাপারে দু' রকম সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো এটা আরবী বারায়াত (براءة) শব্দ হতে এসেছে সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে মুক্তির রজণী। অতএব নামটি সঠিক হবে। যেহেতু এ রাত্রে পাপী বান্দাদের গোনাহ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। আর যদি বরাত শব্দটি ফার্সী বারয়াত (برآت) শব্দ থেকে এসে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে ভাগ্য রজনী। সেক্ষেত্রে ওলামায়ে কিরামের বেশিরভাগের নিকট সঠিক মতে এ নামকরণ ভুল হবে কিন্তু এটাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত বলা যাবে না যেহেতু এর স্বপক্ষে কিছু আলেমের বক্তব্য রয়েছে। মোট কথা শা'বান মাসের অর্ধ রজণীকে শবে বরাত নামকরণে বড়

ধরণের সমস্যা নেই। তবে এটা পরিত্যাগ করে চলাই উত্তম, যেহেতু শবে বরাত বলতে বেশিরভাগ লোক ভাগ্যরজণী বুঝে থাকে। কিন্তু এ রাতে ভাগ্য লিপিবন্ধ করার মতটি বেশিরভাগ আলেমের নিকট সঠিক মত নয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

* উপসংহারঃ

উপরে আমরা এমন কিছু বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছি যেগুলো বর্তমানে বিদয়াত হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে যারা মুসলিম উম্মাহর আক্বীদা-বিশ্বাস বা আমল আখলাকের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেন এবং তা সমাধানের চেষ্টা করেন তারা সর্বাগ্রে এই সকল বিষয়কে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং সংশোধনের চেষ্টা করেন। যারা এই সকল বিষয় পরিত্যাগ করতে চায় না তাদের বিদয়াতী ও পথভ্রষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এভাবে বিনা কারণে মুসলিম উম্মাতকে দুটি ভাগে বিভাক্ত করে ফেলেন। অথচ আমরা দেখেছি এই সকল বিষয় কোনো ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে গণ্য নয়। প্রথমত এগুলো বিদয়াত হিসেবে গণ্য কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। বহু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম এগুলোর পক্ষে অবস্থান করেছেন। দ্বিতীয়ত যারা এসব বিষয়কে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তারাও এগুলোকে হারাম বা পাপের কাজ মনে করেন নি বরং মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন। যার অর্থ এসব কাজে লিপ্ত হলে

কেউ পাপী হয় না, তবে বিশেষ কোনো কারণে এসব পরিত্যাগ করে চলাই উত্তম। সেই সাথে তারা এসব বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বনের কথা বলেছেন। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তারাও মানুষকে এসব থেকে নিষেধ করতে মানা করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া থেকে আমরা পূর্বে এ ব্যাপারে বিস্তারিত মুলনীতি বর্ণনা করেছি। তিনি বলেছেন, অনেক সময় এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রচুর সওয়াব হয় এবং যারা তাদের নিষেধ করছে তাদের তুলনায় যারা এতে লিপ্ত আছে তারা অধিক উত্তম হিসেবে গণ্য হয়। সংক্ষেপে আমরা বলবো, এই সকল বিষয় বিদয়াত কি বিদয়াত নয় এ ব্যাপারে যে কোনো একটি মত আমরা গ্রহণ করতে পারি কিন্তু মানুষকে এসব ব্যাপার নিষেধ করা জরুরী নয়। আর যদি নিষেধ করতেই হয় সেক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। তাদের সাথে স্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তির মতো আচরণ করা যাবে না। এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিদয়াতী বা পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে হৈ হট্টগোল সৃষ্টি করা যাবে না। যে সব ওলামায়ে কিরাম এসব বিষয়ের পক্ষাবলম্বন করেন তাদের নিন্দা করা যাবে না। মোট কথা এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, এই সকল বিষয় মোটেও গুরুত্বপর্ণ কোনো সমস্যা নয় এবং মুসলিমদের আক্বীদা ও আমল সংস্কার তথা আল-আমরু বিল মা'রুফ ওয়ান

নাহী আনিল মুনকার বা দা'ওয়াতী কাজে এসব ব্যাপারে আলোচনা করার তেমন কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। যেহেতু মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে একদল অন্য দলকে নিজের মতের দিকে দা'ওয়াত দেওয়া সঠিক কর্মপন্থা নয়। যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি।

এতদূর আলোচনা পাঠ করে অনেকে ভাবতে পারেন, যদি নিয়ত, মীলাদ, মোনাজাত ইত্যাদি বিষয় নিষিদ্ধ বিদয়াতের মধ্যে গণ্য না হয় তাহলে দুনিয়াতে আদৌ কোনো বিদয়াতের অস্তিত্ব আছে কি? কেউ কেউ ভাবতে পারেন, লেখক সম্ভবত বিদয়াতীদের বাঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রকৃত সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। আমি আসলে বিদয়াতীদের পাকড়াও করার জন্যেই এই গ্রন্থ লিখতে শুরু করেছি। কিন্তু আসল অপরাধীকে পাকড়াও করতে হলে সন্দেহভাজনদের মধ্যে যারা অপরাধী নয় তাদের আগেই চিহ্নিত করতে হয় এবং তাদের পরিত্যাগ করতে হয়। এই গ্রন্থে আমিও সেই নীতি অবলম্বন করেছি। আমি প্রথমেই বিদয়াত বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং সেই সংজ্ঞার আলোকে যারা বিদয়াতী নয় বা কমপক্ষে নিষিদ্ধ বিদয়াতে লিপ্ত নয় বরং মাকরুহ বিদয়াতে লিপ্ত বা এমন বিষয়ে লিপ্ত যে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে তাদের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়ে যারা হারাম বা কুফরী বিদয়াতে লিপ্ত তাদের শক্তভাবে পাকড়াও করার চেষ্টা করছি। এই প্রকল্পটির

কেবল প্রথম অংশটি সম্পন্ন হয়েছে। আমরা সুস্পষ্ট বিদয়াতী ও পথভ্রষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করেছি। এখন আমরা দ্বিতীয় অংশটির দিকে মনোযোগ দেবো। আমরা দেখবো প্রকৃত বিদয়াতী কারা যাদের বিরুদ্ধে আমাদের আমরণ সংগ্রাম করে যাওয়া উচিৎ এবং আপোষহীনভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রসার চালিয়ে যাওয়া উচিৎ।

প্রকৃত বিদয়াতী কারা।

প্রকৃত বিদয়াতী বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে সকল বিদয়াতীদের নিন্দা ও তিরষ্কার করা আমাদের উপর দায়িত্ব এবং যাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা দ্বীনের দা'ওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপরে আমরা বলেছি বিদয়াতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। বিদয়াতের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে অনুত্তম ও অপছন্দনীয় কিছু বিষয় যা হারাম নয় ফলে তাতে লিপ্ত হলে পাপ হওয়ার আশঙ্কা নেই। আমরা বলেছি এই প্রকারের বিদয়াতের বিপরীতে রক্তাক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। দা'ওয়াতী কাজের ক্ষেত্রেও এগুলোর তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। বিপরীত দিকে এমন কিছু বিদয়াত রয়েছে যা হারাম বা ক্ষেত্র বিশেষে শিরক কুফর পর্যন্ত পৌছায় এবং ঐ সকল বিষয় পথভ্রষ্টতা ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেন। এই

সকল বিদয়াতই হলো প্রকৃত বিদয়াত এবং দ্বীনের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এই সকল কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের কঠোর ভাবে নিন্দা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অনবরত প্রচার-প্রসার চালিয়ে যাওয়া ভীষণ জরুরী একটি দায়িত্ব। উপরে আমরা প্রখ্যাত ফকীহ ইজ্জুদ্দিন আব্দুস সালাম হতে বর্ণনা করেছি তিনি বিদয়তকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। হারাম বিদয়াতের উদাহরণে তিনি খারেজী, মু'তাজিলা, মুরজিয়া ইত্যাদি বিদয়াতী ফিরকাসমূহের বিভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাযার আসক্কালানী رحمه الله বিদয়াতী কারা এ প্রসঙ্গে বলেন,

والمبتدع أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة

বিদয়াতী হলো সে যে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বিপরীতে কোনো আক্বীদা রাখে। [ফাতহুল বারী]

মোট কথা যারা ইসলামের কোনো একটি বিধান সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের অনুসারী পরবর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামত পরিত্যাগ করে নিজেদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী মত ব্যক্ত করে তারাই বিদয়াতী। সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের পরবর্তী ওলামায়ে দ্বীনের বক্তব্য মেনে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সুতরাং এ সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আমরা দেখবো বর্তমানে কারা বিভিন্ন বিষয়ে উম্মতের ওলামায়ে কিরামের

ইজমা পরিত্যাগ করে বিভ্রান্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েছে? আমরা তাদের বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করবো। বিদয়াত সম্পর্কে হাদীসে যেসব ভয়াবহতা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো তাদের ব্যাপারে প্রয়োগ করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রসার চালিয়ে যাওয়াকে দ্বীনের দা'ওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মনে করবো। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

১. স্বাধীনচেতা মনোভাব।

স্বাধীনচেতা মনোভাব বলতে আমরা বুঝি কুরআন হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে নিজের মেধা ও মতের উপর চুড়ান্তভাবে নির্ভর করা। সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের অনুসারী পরবর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সরাসরি কুরআন হাদীস বোঝার চেষ্টা করা। এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা পূর্বে গত হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে এধরণের চিন্তাধারা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আধুনা চিন্তাবিদ ও গবেষকদের বেশিরভাগ অংশ এখন এই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। এই চিন্তাধারার ক্ষতিকর প্রভাব সুদূর প্রসারী। এটা নিজে যেমন একটি বিদয়াতী চিন্তাধারা, একইভাবে সকল প্রকার বিদয়াতী মতবাদ এই চিন্তাধারা হতেই উৎসারিত। আমরা দেখেছি খারেজী, ক্বাদরিয়া, মু'তাজিলা ইত্যাদি বিদয়াতী ফিরকাসমূহ আসলে সাহাবায়ে কিরাম ও অভিজ্ঞ ওলামায়ে

দ্বীনের মতামতকে অগ্রাহ্য করার কারণেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। এধরণের স্বাধীনচেতা মনোভাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ সম্পর্কে দলীল প্রমাণও উল্লেখ করেছি। সুতরাং এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে বর্তমানে এমন কিছু লোকের উদ্ভব ঘটেছে যারা মুখে বলে আমরা সালফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামত মেনে চলি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। এই সকল লোকেরা অত্যাধিক ধূর্ত হওয়ার কারণে তাদের কথা-বার্তা হতে বোঝার উপায় থাকে না যে আসলে এরা কুরআন-হাদিসকে নিজেদের মন মতো ব্যাখ্যা করছে। এই সকল লোকদের চিহ্নিত করতে হলে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামত অনুসরণ করা বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এখন আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো। প্রথমেই আমরা বলব, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের অনুসরণ করা বলতে তিনটি বিষয়কে বোঝায়।

ক. ইসলাম সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার সময় কেবল কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস উপস্থাপণ করাই যথেষ্ট মনে না করা বরং সেই সাথে ঐ সকল আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের অনুসারী ওলামায়ে দ্বীনের ব্যাখ্যা কি ছিল তা বর্ণনা করা এবং সে আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

এক শ্রেণীর লোক পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামত মেনে চলার দাবী করে কিন্তু তারা বলে, যেসব বিষয়ে কুরআনের আয়াত রয়েছে এবং সহীহ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে ঐ সকল বিষয়ে অন্য কারো মতামত জানার বা অন্য কারো মতামত উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য কেবল তখন প্রয়োজন হয় যখন কোনো বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে কিছুই উল্লেখ না থাকে। বাহ্যিকভাবে কথাটি সঠিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা কিন্তু সঠিক আক্বীদা নয়। যেসব ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে কিছু উল্লেখ নেই সেখানে যেমন ওলামায়ে কিরামের মন্তব্য জানা প্রয়োজন একইভাবে যেসব বিষয় পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লেখিত আছে সেগুলোর সঠিক অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অত্যাধিক গুরুত্ববহ। যেহেতু পূর্বেই বলা হয়েছে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে হাক্বীকত-মাজাঝ তথা রুপক অর্থ ও প্রকৃত অর্থ, আম-খাস, নাসেখ-মানসুখ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়। এছাড়া আমর ও নাহী তথা আদেশ ও নিষেধ সূচক আজ্ঞার বিভিন্ন অর্থ। যেহেতু আদেশ করার মাধ্যমে কখনও ফরজ বোঝানো হয় আবার কখনও মুস্তাহাব বোঝানো হয় এবং নিষেধ করার মাধ্যমে কখনও হারাম বোঝানো হয় কখনও মাকরুহ বোঝানো হয়। অতএব, কোনো একটি আয়াত

বা হাদীস পেশ করলেই কোনো বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব এ চিন্তাধারা সঠিক নয়। বরং কোনো আয়াত বা হাদীস পেশ করার পূর্বে সেটা মানসুখ কিনা জানতে হবে, সেটার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নাকি রুপক অর্থ তাও জানতে হবে। সেটা আমভাবে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাকি খাসভাবে নির্দিষ্ট একটি পরিসরে প্রযোজ্য সেটা জানতে হবে। উক্ত আয়াতে যে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা আবশ্যিক নাকি ঐচ্ছিক সে বিষয়েও জানতে হবে। আর সন্দেহ নেই যে এই সকল বিষয়ে জানতে হলে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের অনুসারী ওলামায়ে দ্বীনের মতামত অনুসরণ করতে হবে। নিজের মেধা ও মতের উপর নির্ভর করে সরাসরি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মারাত্মক বিভ্রান্তির জন্ম দেবে। এভাবে কুরআন হাদীস বুঝার চেষ্টা করলে কেউ হয়তো মানসুখ আয়াতের উপর আমল করে বসবে এভাবে যেখানে রুপক অর্থ উদ্দেশ্য যেখানে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করবে বা যেখানে কোনো কিছু ঐচ্ছিকভাবে বলা হয়েছে তা আবশ্যিক মনে করবে ইত্যাদি। এভাবে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে। অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের সহযোগীতা ছাড়া কুরআন-হাদিস বোঝার চেষ্টা করলে এধরনের বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়াই স্বাভাবিক। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের অন্তর থেকে ইলম ছিনিয়ে নেন না। বরং ইলম উঠিয়ে নেওয়া হয় অভিজ্ঞ আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে। এভাবে যখন কোনো অভিজ্ঞ আলেম বিদ্যমান থাকে না তখন মানুষ মূর্খ লোকদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের নিকট ফতোয়া চায়। ফলে তারা না জেনে ফতোয়া দেয়। এভাবে তারা নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হয় অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে। [সহীহ বুখারী]

একারণে শাহ ওলীউল্লাহ্ দেহলোবী কোনো বিষয়ে হাদীস পাওয়া গেলে সেটার উপর নির্ভর করে মতামত ব্যক্ত করার পূর্বে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ ব্যাপারে মত দিয়েছেন কিনা তা জেনে নেওয়া শর্ত করেছেন। যাতে বোঝা যায় হাদীসটি মানসুখ নয় বা হাদীসটির যে অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে তা অগ্রহণযোগ্য নয়। শাহ ওলীউল্লাহ দেহলোবী আল-ইনসাফ নামক কিতাবে এ কথা বলেছেন।

সুতরাং কুরআন-হাদীসে কোনো কিছু উল্লেখ থাকলে ঐ বিষয়ে আর কারও মতামত জানার গুরুত্ব নেই বরং আমরা যেভাবে বুঝি সেভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট এটি একটি বিদয়াতী আক্বীদা। যারা মুখে বলে আমরা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামতের অনুসরণ করি কিন্তু অনুসরণ বলতে বোঝায় কেবল যেসব ব্যাপারে কুরআন হাদীসে কিছুই বলা হয় নি সেই সকল বিষয়ে তাদের মতামত অনুসরণ করা আর যেসব ব্যাপারে পবিত্র

কুরআন বা সহীহ হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর সঠিক অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাদের মতামত অনুসরণ করে না, তারা আসলে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামত অনুসরণ করে না। তাদের এ চিন্তাধারা খারেজী, মু'তাজিলা, মুজাসসিমা ইত্যাদি বিভ্রান্ত ও বিদয়াতী ফিরকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেহেতু এই সকল বিদয়াতী ফিরকার লোকেরাও নিজেদের বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসের স্বপক্ষে কিছু আয়াত ও হাদীস ব্যবহার করতো কিন্তু সেগুলো সাহাবায়ে কিরাম ও অভিজ্ঞ ওলামায়ে দ্বীনের মতামত অনুসারে সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতো না।

খ. পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামত অনুসরণ করা বলতে বোঝায় তাদের ঐক্যমত তথা ইজমাকে অকাট্য দলীল মনে করা। ইজমা যে শরীয়তের একটি অকাট্য দলীল এ ব্যাপারে কেউই দ্বিমত করে নি কেবল নিজাম ছাড়া আর সকল ওলামায়ে কিরাম একমত হয়ে তাকে বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমানে কিছু লোক রয়েছে যারা ইজমাকে অকাট্য দলীল মনে করে না। এদের একটি অংশ সরাসরি ইজমাকে অস্বীকার করে না। তারা মুখে দাবী করে আমরা ইজমা মানি কিন্তু পূর্বের মতো এ বিষয়েও তারা গোলোযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। তারা বলে কুরআন-হাদীসের সাথে মিললে আমরা ইজমা মানি আর না মিললে মানি না। এই কথাটিও বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত চমৎকার একটি কথা কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে

এটা আসলে নিজামের বিদয়াতী আক্বীদা ছাড়া কিছুই নয়। সহজ একটি প্রশ্নের মাধ্যমে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যায়।

- ইজমা শরীয়তের দলীল এর অর্থ কী?

এর অর্থ কি এই যে, ইজমার মধ্যে কিছু ভুল রয়েছে এবং কিছু ঠিক রয়েছে অতএব তার একটি অংশ মানতে হবে আর অন্য একটি অংশ পরিত্যাগ করতে হবে? কোনো কিছুকে দলীল বলে স্বীকার করে নিলে কি এটা বলা সম্ভব যে তার মধ্যে ভুল আছে? উদাহরণস্বরূপ আমরা কুরআনের মতো রাসুলের বাণী তথা সহীহ হাদীসকেও শরীয়তের দলীল মনে করি। এর অর্থ আমরা এটা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, সহীহ হাদীসে ভুল থাকতে পারে না। যারা হাদীস অস্বীকার করে তারা বলে আমরা কুরআনের সাথে মিললে হাদীস মানি না মিললে নয়। যারা এমন কথা বলে তারা কি হাদীসকে দলীল মনে করে? অবশ্যই নয়। কারণ তারা হাদীসের সনদ সহীহ হলেও সেটা অকাট্য সত্য এমন মনে করে না বরং এর পরও হাদিসের মধ্যে ভুল থাকতে পারে এমন মনে করে বিধায় কুরআনের সাথে মিলিয়ে যাচাই-বাছায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আমাদের কথার সাথে তাদের কথার পার্কক্য হলো, আমরা বিশ্বাস করি কুরআন ও হাদীস কখনও বিপরীত হতে পারে না। একটির সাথে আরেকটির কোনো অমিল থাকতে পারে না। যেভাবে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের বিপরীত হতে

পারে না। যেহেতু দুটি অকাট্য দলীলের মধ্যে কোনো বৈপরিত্ব বা অমিল থাকতে পারে না। আর যদি কখনও কোনো একটি হাদীসের সাথে পবিত্র কুরআনের বৈপরিত্ব রয়েছে বলে মনে হয় তবে হাদীসটি পরিত্যাগ করতে হবে তা নয় বরং উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে। যেভাবে দুটি আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্ব রয়েছে বলে মনে হলে একটি আয়াতকে পরিত্যাগ করা হয় না বরং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। হয়তো একটি আয়াতকে মানসুখ বলা হয় অথবা একটি আয়াত দ্বারা আরেকটিকে মাখসুস করা হয় ইত্যাদি। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এধরণের বাহ্যিক বৈপরিত্ব সৃষ্টি হলে একই পন্থা অবলম্বন করতে হবে। একটিকে পরিত্যাগ করতে হবে তা নয় বরং দুটির মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু উভয়ই শরীয়তের অকাট্য দলীল। ফলে কোনো একটিকে ভুল হিসেবে পরিত্যাগ করার সুযোগ নেই।

যারা বলে আমরা ইজমা মানি তবে কুরআন-হাদীসের সাথে মিল থাকতে হবে, তারা হাদীস অস্বীকারকারীদের মতো বক্র পন্থা অবলম্বন করেছে। আমাদের কথা হলো ইজমা যদি শরীয়তের দলীল হয় তবে তার সাথে অন্যান্য দলীলের অমিল থাকতে পারে না। তবে অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে যে অমিল রয়েছে। সেক্ষেত্রে দুটি দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে। একটিকে পরিত্যাগ করা যাবে না। যদি কখনও

আমাদের মনে হয় কোনো একটি আয়াত বা হাদীসের বিপরীতে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে তবে আমাদের বুঝতে হবে ঐ আয়াত বা হাদীসের সঠিক অর্থ আমরা অনুধাবন করতে পারছি না। যেহেতু কুরআন-হাদীসের বিপরীতে ওলামায়ে কিরাম ইজমা করতে পারেন না। এমনও হতে পারে যে, উক্ত হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে কিন্তু যে হাদীসের মাধ্যমে মানসুখ হয়েছে সেটা সহীহ সনদে আমাদের নিকট পৌঁছায়নি। উম্মতের ওলামায়ে কিরাম বিষয়টি জানতেন তাই তারা মানসুখ হাদীসটি পরিত্যাগ করার ব্যাপারে ইজমা করেছেন। একারণে বলা হয় ইজমা কুরআন-হাদীসকে মানসুখ করতে পারে না তবে মানসুখ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে।

নাসেখ-মানসুখ কিভাবে প্রমাণিত হয় সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

ومنها ما يعرف بالاجماع كقتل شارب الخمر فى المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالاجماع والاجماع لا ينسخ ولاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ والله أعلم

কখনও কখনও ইজমার মাধ্যমে শরীয়তের কোনো বিধান মানসুখ হওয়ার বিষয়টি জানা যায়। যেমন মদ্যপায়ীকে চতুর্থবারে হত্যা করার বিধানটি (আবু দাউদ বর্ণিত) মানসুখ হয়ে গেছে। ইজমার মাধ্যমে এটার মানসুখ হওয়ার বিষয়টি জানা গেছে। ইজমা শরীয়তের কোনো বিধানকে মানসুখ করে

না তবে ইজমার মাধ্যমে বোঝা যায় যে বিধানটি মানসুখ করার মতো কোনো দলীল নিশ্চয় আছে।

[শারহে মুসলিম]

বদরুদ্দীন আল আয়নী ﵀ বলেন,

وقال المحب الطبري وهذا حكم لا أعلم أحدا قال به وإذا كان كذلك فهو منسوخ والإجماع وإن كان لا ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهر والله أعلم

আত-তাবারী (তাওয়াফ সংক্রান্ত আবু দাউদ বর্নিত একটি হাদীসের ব্যাপারে) বলেন, এই হাদীসটির উপর কেউ আমল করেছেন বলে আমি জানি না। যদি এমনটিই হয়ে থাকে তবে হাদীসটি মানসুখ। ইজমা যদিও কোনো কিছু মানসুখ করে না কিন্তু ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে উক্ত বিধানটি অন্য কোনো বিধান দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। যদিও সে বিধানটি আমাদের নিকট না পৌঁছায়। [উমদাতুল ক্বারী]

কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়।

সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}

যদি মৃত ব্যক্তির দুয়ের অধিক মেয়ে থাকে তবে সে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে।

[সুরা নিসা/১১]

এই আয়াতে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে দুয়ের অধিক মেয়ে থাকলে তারা মোট সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। অথচ সব সয় মেয়েরা তা পায় না। যেমন মৃত্য ব্যক্তি যদি মহিলা হয় আর তার স্বামী, পিতা-মাতা ও তিনজন মেয়ে যদি উত্তরাধিকার হয়। তবে স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ। পিতা-মাতা উভয়ে এক ষষ্ঠমাংশ করে পাবে। তারা মোট পাবে এক তৃতীয়াংশ। আর মেয়েরা পাবে দুই তৃতীয়াংশ। এখানে দেখা যায় পিতা-মাতা ও মেয়েদের দেওয়ার পর সম্পূর্ণ সম্পত্তি শেষ হয়ে যায় (তিন ভাগের দুই ভাগ+তিন ভাগের এক ভাগ=সম্পূর্ণ সম্পত্তি)। স্বামীকে দেওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সাহাবায়ে কিরাম সবার অংশ কিছুটা হ্রাস করার মাধ্যমে এই মাসয়ালার সমাধান করেছেন। ফিকহী পরিভাষায় বিষয়টিকে বলা হয় আওল (عول)। সেক্ষেত্রে মেয়েরা ২৮ ভাগের মধ্যে ১৬ ভাগ পায় যা কোনোক্রমেই মূল সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ নয়। অর্থাৎ আওলের মাধ্যমে সমাধান করলে পবিত্র কুরআনে দুয়ের অধিক সংখ্যক মেয়ের জন্য যে পরিমান সম্পত্তি দেওয়া হয়েছে তারা তা পায় না। তবু এই বিধানটির বিরোধিতা করার উপায় নেই কারণ তা সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমতে (অগ্রহণযোগ্য কিছু মতপার্থক্য ছাড়া) নির্ধারিত হয়েছে।

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}

যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় আর তার কোনো সন্তান না থাকে কিন্তু তার একটি বোন থাকে তবে তার বোন তার সম্পত্তির অর্ধাংশ প্রাপ্ত হবে। [নিসা/১৭৬]

এই আয়াতে কোনো ব্যক্তির সন্তান না থাকলে তার বোন তার সম্পত্তি পাবে এমন বলা হয়েছে অথচ সাহাবায়ে কিরামের যুগ হতে প্রতিষ্ঠিত মত হলো কেবল সন্তান না থাকলেই কারো বোন তার সম্পত্তিতে অংশ পাবে এমন নয় বরং সেই সাথে পিতাও অনুপস্থিত থাকতে হবে। শীয়ারা অবশ্য এই মতটির বিরোধিতা করে। তারা এখানে আয়াতটির প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করে। প্রশ্ন হলো এই বিধানে সাহাবায়ে কিরামের মত পরিত্যাগ করে আয়াতটির প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করার সুযোগ আছে কী?

এধরণের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। এসকল বিষয়ের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, যারা বলে, আমরা ইজমা মানি তবে শর্ত হলো কুরআন-হাদীসের সাথে মিলতে হবে তারা আসলে ইজমা মানা বলতে কি বোঝায় তা সঠিকভাবে জানে না। তারা এটা অনুধাবন করতে পারে না যে, এ কথার মাধ্যমে আসলে ইজমাকে অস্বীকার করা হয়। মূলত এটি নিজামের বিদয়াতী আক্বীদার নতুন সংস্করন।

গ. পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের অনুসরণ করা বলতে একদিকে যেমন তাদের ঐক্যমত তথা ইজমাকে অকাট্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করা বোঝায়। একইভাবে যেসব বিষয়ে তারা দ্বিমত করেন ঐ সকল বিষয়ে প্রতিটি মতকে শ্রদ্ধা করাও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। ওলামায়ে কিরাম যখন কোনো বিষয়ে দ্বিমত করেন তখন আমাদের উচিৎ সে ব্যাপারে সহনশীল হওয়া। এটা স্বীকার করতে হবে যে, এর মধ্যে যে কোনো একটি মত গ্রহণের অধিকার যে কারও রয়েছে। যারা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামতকে উপেক্ষা করে এবং নিজের মতকেই যথেষ্ট মনে করে তারা ভিন্ন মতের লোকদের সাধারনত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে থাকে। এটা একটি বিদয়াতী কর্মপন্থা। সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের মধ্যে অনেক বিষয়ে দ্বিমতে জড়িয়ে পড়তেন কিন্তু তারা একারণে একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতেন না। এই বিদয়াতের সর্ব নিকৃষ্ট স্তর হলো, চার মাজহাব এবং তার অনুসারীদের নিন্দা করা। বর্তমানে এমনকি কিছু কিছু ইখতিলাফী মাসয়ালা জনসম্মুখে পেশ করে চার মাজহাবের বরেণ্য ফোকাহায়ে কিরামকে অত্যন্ত খারাপ ভাবে তিরষ্কার করতেও শোনা যায়। অথচ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ওলামায়ে কিরাম চার মাজহাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং নিজেরা কোনো না কোনো মাজহাবের পরিচয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। এই সকল বিষয় নিয়ে সাধারন মানুষের

মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা একটি সুস্পষ্ট বিদয়াত। যার বিপরীতে প্রচার-প্রসার করা আবশ্যক। যুগশ্রেষ্ঠ ফোকাহায়ে কিরামকে নির্বোধদের কুটুক্তি থেকে রক্ষা করা এবং মুসলিম উম্মাকে একটি অকারণ বিতর্ক ও বিবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য এই চিন্তাধারার মূলৎপাটন একান্ত জরুরী। আর আল্লাহই তাওফীক দাতা।

২. খারেজী ও মুরজিয়া মতবাদ।

খারেজী (خارجي) ও মুরজিয়া (مرجئة) সম্প্রদায় পরষ্পরের বিপরীতমূখী আক্বীদাতে বিশ্বাসী দুটি বিদয়াতী সম্প্রদায়। তাদের মতপার্থক্য মুলত ঈমান ও কুফরের সীমারেখা সম্পর্কে। সত্যপন্থী ওলামায়ে কিরামের নিকট সঠিক মতে ঈমান হলো, অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং কাজে পরিনত করা। খারেজী ও মু'তাজিলারাও অনুরুপ বলেছে। তবে পার্থক্য হলো, ওলামায়ে কিরাম কাজে পরিনত করাকে ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত মনে করেন না বরং ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত মনে করেন। আর খারেজী ও মু'তাজিলারা কাজে পরিনত হওয়ার বিষয়টিকে ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত মনে করে।

ইবনে হাযার আসক্কালানী رحمه الله বলেন,

والمعتزله قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف إنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله

মু'তাজিলারাও বলেছে ঈমান হলো, অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার করা এবং আমলে পরিনত করা তবে তাদের সাথে সালাফদের পার্থক্য হলো, তারা বলেছে ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আমল করা শর্ত আর সালাফরা বলেছেন, ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আমল করা শর্ত। [ফাতহুল বারী]

উদাহরণস্বরুপ যদি কেউ ঈমান আনার পরও কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় বা ফরজ কাজসমূহ পরিত্যাগ করে তবে এই ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হয় না তবে তাকে পরিপূর্ণ ঈমানদ্বারও বলা যায় না। তার ব্যাপারে কথা হলো তার পাপের কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দিতে পারেন তবে সে কাফিরদের মতো চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে না। বরং এক দিন না এক দিন জাহান্নাম থেকে বের হবে। খারেজীদের মতে কাজে পরিণত করা ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত এ কারণে তারা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলে থাকে। মু'তাজিলাদের আক্বীদা খারেজীদের অনুরূপ তবে তারা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলে না। তারা বলে এই ব্যক্তি কাফিরও নয় মুমিনও হয়। কুফর ও ঈমানের মাঝামাঝি তারা আরেকটি স্তরে বিশ্বাস করে। মুরজিয়াদের আক্বীদা এর বিপরীত। তারা আমলকে কোনোভাবেই ঈমানের সাথে

সম্পর্কিত মনে করে না। তারা বলে, ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা। এর পর যে আমলই করা হোক তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। যার অন্তরে বিশ্বাস আছে কোনো পাপের কারণে সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। যেভাবে যার অন্তরে কুফরী আছে কোনো ভাল আমলের কারণে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এদের কেউ কেউ বলে, মুখে ঈমানের দাবী করার পর যদি কেউ মূর্তির সামনে সাজদাও করে বা অন্য কোনো কুফরী কাজে লিপ্ত হয় তবু সে কাফিরে পরিণত হবে না। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। খারেজী ও মুরজিয়াদের মতামতের বিপরীতে সত্যপন্থী ওলামায়ে দ্বীনের আক্বীদা হলো, সাধারন কোনো পাপ কাজের কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা হবে না তবে যদি কেউ এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয় যাতে প্রমাণিত হয় সে শরীয়তকে অবজ্ঞা করে বা তার অন্তরে আসলে অবিশ্বাস রয়েছে তবে তাকে কাফির বলা হবে। যদিও সে মুখে ঈমানের দাবী করে। যেমন, কুরআন ছুঁড়ে ফেলা, মূর্তির সামনে সাজদা করা, কাফিরদের সাজে সজ্জিত হয়ে তাদের ধর্মীয় উৎসবে অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

ইবনে হাযার আল-আসক্বালানী رحمه الله ঈমানের শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করার পর বলেন,

أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر الا أن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم

আমাদের নিকট (দুনিয়ার বিধানে) কেবলমাত্র মুখে স্বীকার করলেই একজন ব্যাক্তি মুমিন হিসেবে গণ্য হবে এবং তাকে কাফির বলা হবে না যদি না তার মধ্যে এমন কোনো কাজ পাওয়া যায় যা তার অন্তরের কুফরীর প্রমাণ বহন করে। যেমন, মূর্তির উদ্দেশ্যে সাজদা করা। [ফাতহুল বারী]

কাজি ইয়াদ ﵀ বলেন,

و كذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر من كافر و إن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم و للشمس و القمر و الصليب و النار و السعي إلى الكنائس و البيع مع أهلها بزيهم : من شد الزنانير و فحص الرؤوس فقد أجمع المسلمون أن هذا [الفعل] لا يوجد إلا من كافر و أن هذه الأفعال علامة على الكفر و إن صرح فاعلها بالإسلام

আমরা এমন প্রত্যেককে কাফির বলব যে এমন কোনো কাজ করে যে বিষয়ে মুসলিমদের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে যে, ঐধরণের কাজ কেবল কাফিরই করতে পারে যাদিও উক্ত কাজ যে করছে সে উক্ত কাজ করার পরও বাহ্যিকভাবে ইসলাম পালন করে। যেমন মূর্তি, চন্দ্র, সূর্য, ক্রুশ, আগুন, ইত্যাদির সামনে সাজদা করা, ইয়াহুদী বা খৃষ্টানদের পোশাক পরে তাদের উপাসনালয়ে গমণ করা, খৃষ্টানদের মত ঝিনার (এক প্রকারের

ফিতা) পরিধান করা বা মাথার চুলে বেড় দেওয়া। কেননা মুসলিমরা ইজমা করেছে যে এসব কাজ কেবল কাফির ছাড়া কেউ করতে পারে না আর এসব কাজ কুফরীর আলামত যদিও উক্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলামের দাবি করে। [আশ শিফা]

একইভাবে কুরআন ছুঁড়ে ফেলা, নবী-রাসুল বা ফেরেস্তাদের গাল-মন্দ করা, শরীয়তের যে কোনো বিষয় নিয়ে তামাশা করা, কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে ওলামায়ে কিরাম কুফরী হিসাবে গণ্য করেছেন। যে ব্যক্তি এসবে লিপ্ত হয় অজ্ঞতা বা বাধ্যতার ওযর না থাকলে তাকে কাফির বলা হবে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তারা এক দিকে যেমন খারেজীদের মতাবাদকে খন্ডায়ন করেছেন এবং কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুসলিমকে কাফির বলার বিষয়টিকে বিদয়াতী আক্বীদা হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিপরীত দিকে সুস্পষ্ট কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়ার পরও কেবল মুখে ঈমানের দাবী করার কারণে কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলা হতে বিরত থাকার বিষয়টিকেও তারা বিভ্রান্ত আক্বীদা হিসেবে গণ্য করেছেন। এমনকি স্পষ্ট কাফিরকে যে কাফির মনে করে না সে নিজেই কাফির হয়ে যাবে এমন মন্তব্য করেছেন।

কাজি ইয়াদ رحمه الله বলেন,

ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك

أو صحح مذهبهم

একই কারণে আমরা কাফির বলবো যারা ইসলামের বিপরীত অন্য ধর্ম ও মতের লোকদের কাফির বলে না বা তাদের ব্যাপারে নিরাবতা অবলম্বন করে বা সন্দেহ প্রকাশ করে বা তাদের মতকে সঠিক বলে।

[আশ-শিফা]

মোট কথা, সত্যপন্থী ওলামায়ে কিরাম খারেজী ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসকে খন্ডায়ন করে ঈমান ও কুফরীর সঠিক সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে বর্তমান যুগেও মানুষের মধ্যে এই সকল বিভ্রান্ত আক্বীদার অস্তিত্ব রয়েছে। কেউ কেউ বিনা কারণে মুসলিমদের কাফির ঘোষণা করছে আবার কেউ কেউ যথাযোগ্য কারণ পাওয়া গেলেও কাউকে কাফির ঘোষণা করার বিপক্ষে সাফাই গেয়ে যাচ্ছে। একদিকে কিছু লোক তাবীজ গ্রহণ করা, তাবারুক ও তাওয়াসসুলে বিশ্বাস করা, মানব রচিত আইনকে সঠিক মনে না করেও কেবল বিচার প্রার্থী হওয়া ইত্যাদি কারণে মুসলমানদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করছে বিপরীত দিকে কিছু লোক এমনকি যে বলে, “দূর্গা মা আমাদের এবার ভাল ফসল দিয়েছে” বা ভিন্ন ধর্মের লোকদের তাদের উপাস্যের নিকট রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ করে তাকেও

কাফির বলে না। সন্দেহ নেই যে, প্রথম দলটি খারেজী এবং দ্বিতীয় দলটি বর্তমানযুগে মুরজিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই সকল চিন্তাধারা যে বিভ্রান্ত তা প্রমাণের জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। এ দুটি দলকে বিদয়াতী প্রমাণের জন্য উপরে যা কিছু বলেছি তাই যথেষ্ট। তবে এসব বিভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের মতের স্বপক্ষে কিছু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপণ করে থাকে। সেগুলোর উত্তর জানা না থাকলে সাধারন মুসলিমরা তাদের বিদয়াতী আক্বীদাতে প্রতারিত হতে পারে। একারণে এখানে সংক্ষেপে উভয় চিন্তাধারার সংশয়গুলো উপস্থাপণ করে তা খন্ডায়নের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

ক. খারেজী তথা তাকফিরি সম্প্রদায়ের সংশয়সমূহ।

খারেজীদের বিভ্রান্ত হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ হলো এমন কিছু আয়াত ও হাদীস যেখানে বিভিন্ন বিষয়কে শিরক-কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে কিন্তু সেখানে আসলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া তথা বড় শিরক বা কুফর উদ্দেশ্য নয় বরং ছোট শিরক বা ছোট কুফর উদ্দেশ্য। অন্য কথায় ঐ সকল আয়াত ও হাদীসে শিরক-কুফরের শারয়ী অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং ভাষাভিত্তিক অর্থ উদ্দেশ্য।

যেমন আল্লাহর বাণী,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

যে কেউ আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না সে কাফির।
[মায়েদা/৪৪]

এই আয়াতের উপর নির্ভর করে দাবী করা হয়, যে শাসক বা বিচারক মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে সে কাফির। অথচ ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য হলো, যদি কেউ মানব রচিত আইনে বিচার করা উত্তম বা কমপক্ষে বৈধ মনে করে সে কাফির হবে কিন্তু যে এটা মনে করে না তবে আল্লাহর আইনের অবাধ্য হয়ে অন্য কোনো আইনে বিচার করে সে পাপী হবে কাফির নয়।

ইবনুল আরাবী আল-মালেকী তার আহ্কামুল কুরআনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَهَذَا يَخْتَلِفُ إِنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ؛ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ ، وَإِنْ حَكَمَ بِهِ هَوًى وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى أَصْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْغُفْرَانِ لِلْمُذْنِبِينَ

এ বিষয়টি বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। যদি সে নিজের তৈরী বিধানকে আল্লাহর বিধান বলে দাবী করে তবে এটা শরীয়ত পরিবর্তন করা বলে গণ্য হবে এবং কুফরী হবে আর যদি সে অবাধ্যতাবশত খেয়ালখুশি মতো বিচার ফয়সালা করে (কিন্তু এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দাবী না করে) তবে সে পাপী হিসেবে গণ্য হবে (কাফির হিসেবে নয়) অতএব, আহ্লুস্‌সুন্নাহ্

ওয়াল জামায়ার মূলনীতি অনুযায়ী তার এ অপরাধ (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে) ক্ষমা হতে পারেন।

ইবনে জারীর তাবারী এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট কথা বলেছেন, তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন,

من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو ظالم فاسقٌ

যে কেউ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে সে কাফির হবে আর যে আল্লাহর বিধানকে স্বীকার করে কিন্তু তা দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে না সে জালেম ও ফাসিক বলে গণ্য হবে।

এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে, বংশ তুলে গালি দেওয়া, বিলাপ করে কাঁদা, জন্ম দাতা বাবার পরিবর্তে অন্য কাউকে বাবা হিসেবে পরিচয় দেওয়া, কোনো মুসলিমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়কে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে চুরি করলে বা জেনা করলে ঈমান থাকে না এমনও বলা হয়েছে। এসকল হাদীসের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে ব্যার্থ হওয়ার কারণে খারেজীরা মনে করেছে যে কোনো পাপে লিপ্ত হলে একজন ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হয়। কিন্তু আসলে এখানে প্রকৃত কুফরী উদ্দেশ্য নয় যেমনটি আমরা পূর্বেই বলেছি।

শিরক-কুফরের মতো- রব, দ্বীন, ইলাহ, ইবাদত, তাগুত ইত্যাদি

শব্দের ব্যাপারেও খারেজীরা একই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। যেখানেই এসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তারা সেখানে শিরক-কুফর প্রমাণের চেষ্টা করেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (تعس عبد الدينار والدرهم) “ টাকা পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক” [সহীহ বুখারী] এই হাদীসের কারণে অনেকে মনে করেছে যে ব্যক্তি হালাল হারাম তোয়াক্কা না করে টাকা উপার্জনের চেষ্টা করে যে টাকা পয়সার ইবাদত করার কারণে কাফিরে পরিণত হয়। অথচ এখানে পূজারী শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে প্রকৃত অর্থে নয়।

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

তারা তাদের পন্ডিতবর্গ ও সন্যাসীদের আল্লাহর পরিবর্তে রব রুপ গ্রহণ করেছে। [তাওবা/৩১]

হাদীসে এসেছে আল্লাহ যা হালাল করেছিল সন্যাসী ও পন্ডিতবর্গ তা হারাম ঘোষণা করতো এবং আল্লাহ যা হারাম করেছিল তারা তা হালাল ঘোষণা করতো। এ বিষয়টিকেই এই আয়াতে ইবাদত করা তথা রব মেনে নেওয়া বলা হয়েছে। এই আয়াতটি এবং তার ব্যাখ্যায় বর্ণিত হাদীসটির উপর নির্ভর করে অনেকে দাবী করে আল্লাহর আদেশের বিপরীতে কারো আদেশ মেনে চললে

তা কুফরী হবে। অথচ এখানে রব মনে করার বিষয়টি রূপক অর্থে বলা হয়েছে প্রকৃত অর্থ নয়।

ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন,

قال أهل المعاني: جعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شي، ومنه قوله تعالى:" قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً" أي كالنار

ভাষাবিদরা বলেছেন, তারা তাদের পন্ডিতবর্গ ও সন্যাসীদের রবের মতো মর্যাদা প্রদান করেছে যেহেতু তারা প্রতিটি বিষয়ে তাদের আনুগত্য করেছে। যেভাবে আল্লাহ বলেন, "যুল কারনাইন বলল তোমরা ফু দাও, এমন কি তা (শিসা) আগুন হয়ে গেল। [কাহফ/৯৬] অর্থাৎ আগুনের মতো হয়ে গেল।

[তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম বাগাবী ﵀ বলেন,

فإن قيل: إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان؟ قلنا: معناه أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلّوا وحرّموا ما حرّموا، فاتخذوهم كالأرباب

যদি কেউ বলে, তারা তো তাদের পন্ডিত ও সন্যাসীদের ইবাদত করতো না। আমরা বলব, এখানে অর্থ হলো, তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করতো এবং তাদের কথা মতো হারামকে হালাল জ্ঞান করতো আর হালালকে হারাম করতো। এভাবে তারা তাদের রবের মতো গন্য করেছিল।

এ আয়াত প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন,

وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا - حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ

এরা নিজেদের সন্যাসী ও পন্ডিতবর্গকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল যেহেতু আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করা এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার ব্যাপারে তারা তাদের আনুগত্য করেছিল। বিষয়টি দু’রকম হতে পারে;

এরপর তিনি উভয় প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। প্রথম প্রকারের বর্ণনায় তিনি বলেন,

أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ بَدَّلُوا دِينَ اللَّهِ فَيَتْبَعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ اتِّبَاعًا لِرُؤَسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِينَ الرُّسُلِ فَهَذَا كُفْرٌ

ঐ সকল লোকেরা (সন্যাসী ও পন্ডিতবর্গ) আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন একটি বিধান গ্রহণ করেছে এটা জানা সত্ত্বেও তাদের বিধানটিকেই (সত্য হিসেবে) গ্রহণ করে নেতৃস্থানীয়দের কথা অনুযায়ী আল্লাহ যা হারাম করেছেন সেটাকে হালাল এবং তিনি যা হালাল করেছেন সেটাকে হারাম বলে আক্বীদা রাখে। অথচ সে জানে যে, আল্লাহর বিধান এর বিপরীত। এটা কুফরী হবে।

দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন;

أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيمَانُهُمْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ ثَابِتًا لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أَنَّهَا مَعَاصٍ ؛ فَهَؤُلَاءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ

আর যদি এমন হয় যে, তারা আক্বীদা-বিশ্বাসে হালালকে হালালই মনে করে এবং হারামকে হারামই মনে করে তবে ঐ সকল সন্যাসী ও পন্ডিতবর্গকে অনুসরণ করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে যেমনটি একজন মুসলিম বিভিন্ন প্রকারে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে থাকে তবে সে এটা বিশ্বাস করে যে আসলে সে পাপ করছে। এদের বিধান হবে অন্যান্য পাপীদের মতই (অর্থাৎ তারা কাফির হবে না)।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

মোট কথা, শিরক-কুফর, রব, দ্বীন, ইলাহ, ইবাদত ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত না জানার কারনে খারেজীরা বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা নিজেরা এগুলো অনুধাবনে সক্ষম হয়নি আবার অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টাও করেনি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

সাধারন মুসলিমদের তাকফীরের ক্ষেত্রে খারেজীদের বিভ্রান্তির দ্বিতীয় কারণটি হলো তারা নিজেদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়। এভাবে তারা অন্য মুসলিমকে কাফির

হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় নিজেদের মন মতো ব্যাখ্যা করে এবং যারা সেগুলোর বিরোধিতা করে তাদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে। ঐ সকল বিষয়ে অন্যান্য মুসলিমদের মতামত কি তা লক্ষ্য করে না। অথচ ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো যে সব বিষয় শিরক-কুফর হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত আছে ঐ সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ সলাত পরিত্যাগ করলে একজন ব্যক্তি কাফির হয় কিনা এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। হাম্বালী মাজহাবের কিছু ওলামায়ে কিরাম বলেছেন এটা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে অন্যান্য মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম বিষয়টিকে কুফরী হিসেবে গণ্য করেন নি। এখানে দুটি মতের যে কোনো একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা যে কারও রয়েছে। যেহেতু বিষয়টিতে দ্বিমত রয়েছে। এ হিসেবে কেউ এমন মনে করতে পারে যে, সলাত ত্যাগ করা কুফরী কিন্তু এ মত সকল মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। ফলে ভিন্ন মতালম্বীর লোকেরা যদি সলাত পরিত্যাগ করলেও তাদের কাফির বলা যাবে না। কারণ তাদের মতে এটা কুফরী নয়।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ﵀ বলেন,

أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها

كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان

ইসলামের পাঁচটি রুকন। এগুলোর মধ্যে প্রথম হলো কালেমার সাক্ষ্য দেওয়া এর পর চারটি রুকন। যদি কোনো ব্যাক্তি এই চারটিকে মেনে নেই কিন্তু অলসতার কারণে তা পত্যািগ করে তবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো কিন্তু তাদের কাফির বলব না। আলেমরা এই চারটি বিষয় যে পরিত্যাগ করে সে কাফির হবে কি না সে ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন। আমরা কেবল সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই কাউকে কাফির বলব যে বিষয়ে সমস্ত আলেম একমত হয়েছেন আর তা হলো কালেমার সাক্ষ্য দেওয়া।

[আদ দুরার আস সানিয়্যা]

এ বিষয়ে অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের মতামতও অনুরূপ। তারা মতাপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে নিজের মত অনুযায়ী ভিন্ন মতের লোকদের কাফির বলার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। খারেজীরা কিন্তু এই মূলনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তারা নিজেরা যে বিষয়কে কুফরী মনে করে তার উপর নির্ভর করে সকল মুসলিমদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত আছে কিনা তা লক্ষ্য করে না।

নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার আরেকটি পন্থা হলো অন্যের বক্তব্যকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে কুফরী

প্রমাণ করা। উদাহরণস্বরুপ, আমাদের দেশের মানুষ বসত বাড়ি বা মসজিদের দেওয়ালে আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লিখে রাখে। এক শ্রেণীর লোক বলে এটা শিরক। যেহেতু এর মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসুলকে সমান মনে করা হয়। কিন্তু যারা এটা লেখে তারা আদৌ এই আক্বীদা রাখে কিনা সেটা লক্ষ্য করা হয় না। একইভাবে অনেকে বলে, ইয়া রাসুলাল্লাহ (يا رسول الله) অর্থাৎ “হে আল্লাহর রাসুল”। এক শ্রেণীর লোক বলে এটা শিরক যেহেতু এতে রাসুলকে হাজির-নাজির মনে করা হয় বা রাসুলের নিকট ইস্তিগাছা (استغاثة) তথা সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। যে ব্যক্তি এই কথা বলছে সে কিন্তু এসব আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করে না। এভাবে আরেক জনের বক্তব্য নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে তাকে কাফির প্রমাণের চেষ্টা করা খারেজীদের অভ্যাস। কিন্তু অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম বলেন, (لازم المذهب ليس بمذهب) “কোনো ব্যক্তির কথার ব্যাখ্যা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না”

শাফেঈ মাজহাবের ফকীহ্ ইবনে হাযার আল-হাইতামী رحمه الله তার আল-ই’লাম বিকওয়াতিইল ইসলাম নামক কিতাবে বলেন,

أن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب لأن القائل بالملزوم قد لا يخطر له القول بلازمه

সঠিক মত হলো, কারো কথার ব্যাখ্যা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না যেহেতু এমন হতে পারে উক্ত ব্যক্তি ঐ কথা বলার

সময় সেটার যে এমন ব্যাখ্যা হতে পারে তা চিন্তাই করে নি।

হানাফী মাযহাবের ফকীহ্‌ ইবনে আবেদীন ﵀ বলেন,

وَإِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِكُفْرِ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ عِنْدَ الْبَحْثِ مَعَهُمْ فِي رَدِّ مَذْهَبِهِمْ بِأَنَّهُ كُفْرٌ أَيْ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ بِكَذَا الْكُفْرُ ، وَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ كُفْرَهُمْ ؛ لِأَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبِهِمْ

যদি কখনও আলোচনার সময় মু’তাজিলা বা এই ধরণের বিভ্রান্ত আক্বীদার লোকদের মতামত খন্ডায়নের জন্য স্পষ্টভাবে কুফরীর অভিযোগ উত্থাপন করে বলা হয়, তাদের অমুক কথার ব্যাখ্যা করলে কুফরী প্রমাণিত হয় তবে এর অর্থ তারা কাফির এমন নয়। কেননা একজন ব্যক্তির কথার ব্যাখ্যা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। [রদ্দুল মুহ্‌তার]

মোল্লা আলী কারী ﵀ ইবনে হাযার আল-মাক্কী ﵀ থেকে উল্লেখ করেন,

بل الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أنا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا أن أتوا بمكفر صريح لا استلزامي لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের মত হলো, বিদয়াতী ফিরকাসমূহকে কাফির না বলা যতক্ষণ না তারা স্পষ্ট কোনো কুফরীতে লিপ্ত হয়। তাদের কথা-বার্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কুফরী প্রমানিত হলে যথেষ্ট হবে না। যেহেতু সঠিক মতে কারো কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্গত

ফলাফল তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। [আল-মিরকাত]

খারেজীদের বিভ্রান্তির তৃতীয় কারণটি হলো তারা সাধারন ভাবে কোনো কাজকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা আর নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করার মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। তারা মনে করে যে কাজ কুফরী তাতে লিপ্ত যে কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে। এখানে যে, অজ্ঞতা ও বাধ্যতা বা এই জাতীয় কিছু ওযর থাকতে পারে যে কারণে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার পরও অনেক সময় কাউকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না এ বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা নেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন,

كُلَّمَا رَأَوْهُمْ قَالُوا : مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ اعْتَقَدَ الْمُسْتَمِعُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ شَامِلٌ لِكُلِّ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا أَنَّ التَّكْفِيرَ لَهُ شُـــرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَفِي فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ

কোনো একটি ব্যাপারে আলেমরা যখন বলেন, এটা যে বলে (বা করে) সে কাফির এ থেকে কেউ কেউ মনে করে ঐ কাজে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তি কাফির। তারা এটা চিন্তা করেনি যে, কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির বলার বেশ কিছু নিয়মনীতি ও বাধা-বিঘ্ন রয়েছে। কখনও কখনও তা (কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়ার পরও) নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিকে কাফির বলার ক্ষেত্রে

বাধা হয়ে দাড়ায়। সাধারনভাবে “যে কেউ এ কাজ করে সে কাফির” এমন বলা আর নাম ধরে কাউকে কাফির বলা একই বিষয় নয়।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

এই সকল বিষয়ে বিভ্রান্তির কারণে কিছু লোক সাধারন মুসলিমদের অকারণে কাফির-মুশরিক আখ্যা দিয়ে থাকে। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ঐ হাদীসটি স্মরণ রাখে না যেখানে বলা হয়েছে,

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما

যদি কেউ তার ভাইকে বলে হে কাফির তবে যে কোনো একজনের দিকে তা ফিরে আসে। [সহীহ বুখারী]

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন।

খ. মুরজিয়াদের সংশয় সমূহ:

মুরজিয়াদের আক্বীদা হল, যে ব্যক্তি জন্মসূত্রে মুসলিম বা মুখে ঈমানের দাবী করে সে যদি সুস্পষ্ট কুফরীতেও লিপ্ত হয় এবং এ বিষয়ে যদি তার কোনো ওযরও না পাওয়া যায় তবু তাকে কাফির বলা হতে বিরত থাকা। খারেজীদের মতো তারাও কিছু হাদীসের মূলভাব অনুধাবন না করে কেবলমাত্র বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে এমন মতামত দিয়ে থাকে। যেমন রাসুলুল্লাহ

ﷺ বলেন, (من قال لا اله الا الله دخل الجنة) “ যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে” [তিরমিযী]

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে,

مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ

যে আমাদের মতো সলাত আদায় করে, আমাদের কিবলাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে, আমাদের যবেহকরা পশু খাওয়া বৈধ মনে করে তবে সে মুসলিম। তার (জান ও মালের ব্যাপারে) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা রয়েছে। অতএব, কেউ যেন আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ না করে। [সহীহ্ বুখারী]

এই সকল হাদীস উপস্থাপণ করে তারা দাবী করে যে ব্যক্তি মুখে কালেমা পাঠ করে, সলাত-সওম ইত্যাদি আমল করে, কিবলা মানে সে আর যাই করুক তাকে কখনও কাফির বলা যাবে না। এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা এ বিষয়ে উম্মতের ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে ইসলামের কোনো একটি বিধান অস্বীকার বা অপছন্দ করলে একজন ব্যাক্তি কাফিরে পরিণত হবে। একইভাবে মূর্তির সামনে সাজদা করা, কাফিরদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করা ইত্যাদি কার্যকলাপের মাধ্যমে একজন মুসলিম কাফিরে পরিণত হবে যদিও সে মুখে ঈমান আনার দাবী করে এবং তার অন্যান্য

আমল-আখলাক সুন্দর হয়। এ বিষয়ে ইবনে হাযার আসক্বালানী ও কাজি ইয়াদের বক্তব্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। হানাফী মাজহাবের বিভিন্ন ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ وَأَهْدَى إلَى بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ بَيْضَةً يُرِيدُ تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ كَفَرَ وَحَبَطَ عَمَلُه

যদি কোনো ব্যক্তি ৫০ বছর ইবাদত-বন্দেগী করে কিন্তু বিধর্মীদের উৎসবের দিন ঐ দিনের সম্মানে কোনো মুশরিককে একটি ডিমও উপহার দেয় তবে সে কাফির হবে এবং তার সকল আমল বিনষ্ট হবে।

[বাহরে রায়েক]

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহের ব্যাপারে সঠিক কর্মপন্থা হলো অন্যান্য হাদীসের সাথে সমন্বয় সাধন করে এগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে হবে। কোনো একটি হাদীসকে পৃথকভাবে উপস্থাপণ করে সিদ্ধান্ত বর্ণনা করলে মারাত্মক বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, (من صلي البردين دخل الجنة) যে কেউ দুটি ঠান্ডার সময়ের সলাত আদায় করে (ফজর ও আসর) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে [বুখারী ও মুসলিম]। এ হাদীসের অর্থ কখনও এমন নয় যে, অন্যান্য সলাত পরিত্যাগ করে কেবল এ দুটি সলাত আদায় করলে জান্নাতের গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে। এমনও বলা যাবে না যে, ফজর ও আসর সলাত আদায় করলে একজন ব্যক্তি জান্নাতী হবে যদিও তার

অন্তরে ঈমান না থাকে। বরং জান্নাত পেতে হলে ফজর ও আসরের সাথে অন্যান্য সলাত আদায় করতে হবে, অন্যান্য ফরজ দায়িত্ব পালন করতে হবে, কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। সর্বোপরি ঈমানদান হতে হবে। সুতরাং রাসূলের বাণী- “যে ফজর ও আসরের সলাত আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে” এটা অন্যান্য হাদীসের সাথে মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে পৃথকভাবে নয়। যে মুখে কালেমা পাঠ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এ হাদীসটির ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। কেবল মাত্র কালেমা পাঠ করার মাধ্যমে কেউ জান্নাতী হবে এমন নয় বরং সেই সাথে অন্য সকল কুফরী কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। অন্যান্য হাদীসের সাথে সমন্বয় সাধন করলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়। যদি সকল হাদীস পরিত্যাগ করে এই হাদীসটির উপর নির্ভর করা হয় তাহলে এমনকি মুনাফিকরাও জান্নাতী হবে এমন প্রমাণিত হয়। যেহেতু তারা অন্তরে বিশ্বাস না করলেও মুখে কালেমা পাঠ করতো। আর হাদীসটিতে বলা হচ্ছে মুখে কালেমা পাঠ করলে সে জান্নাতী হবে। পূর্বযুগের মুরজিয়াদের একটি অংশ এ আক্বীদাতে বিশ্বাসী ছিল। অথচ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। অর্থাৎ তারা প্রকাশ্য কাফিরদের তুলনায় নিকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি কিবলামুখী হয়ে সলাত আদায় করে বা মুসলিমদের যবেহ করা মাংস খায় সে মুসলিম এ হাদিসটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মুসলিম হওয়ার জন্য এই হাদীসে উল্লেখিত বিষয়ের সাথে সাথে অন্যান্য শর্তও উপস্থিত থাকতে হবে যা অন্য হাদীসে বলা হয়েছে। মোট কথা বিভিন্ন দলিল প্রমাণের মধ্যে সমন্বয় সাধান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, একটি বা কয়েকটি হাদীসের উপর পৃথকভাবে নির্ভর করে নয়।

এ বিষয়ে মুরজিয়াদের দ্বিতীয় বিভ্রান্তিটি হলো, তারা বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما

যদি কেউ তার ভাইকে বলে হে কাফির তবে যে কোনো একজনের দিকে তা ফিরে আসে। [সহীহ বুখারী]

অতএব, আমরা কাউকে কাফির বলবো না। তাদের এই সংশয়ের উত্তর হলো, সাধারনভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এই হাদীসে যে কাউকে কাফির বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি বরং এখানে যে কাফির নয় তাকে কাফির বলতে নিষেধ করা হয়েছে তাই বলা হয়েছে কাউকে কাফির বলা হলে যে কোনো একজনের দিকে তা ফিরে আসবে। অর্থাৎ যদি উক্ত ব্যক্তি প্রকৃতই কাফির হয় তবে তো এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তা না হলে প্রথম ব্যক্তি গোনাহগার হবে।

সুতরাং যারা সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত তাদের কাফির না বলার স্বপক্ষে এই হাদীসকে উপস্থাপণ করার কোনো যুক্তি নেই।

এই সকল লোকদের তৃতীয় যুক্তিটি হলো, কে কাফির, কে মুসলিম সেটা আল্লাহ বিচার করবেন। দুনিয়াতে বসে এদের বিচার করার কি দরকার? এরা এটা চিন্তা করে না যে, কাউকে কাফির বলা বা না বলার সাথে কেবল আখিরাতের বিচার নির্ভর করে না বরং দুনিয়ার এমন অনেক বিধান রয়েছে যা এর সাথে সম্পর্কিত। যে মুসললিম কাফির হয়ে যায় তার জানাযা পড়া হারাম, তার সাথে বিবাহ করা হারাম, তাকে মুসলমানদের নেতা বানানো বা সলাতের ইমাম বানানো হারাম, তাকে হত্যা করা ফরজ, যদি তাকে কেউ হত্যা করে তার পাপ হবে না বরং সওয়াব হবে, যদি তার বাবা মুসলিম হয় তবে সে তার ববার সম্পত্তিতে ওয়ারিছ হবে না ইত্যাদি সুস্পষ্ট বিধান ইসলামে বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে একজন ব্যক্তি কাফির কি কাফির নয় দুনিয়াতে বসেই তা নির্ণয় করা একান্ত জরুরী একটি বিষয়।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, সাধারন মুসলিমদের কাফির বলার ক্ষেত্রে যেমন অতিরঞ্জন করা যাবে না একইভাবে এ বিষয় পুরপুরি নিরাবতাও অবলম্বন করা যাবে না। বরং নির্দিষ্ট মুলনীতির আলোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হবে। যথাযোগ্য কারণ ছাড়া কাউকে কাফির বলা যাবে না। কিন্তু যে

ব্যক্তি সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং তার কোনো গ্রহণযোগ্য ওযর না থাকে তাকে কাফিরর হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে। খারেজী ও মুরজিয়া উভয় দলে বিদয়াতী আক্বীদা-বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সত্যপন্থী ওলামায়ে দ্বীনের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৩. ভন্ড সুফীদের বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস।

সুফী (صوفي) অর্থ হলো, তাসাউফ পন্থী। তাসাউফ (تصوف) বা সুফী (صوفي) শব্দটির উৎস সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত আছে। সঠিক মতে তাসাউফ শব্দটি সুফ (صوف) শব্দ হতে এসেছে। যার অর্থ ‘পশম’। তাসাউফপন্থীরা নাফসকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুনিয়ার ভোগ-বিলাশ পরিত্যাগ করতো। আরামদায়ক পোশাকের পরিবর্তে পশমের পোশাক পরিধান করতো। একারণে তাদের সুফী বলা হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, জাহেলী যুগে একদল লোক দুনিয়াবী কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতো। তাদের বলা হতো সুফা (صوفة)। তাসাউফ বা সুফী নামটি সেখান থেকেই এসেছে। যেহেতু প্রথম যুগের তাসাউফপন্থীরা দুনিয়া পরিত্যাগ করে অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতো। [তালবিসু ইবলিস]

ঘটনা যাই হোক, তাসাউফের নামকরণের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় এটা শুরু হয়েছিল দুনিয়ার ভোগ বিলাশ পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়ার মাধ্যমে। দুনিয়ার ভোগ-বিলাশ পরিত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়াকে বলা হয় যুহদ (زهد)। এটা ইসলামে অত্যাধিক ফজিলতপূর্ণ একটি বিষয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বিভিন্ন হাদীসে দুনিয়ার ভোগ-বিলাশ পরিত্যাগ করে আল্লার ইবাদতে মশগুল হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একারণে সাহাবায়ে কিরাম এবং উম্মাতের বরেণ্য ওলামায়ে কিরাম দুনিয়ার ভোগ-বিলাশ পরিহার করে চলতেন। তবে তাসাউফপন্থীদের যুহদের সাথে সাহাবায়ে কিরাম ও ওলামায়ে দ্বীনের যুহদের বিস্তর পার্থক্য ছিল। একারণে ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল প্রমুখ ওলামায়ে কিরামকে সুফী বলা হয় না। বরং সুফী বলা হয়, হারিছ আল-মুহাসেবী, জুনায়েদ আল-বাগদাদী, জুন-নুন মিসরী, বায়জিদ বোস্তামী প্রমুখ ব্যক্তিদের। এই পার্থক্যের মৌলিক কারণ হলো, ওলামায়ে কিরাম শরীয়তের দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে সুবিস্তারে অবগত ছিলেন তাই তারা দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারে শরীয়তের সীমা-রেখা অনুসরণ করতেন। কিন্তু প্রথম যুগের তাসাউফপন্থীরা যদিও ইবাদত গোজার ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু শরীয়তের জ্ঞানের দিক থেকে তাদের কমতি ছিল

তাই দুনিয়া ত্যাগ তথা যুহদের ব্যাপারে তারা কিছু বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করেছিল। ওলামায়ে কিরাম তাদের এই অতিরঞ্জনকে নিন্দা করেছেন তবে এই সকল ব্যক্তিদের ঢালাওভাবে নিন্দা করেন নি। যেহেতু তারা ভাল নিয়তে এগুলো করতো আর এ বিষয়ে তারা যেসব অতিরঞ্জন করেছিল তা ছিল শরীয়তের মূলনীতি সম্পর্কে সবিস্তারে না জানার কারণে। একদল লোক দাবী করে, হাসান বছরী, কাজি শুরাইহ, সুফইয়ান ছাওরী প্রমুখ ওলামায়ে কিরাম সুফী ছিলেন এমন কি তারা কোনো কোনো সাহাবাকেও তাসাউফপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করে। যেহেতু তারা সকলে দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। এই কথার উপর আপত্তি উত্থাপন করে ইবনে জাওজী বলেন,

فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف

তাসাউফ এমন একটি মতবাদ যা কেবল দুনিয়াত্যাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু বিষয় রয়েছে। দুনিয়া ত্যাগের সাথে এর পার্থক্য হলো, দুনিয়া ত্যাগের বিষয়টিকে ওলামায়ে কিরামের কেউই নিন্দা করে নি কিন্তু তারা তাসাউফকে নিন্দা করেছেন। [তালবিসু ইবলিস]

মোট কথা, তাসাউফের মধ্যে যুহদ বা দুনিয়া ত্যাগ, তাযকিয়াকে নাফস বা অন্তর পরিষ্কার করা, উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া

ইত্যাদি উত্তম যা কিছু ছিল বা আছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য এবং অনুসরণীয়। কিন্তু এসবের বাইরে কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী অতিরিক্ত যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে সেগুলো নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। এই অতিরিক্ত অংশটি চিহ্নিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী এই সকল বিদয়াতী আক্বীদা বিশ্বাস তাসাউফের মধ্যে একবারে প্রবেশ করেনি বরং যুগের পর যুগ ধরে ধীরে ধীরে এগুলো তাসাউফের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। তাই এসব আক্বীদা-বিশ্বাসকে সহজে শনাক্ত করার জন্য আমরা তাসাউফকে তিনটি পৃথক স্তরে বিভক্ত করে আলোচনা করবো। স্তরগুলো নিম্নরূপ।

ক. প্রথম যুগের তাসাউফ

খ. বিকৃত ও পথভ্রষ্ট তাসাউফ

গ. সংশোধিত তাসাউফ

ক. প্রথম যুগের তাসাউফ:

আমরা পূর্বেই বলেছি তাসাউফের শুরু হয়েছে দুনিয়া ত্যাগ তথা যুহদের মাধ্যমে। একারণে প্রথম যুগের তাসাউফপন্থীদের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম ভাল ধারণা করতেন। তবে তাদের মধ্যেও কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল। সুফীদের একটি বিরাট সমস্য হলো তাদের মধ্যে ইবাদত গোজার লোক যথেষ্ট পাওয়া যেত কিন্তু শরীয়তের জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল কম। শরীয়তের সীমা-রেখা

সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করত। ওলামায়ে কিরাম তাদের অতিরঞ্জনকে অপছন্দ করেছেন এবং সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করেছেন। তাদের কার্যাবলীকে অনুসরণ করতে বারন করেছেন। তবে ঐ সকল ব্যক্তিদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করেন নি। যেহেতু তাদের নিয়ত ভাল ছিল কিন্তু জ্ঞান কম ছিল। দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারে তারা যেসব বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল সে সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

i. নফসকে কষ্ট দেওয়া:

তাসাউফপন্থীদের পরিভাষায় বিষয়টিকে বলা হয়, (مجاهدة النفس) তথা নাফসের সাথে মোজাহাদা (সংগ্রাম) করা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (المجاهد من جاهد نفسه) "প্রকৃত মুজাহিদ সেই যে নিজের নাফসের সাথে জিহাদ করে" [ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাসান সহীহ] সুতরাং নাফসের সাথে মোজাহাদা করা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ। কিন্তু সমস্যা হলো তাসাউফ পন্থীরা নাফসের সাথে মোজাহাদা করা বলতে বোঝায় নাফসকে সকল প্রকার ভোগ-বিলাশ থেকে বিরত রাখা, যদিও তা বৈধ হয় এবং নাফসকে সকল প্রকার কষ্টে নিপতিত করা যদিও শরীয়তে তার নির্দেশ না দেওয়া হয়। তাদের মতে কেবল কষ্ট পাওয়া ছাড়া নাফসের আর কোনো অধিকার নেই। যে

কোনো ভাবে নাফসকে কষ্ট দেওয়াটাই তারা সওবের কাজ মনে করে। একারণে তারা, সুস্বাদু খাবার ও আরাম দায়ক পোশাক বর্জন করতো, একাধারে ৮/১০ দিন সওম পালন করতো, বিবাহ বা স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকতো, সম্পদ উপার্জন করা বা সঞ্চয় করা হতে বিরত থাকতো ইত্যাদি। তাদের কার্যকলাপে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের তুলনায় খৃষ্টানদের সন্যাসব্রতের সাথে অধিক সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু ইসলামে নাফসের সাথে মোজাহাদা বলতে যে কোনো ভাবে নাফসকে কষ্ট দেওয়া বোঝায় না। বরং শরীয়তের বিধানাবলী মেনে চলতে নাফসকে বাধ্য করাই হলো নাফসের সাথে মোজাহাদা। যারা যে কোনো ভাবে নাফসকে কষ্ট দেওয়াটা সওয়াবের কাজ মনে করে তারা বিদয়াতী। যেহেতু তারা এমন পন্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে যার বিধান আল্লাহ দেন নি।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ একজন ব্যক্তিকে রোদে দাড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, এর কি হয়েছে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন,

أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَه

এর নাম আবু ইসরাইল। যে মানত করেছে, বসবে না, ছায়ায় যাবে না (রোদে দাড়িয়ে থাকবে) , কারো সাথে কথা বলবে না

এবং সওম পালন করবে। এটা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে বলো সে যেনো কথা বলে, ছায়ায় যায় এবং বসে আর তার সওম পূর্ণ করে।

ইবনে হাযার আল-আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَفِيهِ أَنَّ كُلّ شَيْء يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَان ، وَلَوْ مَآلًا مِمَّا لَمْ يَرِد بِمَشْرُوعِيَّتِهِ كِتَاب أَوْ سُنَّة كَالْمَشْيِ حَافِيًا وَالْجُلُوس فِي الشَّمْس لَيْسَ هُوَ مِنْ طَاعَة اللَّه

এই হাদীস প্রমাণ করে, মানুষ যা কিছুর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ্যভাবে কষ্ট পায় যদি সে বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে প্রমাণ না থাকে তবে তা আল্লাহর আনুগত্য তথা সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য নয়। যেমন, (পাথরের মধ্যে বা উত্তপ্ত বালিতে) খালী পায়ে হাটা, রোদে বসে থাকা ইত্যাদি। [ফাতহুল বারী]

তাছাড়া নাফসকে কেবল কষ্ট দিতে হবে এটা বিধর্মীদের আক্বীদা-বিশ্বাস। বৌদ্ধরা এমন ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, জীবন একটা অভিসাপ। মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে বারবার পাঠানো হয়। এই জীবন চক্র থেকে মুক্তি পেতে হবে। নাফসকে ভোগ-বিলাশে লিপ্ত রাখলে সে বারবার দুনিয়াতে আগমণ করবে তাই যতদূর সম্ভব তাকে কষ্ট দিতে হবে, যাতে দুনিয়াতে আসতে না চায়। এভাবে এক সময় জীবন নামের এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এধরণের আক্বীদা বিশ্বাসের কারণে তারা নিজেদের শরীরে কাঁটা বিধায়, ধারালো ছুড়ি দ্বারা

আঘাত করে ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় নাফসকে কষ্ট দিয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত তাসাউফপন্থীরা নাফসকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে এই চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে। যে কোনো ভাবে নাফসকে কষ্ট দেওয়াটাই তারা সফলতা মনে করে। নাফসের যে ভাল কিছু পাওয়ার অধিকার আছে তা তারা স্বীকার করে না। অথচ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, সালামান رضي الله عنه আবু দারদা رضي الله عنه এর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখেন আবু দারদার স্ত্রী বেহাল অবস্থায় রয়েছেন। এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আপনার ভাই আবু দারদা তো দুনিয়ার কোনো কিছুর প্রতিই খেয়াল করেন না (সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকেন)। এর পর আবু দারদা ফিরে আসলে সালমান আল-ফারেসী তাকে পানাহার করতে বললে তিনি বলেন, আমি সওম পালন করছি আপনি খেয়ে নিন। সালমান رضي الله عنه বলেন, আপনি না খেলে আমি খাবো না ফলে তিনি খেতে বাধ্য হন। এরপর রাতে আবু দারদা رضي الله عنه (সারা রাত) সলাত পড়ার ইচ্ছা করলে সালমান رضي الله عنه তাকে ঘুমাতে আদেশ করেন। সারা রাত ঘুমিয়ে শেষ রাতের দিকে জাগ্রত হয়ে তারা সলাত আদায় করেন। এর পর তিনি বলেন,

وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه

তোমার উপর তোমার নাফসের হাক আছে, তোমার পরিবারের হক আছে। অতএব, সবার হক আদায় করো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এটা শুনে বলেন, (صدق سلمان) সালমান ঠিকই বলেছে।

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত নফল ইবাদতে লিপ্ত হয়ে নাফসকে কষ্ট দেওয়া সঠিক পন্থা নয়। তাহলে যেসব বিষয় ইবাদত বলেই গণ্য নয় যেমন, উত্তম পোশাক বা সুস্বাদু খাবার পরিত্যাগ করা বা নিজের মনগড়া অন্য কোনো পন্থায় নফসকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদির বিধান কি হতে পারে! এটা একটা বিদয়াতী পন্থা সেকারণে ওলামায়ে কিরাম এর উপর তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

হে ঈমানদ্বাররা তোমরা আল্লাহ যেসব উত্তম জিনিস বৈধ করেছেন তা হারাম জ্ঞান করো না। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [মায়েদা/৮৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায়, ইমাম কুরতুবী رحمه الله আরামদায়ক পোশাক ও সুস্বাদু খাবার পরিত্যাগ করার মতাদর্শকে নিন্দা করেন। তিনি এ বিষয়ে একটি চমৎকার কাহিনীও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি হাসান رحمه الله এর নিকট এসে বলেন, আমার

প্রতিবেশী ফালুদা (দই এর মতো একপ্রকার সুস্বাদু খাবার) খায় না। হাসান ﷺ বলেন, কেনো? উক্ত ব্যক্তি বলে, সে বলে, আমি এর শুকরিয়া আদায় করতে পারবো না। হাসান ﷺ বলেন, সে কি ঠান্ডা পানি খায়? উক্ত ব্যক্তি বলে হ্যাঁ। হাসান ﷺ বলেন,

إن جارك جاهل، فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج

তোমার প্রতিবেশীটি মুর্খ। ঠান্ডা পানিতে আল্লাহর যে নিয়ামত আছে তা ফালুদার তুলনায় অনেক বেশি। (অর্থাৎ সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না এই ভয়ে ফালুদা খায় না, কিন্তু সে যে ঠান্ডা পানি খায় তার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবে?) [তাফসীরে কুরতুবী]

"লিবাসুত তাকওয়া" (لباس التقوي) তথা তাকওয়ার পোশাক সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী ﷺ ঐ সকল লোকদের মতামত খন্ডায়ন করেছেন যারা বলেছে তাকওয়ার পোশাক হলো নিম্নমানের পোশাক, যা আরাম দায়ক বা দামী নয়। এ মতামতের খন্ডায়নে তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী (একজন সাহাবী) একটি পোশাক ক্রয় করেন যার মুল্য ছিল এক হাজার দিরহাম, মালেক ইবনে দিনার খুবই উৎকৃষ্ট মানের পোশাক পরিধান করতেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল প্রায় এক দীনার মুল্যের পোশাক ক্রয় করতেন। এসব ঘটনা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন,

أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب. ويقول:" وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ" هيهات! أترى من ذكرنا تركوا لباس التقوى، لا والله! بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والنهى، وغيرهم أهل دعوى، وقلوبهم خالية من التقوى

অতএব, তাদের অবস্থা কি যারা পশম ও তুলার অমসৃণ পোশাক পরিধান করা অধিক উত্তম বলে দাবী করে আর এ বিষয়ে "তাকওয়ার পোশাকই উত্তম" এই আয়াত পেশ করে! তুমি কি মনে করো আমি যাদের ঘটনা উল্লেখ করলাম তারা তাকওয়ার পোশাক পরিত্যাগ করেছেন? না কখনও নয়! বরং তারাই ছিল প্রকৃত তাকওয়ার অধিকারী ও জ্ঞানবান। কিন্তু এই সকল লোকদের কথাগুলো হলো ফাকা বুলি আর অন্তরগুলো তাকওয়া শূন্য। [তাফসীরে কুরতুবী]

সুতরাং দুনিয়া ত্যাগ করা বলতে বৈধ বিষয় পরিত্যাগ করা বোঝায় না বরং হারাম জিনিস পরিত্যাগ করা বোঝায় আর নাফসের সাথে মোজাহাদা বলতে যে কোনো ভাবে নাফসকে কষ্ট দেওয়া বোঝায় না বরং নাফসকে আল্লাহর আনুগত্যে বাধ্য করাই হলো নাফসের সাথে মোজাহাদা করা।

ii. তাওয়াক্কুলের ভুল ব্যাখ্যা।

প্রথম যুগের তাসাউফপন্থীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তি হলো তারা তাওয়াক্কুল (توكل) তথা আল্লাহর উপর ভরসা করার ব্যাপারটি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতো। তাওয়ক্কুল বলতে তারা হাত

গুটিয়ে বসে থাকা বুঝতো। কোনো প্রকার চেষ্টা প্রচেষ্টা করা তাওয়াক্কুলের বিরোধী মনে করতো। ইবনে জাওযী তালবিসু ইবলিসে এ ব্যাপারে পৃথক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে তিনি তাসাউফপন্থী বিভিন্ন মাশায়েখদের তাওয়াক্কুল সম্পর্কে উদ্ভট কর্মপদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা এখানে তার কিছু অংশ উল্লেখ করছি।

আবু সুলাইমান আদ-দারানী বলেন,

لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوص

যদি আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করতাম তবে চোর-ডাকাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রাচীর নির্মাণ করতাম না বা দরজা বন্ধ করে রাখতাম না।

জুন-নুন মিসরী বলেন,

سافرت سنين وما صح لي التوكل إلا وقتا واحدا ركبت البحر فكسر المركب فتعلقت بخشبة من خشب المركب فقالت لي نفسي ان حكم الله عليك بالغرق فما تنفعك هذه الخشبة فخليت الخشبة فطفت على الماء فوقعت على الساحل

আমি বহুবার সফরে বের হয়েছি কিন্তু একবার ছাড়া কখনও আমার তাওয়াক্কুল সহীহ হয় নি। আমি একটি জাহাজে ছিলাম এমতাবস্থায় জাহাজটি ভেঙে যায়। আর আমি একটি কাঠ ধরে ভাসতে থাকি। তখন আমার মনে হলো, আল্লাহ যদি আমাকে ডুবাতে চান তবে এই কাঠ কি আমাকে বাঁচাতে পারবে! ফলে

আমি কাঠটি ছেড়ে দিলাম এবং পানিতে ভাসতে থাকলাম। এভাবে আমি ডাঙায় পৌছে গেলাম।

আবু ইয়াকুবকে কেউ একজন তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর না দিয়ে নিজের কাছে থাকা একটি দিরহাম দান করে দিলেন। পরে তিনি তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন,

استحييت أن أجيبك وعندي شيء

আমার নিকট কোনো সম্পদ থাকা অবস্থায় তাওয়াক্কুল নিয়ে কথা বলতে লজ্জা বোধ করছিলাম।

এসব বর্ণনা উল্লেখ করে ইবনুল-জাওযী رحمه الله বলেন,

قلة العلم أوجبت هذا التخطيط ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا أنه ليس بينه وبين الأسباب تضاد

জ্ঞানের স্বল্পতাই তাদের এ ধরণের পরিকল্পণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। যদি তারা তাওয়াক্কুলের সঠিক ব্যাখ্যা জানতো তবে বুঝতে পারতো নিজের সাধ্য মতো ব্যাবস্থা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয়।

[তালবিসু ইবলিস]

সত্য কথা হলো এ ধরণের নির্বোধ লোক বর্তমানেও দেখা যায়। তারা বলে, মুমিন ব্যক্তির ঘরে আজকের খাবার থাকলে কালকের খাবারের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করে না। কেউ কেউ বলে,

প্রাসাদে বাস করে আল্লাহ পাওয়া যায় না জঙ্গলে বসে আল্লাহর ধ্যান করতে হয় ইত্যাদি। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ কে কোনো একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করে, উট বেঁধে তওয়াক্কুল করবো নাকি উট ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করবো? তিনি বলেন, (اعقلها وتوكل) "উট বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করো"। [তিরমিযী, নাসায়ী]

সহীহ মুসলিমে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة) "রাসুলুল্লাহ ﷺ এই সম্পদ (ফায়ের সম্পদ) থেকে তার পরিবারের জন্য এক বছরের ব্যায়ভার গ্রহণ করতেন"।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী ﷺ বলেন,

وَفِي هَذَا الْحَدِيث : جَوَاز اِدِّخَار قُوت سَنَة ، وَجَوَاز الِادِّخَار لِلْعِيَالِ ، وَأَنَّ هَذَا لَا يَقْدَح فِي التَّوَكُّل

এই হাদীস প্রমাণ করে, যদি কেউ এক বছরের খাবার সঞ্চয় করে তবে তা বৈধ হবে। এতে প্রমাণিত হয় পরিবার পরিজনের জন্য সঞ্চয় করা বৈধ। এটা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয়। [শারহে মুসলিম]

এরপর তিনি এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের ইজমা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তবে যখন মুসলিম সমাজে খাদ্য সংকট দেখা দেয় তখন নিজের জন্য অতিরিক্ত খাবার জমিয়ে রেখে অন্যান্য

মুসলিমদের সমস্যায় ফেলা যাবে না। সেক্ষেত্রে কয়েক দিন বা এক মাসের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা বৈধ হবে। তিনি বলেন, (وإن كان في وقت سعة اشتري قوت سنة أو أكثر) "যদি স্বাভাবিক অবস্থায় হয় তবে এক বছর বা তার অধিক কালের জন্য খাদ্য ক্রয় করতে সমস্যা নেই" [শারহে মুসলিম]

কিছু লোক পর্যাপ্ত সম্পদ ছাড়াই হজ্জে যাত্রা করতো। শেষে সম্পদের অভাবে তারা ভিক্ষাবৃত্তি করতো। তাদের ব্যাপারে সূরা বাকারার ১৯৭ নং আয়াত নাযিল হয় যেখানে আল্লাহ হজ্জে গমণ করার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ পাথেয় সাথে নিতে আদেশ করেছেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু বকর আল-জাসসাস رحمه الله বলেন,

وهذا يدل على بطلان مذهب المتصوفة الذين يتسمون بالمتوكلة في تركهم التزود والسعي في المعاش

এই আয়াত প্রমাণ করে তাসাউফপন্থীদের আক্বীদা ভুল যারা পাথেয় গ্রহণ এবং রিযিক অন্বেষণ পরিত্যাগ করে নিজেদের তাওয়াক্কুলপন্থী বলে দাবী করে। [আহকামুল কুরআন]

ইবনুল জাওযী رحمه الله বলেন,

وقد لبس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ قال رجل للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أريد أن أخرج إلى مكة على

التوكل من غير زاد فقال له أحمد: فاخرج في غير القافلة قال: لا إلا معهم قال: فعلى جراب الناس توكلت

কেউ কেউ ধোঁকায় পড়েছে। তারা তাওয়াক্কুলের দাবী করে, ফলে পাথেয় ছাড়াই হজ্জে গমণ করে। তারা ভাবে এটাই বুঝি তাওয়াক্কুল। তারা মারাত্মক বিভ্রান্তিতে রয়েছে। একজন ব্যক্তি আহমাদ ইবনে হাম্বালকে বলে আমি পাথেয় ছাড়া তাওয়াক্কুলের উপর হজ্জ করবো। তিনি তাকে বলেন, তুমি কাফেলা পরিত্যাগ করে একাকী রওয়ানা হও। সে বলে, না। তখন তিনি বলেন, তবে কি তোমার তাওয়াক্কুল মানুষের পকেটের উপর! [তালবিসু ইবলিস]

হুবহু একই কথা ইমাম আল-কুরতুবী আহকামুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃত তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ﵀ থেকে চমৎকার একটি কথা বর্ণিত আছে। একজন ব্যক্তি বলে, (لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي) "আমি কোনো কাজ করবো না আমার রিযিক এমনিতেই হাজির হয়ে যাবে।"।

আহমাদ ইবনে হাম্বাল ﵀ বলেন, এই ব্যক্তি মূর্খ। এর পর তিনি নিজের সাধ্যমত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয় এর স্বপক্ষে একটি হাদীস উল্লেখ করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযোগ্য তাওয়াক্কুল করতে তবে তিনি তোমাদের রিযিকের ব্যাবস্থা করতেন যেভাবে পাখিদের রিযিকের ব্যাবস্থা করে থাকেন। তারা সকালে খালি পেটে বের হয় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে। [তিরমিযী বর্ননা করেছেন এবং বলেছেন হাসান সহীহ]

আহমাদ ইবনে হাম্বাল ﵀ বলেন, (فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق) “এই হাদীসে বলা হয়েছে পাখিদেরও রিযিকের অন্বেষণে বের হতে হয়।” [ফাতহুল বারী]

মোট কথা, তাসাউফপন্থীরা তাওয়াক্কুল বলতে যা বোঝায় তা একটি বিদয়াতী আক্কীদা যা পরিত্যাগ করতে হবে।

iii. কিছু সাধারন কথাকে শিরক-কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করা।

তাসাউফ পন্থীদের আরেকটি বিভ্রান্তি হলো, কিছু কিছু শব্দের ব্যাপারে অত্যাধিক কড়াকড়ি করা। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ বলে, ব্যাবসা না করলে খাবো কি? বা অমুকের চিকিৎসায় আমার রোগ সেরে গেলো তবে কেউ কেউ বিষয়টিকে শিকর-কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করে তীব্রভাবে নিন্দা করেন। তারা

বলেন, রোগ সারেন আল্লাহ, রিযিকও আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে সুতরাং উপরের কথাগুলো আল্লাহর শানে চরম বেয়াদবী। অথচ যে মুসলিম এসব কথা বলে, সে ঠিকই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই খাওয়ান এবং তিনিই রোগারোগ্য দান করেন। এই বিশ্বাস রেখেই সে কথাগুলো বলে। পরষ্পরের মধ্যে কথোপকথনের সময় এমন কথা প্রায়ই বলা হয়। বলা হয়, পুরুষ মানুষ সংসার চালায় বা অমুক ছাড়া আমার চলে না ইত্যাদি। এসব কথাকে শিরক-কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করার অর্থ হলো, মুসলমানদের বোকা বানানো। অথচ নবী-রাসূল এবং নেককার ব্যক্তিরা এধরণের কথা উচ্চারণ করা আল্লাহর শানে বেয়াদবী বলে মনে করতেন না।

আল্লাহ ﷻ যখন মুসা ﷺ কে ফেরআউনের নিকট যেতে বললেন, তিনি বলেন,

{قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ}

আমি তাদের নিকট একটি অপরাধ করেছি। আমার ভয় হয় যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।

[ক্বাসাস/৩৩]

এখানে কি এমন বলার সুযোগ আছে যে, মুসা ﷺ "রাখে আল্লাহ মারে কে" এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না?

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ উমর ﵀ কে মক্কার কুরাইশ কাফিরদের নিকট যেতে বললে তিনি বলেন,

إِنِّي أَخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَحَدٌ يَمْنَعُنِي

হে আল্লাহর রাসুল আমার ভয় হয় কুরাইশরা আমার কোনো ক্ষতি করবে। মক্কাতে আদী ইবনে কা’ব গোত্রের (উমর ؓ এর গোত্রের) এমন কেউ নেই যে আমাকে রক্ষা করবে।

[মুসনাদে আহমাদ, সিরাতে ইবনে হিশাম]

অতএব, এমন বলা যাবে কি যে উমর ؓ আল্লাহই রক্ষা করেন এই কথা বিশ্বাস করতেন না বা তার এই কথাটি বেয়াদবী ছিল?

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর যখন আবু বকর ؓ খলীফা হন তখন তিনি ব্যাবসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে উমর ؓ বলেন, আপনি খলীফা হওয়ার পরও ব্যাবসা করতে যাচ্ছেন? এটা শুনে আবু বকর ؓ বলেন,

فمن أين أطعم عيالي

তাহলে আমি আমার পরিবারকে খাওয়াবো কীভাবে?
[তাফসিরে কুরতুবী, ফাতহুল বারী]

মোট কথা, এধরণের মন্তব্য কোনো সমস্যা হিসেবে বিবেচিত নয়। অতএব, এসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা অনুচিত।

এটা হলো প্রথম যুগের তাসাউফ। পাঠক লক্ষ্য করলে অনুধাবন করতে পারবেন যে, প্রথম থেকেই তাসাউফের মধ্যে কিছু ভুল চিন্তা ভাবনা অনুপ্রবেশ করে। সাধারনভাবে বলা হতো দুনিয়া ত্যাগ ও অন্তর পবিত্র করাই তাসাউফের উদ্দেশ্য তবে এর সাথে এমন কিছু আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্যকলাপ অন্তভূর্ক্ত হয়ে গিয়েছিল যে কারণে প্রথম যুগ থেকেই ওলামায়ে কিরাম তাসাউফকে নিন্দা করেছেন। যেমনটি ইবনুল জাওজী ﵀ বর্ণনা করেছেন। তবে তখন যারা তাসাউফের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল তাদের বেশিরভাগই আবেদ ও যাহেদ (দুনিয়া ত্যাগী) ছিল কিন্তু আলেম ছিল না। তাই আলমরা তাদের মতামতের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করেন নি। এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য পন্থা হলো কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি ভুল করলে তার ভুলটি গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। বরং তার ভুল মতামত পরিত্যাগ করে প্রকৃত সত্য অনুসরণ করে চলতে হয়। তবে যদি ভুলের মাত্রা ভয়াবহ পর্যায়ে না হয় এবং যে ব্যক্তি ভুলের মধ্যে পতিত তার মধ্যে সৎ নিয়ত রয়েছে বলে মনে হয় তবে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য না করা। প্রথম যুগের তাসাউফ সম্পর্কে এটাই আমাদের নীতি। আমরা এই সকল বিভ্রান্তিকে স্বীকার করি না তবে সে সময় যারা তাসাউফের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্যও করি না। সেই সাথে আমরা এটাও বলি যে, যদি এসকল বিভ্রান্তি

পরিত্যাগ করে কেবল অন্তর পবিত্র করা এবং আমল আখলাকের উন্নতি সাধন করাকে তাসাউফ বলা হয় তবে সে তাসাউফ প্রশংসিত তাসাউফ বলে গণ্য হবে। বহু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম এ ধরণের তাসাউফকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

খ. বিকৃত ও পথভ্রষ্ট তাসাউফ।

উপরে প্রথম যুগের তাসাউফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তখন বিকৃতি ছিল খুবই স্বল্প পরিসরে। পরবর্তিতে তাসাউফপন্থীদের আক্বীদা-বিশ্বাসে চরম অবনতি ঘটে। পূর্বে আমরা বলেছি সূফীদের মূলনীতি ছিল যে কোনো ভাবে নাফসকে কষ্ট দেওয়া। এই মূলনীতিটির কারণেই একসময় তারা জান্নাতের লোভ এবং জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত করার বিষয়টিকে অপছন্দ করতে শুরু করে। যেহেতু জান্নাত পাওয়া বা জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়াও নাফসের কামনা বাসনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তারা বলতে শুরু করে “আমরা জান্নাতের লোভে বা জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত করি না আমরা ইবাদত করি মওলাকে পাওয়ার জন্য।” কথাটি সাধারনভাবে শুনতে চমৎকার মনে হলেও এটি একটি বিদয়াতী চিন্তাধারা। যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবায়ে কিরাম জান্নাত পাওয়ার আশা করতেন এবং জাহান্নামকে ভয় করতেন। তাসাউফপন্থীদের ক্ষেত্রে এই বিদয়াতী আক্বীদাটি মারাত্মক

ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। যখন তারা জান্নাত পাওয়া ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার বিষয়টি অগুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করে তখন তাদের সামনে একটি অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যায়। তা হলো, যদি জান্নাত জাহান্নামের বিষয়টি নাই থাকে তাহলে আমরা ইবাদত করবো কেন? এত কষ্ট ও মোজাহাদার পুরষ্কারটি কি? তখনই শয়তান তাদের সামনে ভিন্ন একটি উদ্দেশ্য দাঁড় করিয়ে দেয়। তাদের বোঝায় তাসাউফপন্থীরা কষ্ট মোজাহাদা করতে করতে এক পর্যায়ে তাদের সামনে মহান রবের সকল রহস্য উন্মোচিত হয়। তারা আল্লাহর সাথে মিশে যায়। এ বিষয়টিকে বলা হয়, 'ফানা ফিল্লাহ'। সাধারনভাবে এমন মনে করা হতো যে এই স্তরে পৌঁছানোর পর একজন বুযুর্গ ভীষণ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যান। তিনি মুখ দিয়ে যা বলেন তাই বাস্তবায়িত হয়ে যায়। গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে শুরু করে আরশে আজীম পর্যন্ত সকল কিছু তিনি অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে সক্ষম হয়ে যান। কাশফ-ইলহামের মাধ্যমে সব কিছু সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেন। সৃষ্টি জগতের কোনো ব্যাপারই আর তার নিকট গোপন থাকে না। এধরণের অবস্থা সম্পর্কে অনেকে বলে, (فلان اعطي كلمة كن) "অমুককে 'কুন' (كن) তথা 'হও' শব্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যেমন হও বললে সব কিছু হয়ে যায়। উক্ত ব্যক্তিও হও বললে যে কোনো কিছু হয়ে যায়। এক কথায়, কার্যত এমন আক্বীদা রাখা হয় যে,

এ পর্যায়ে একজন বুযুর্গ আল্লাহর ক্ষমতা ও গুণাবলীতে শরীকানা লাভ করে। [নাউযু বিল্লাহ]

এ স্তরে তাসাউফের মধ্যে যেসব মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় সেগুলোকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

i. কারামাতের নামে আল্লাহর ক্ষমতায় শরীকানা দাবী করা।

ভন্ড সূফীরা নিজেদের ক্ষমতার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করতো। আজ-জাহাবী ﷺ তার তারীখে মানছুরে হাল্লাজ সম্পর্কে বলেন,

كان يري الجاهل شيئاً من شعبذته، فإذا وثق به دعاه إلى أنه إله

একজন মুর্খ ব্যক্তি যখন তার ভেল্কিবাজী দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতো তখনই সে তার সামনে নিজেকে রব দাবী করে বসতো। [তা'রীখ]

ইবনে কাছির ﷺ উল্লেখ করেন, হাল্লাজ তার পুত্রবধুকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, যদি তোমার সাথে তোমার স্বামীর কোনো মতপার্থক্য হয় তবে বাড়ির ছাদে উঠে ঘটনা বর্ণনা করবে, আমি (সব কিছু) দেখি ও শুনি।

[আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া]

এছাড়া হাল্লাজ নিজেকে খোদা দাবী করেছিল। বন্ধুদের নিকট লেখা চিঠি পত্রে সে লিখতো, রাহমানুর রাহীমের পক্ষ থেকে অমুকের প্রতি। [ইবনে কাছির, আজ-জাহাবী প্রমুখ]

সুফীদের মধ্যে কেউ কেউ দাবী করতো,

لو بصقت لأطفأت النار

যদি আমি থুথু ফেলি তবে জাহান্নামের আগুন নিভে যাবে।

কেউ কেউ বলতো, (سبحاني) "আমি কত পবিত্র"।

কেউ কেউ বলেছে,

خضنا بحرا الانبياء بساحله

আমরা এমন এক সমুদ্রে আছি নবীরা যার তীরে অবস্থান করছে মাত্র।

বর্তমানেও দেখা যায়, তাসাউফপন্থীরা নিজেদের পীরের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে থাকে। পীরের হাতে হাত দিলে সাত খুন মাপ। পীর শাফায়াত করলে জান্নাত ওয়াজিব ইত্যাদি। এসবই শিরকী আক্বীদা বিশ্বাস যা মক্কার কাফিররা তাদের মূর্তিদের ব্যাপারে পোষণ করতো। আল্লাহর নিকট আমরা এসব থেকে আশ্রয় চাই।

ii. শরীয়তের বিপরীত গোপন জ্ঞানের দাবী করা।

তাসাউফ পন্থীরা কুরআন-হাদীসের বাইরে একপ্রকার গোপন জ্ঞানের দাবী করে যাকে তারা মারেফত বা হাক্বীকত হিসেবে নামকরণ করে। তাদের বিশ্বাস তাসাউফের নিয়মাবলী অনুসরণ করে অন্তর পরিষ্কার করতে থাকলে এক সময় অন্তর এতটা বিশুদ্ধ হয়ে যায় যে মওলা পাকের নূরী তাজাল্লী তাতে প্রকাশিত হয়। তখন আকাশ-পৃথিবীর সকল গোপন তথ্য সুফীর নিকট এমনি এমনি প্রকাশিত হয়ে যায়। তারা এই গোপন জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে দাবী করতো আর কুরআন-হাদীসের জ্ঞানকে বলতো বাহ্যিক জ্ঞান বা খোসা সাদৃশ। তারা আলেম ওলামাদের তিরষ্কার করে বলতো, তারা হাদীস বলে মৃত ব্যক্তিদের নামে (বিভিন্ন রাবীদের সনদে যারা বহু পূর্বেই মারা গেছে)। আর আমরা হাদীস বলি সরাসরি আল্লাহর নিকট হতে। কাশফ ইলহামের মাধ্যমে এরা জাল হাদীসকেও সহীহ প্রমাণ করতো।

আল আলুসী রুহুল মায়ানীতে (كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف) "আমি গোপন ভান্ডার ছিলাম পরে আমি ইচ্ছা করলাম আমাকে কেউ চিনুক তাই আমি সৃষ্টি করলাম যাতে আমাকে চেনা হয়" এই হাদিস প্রসঙ্গে বলেন,

فقال ابن تيمة : إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف ، وكذا قال الزركشي والحافظ ابن حجر . وغيرهما : ومن يرويه

من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً لكن يقول : إنه ثابت كشفاً

ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেছেন, এটা নবী ﷺ এর কথা নয়। এর সহীহ বা যইফ কোনো সনদ নেই। ঝারকাশী, ইবনে হাজার এবং অন্যান্যরা একই কথা বলেছেন। যে সব সুফীরা এই হাদীস বর্ণনা করে তারাও স্বীকার করেন যে এটা সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়, তবে তারা বলেন, এটা কাশফের মাধ্যমে প্রমাণিত।

এরপর তিনি বলেন,

والتصحيح الكشفي شنشنة لهم

আর কাশফের মাধ্যমে হাদীস সহীহ করা সুফীদের নিয়মিত অভ্যাস। [রুহুল মাআনী]

তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা, ফেরেশতা বা নবীদের সাথে কথা বলে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করার দাবী করত। [তালবিসু ইবলিস]

এসকল সূফীরা নিজেদের কাশফ ও ইলহামকে ওহীর মতো নিশ্চিত জ্ঞান করতো। তাই এর উপর নির্ভর করে শরীয়তের বিপরীতে আমল করতো। তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপকে কেউ নিন্দা করলে বলতো, এটা মারেফতের ব্যাপার, তোমরা এর কি বুঝবে! এ প্রসঙ্গে তারা খিজির ﵇ ও মুসা ﵇ এর ঘটনাকে

দলীল হিসেবে উল্লেখ করতো। যেহেতু মুসা ﷵ খিজির ﷵ এর বিভিন্ন কার্যকলাপ অনুধাবন করতে পারেননি। তাই আপত্তি করেছিলেন অথচ সেগুলো সঠিক ছিল। এ ঘটনা সূরা কাহাফে বর্ণিত আছে। ওলামায়ে কিরাম এর উত্তরে বলেছেন, আল্লাহর নিকট হতে কোনো জ্ঞান কেবল নবীদের মাধ্যমেই আসে। মুসা ﷵ এর যুগে একাধিক নবী থাকা সম্ভব ছিল। হয়তো খিজির ﷵ নবী ছিলেন অথবা মুসা ﷵ ছাড়া অন্য কোনো নবীর উম্মত ছিলেন যার নির্দেশে তিনি ঐ সকল কাজ করেছিলেন। মুসা ﷵ তার নিজের জ্ঞান অনুযায়ী খিজির ﷵ এর উপর আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো শরীয়ত থাকা সম্ভব নয়। ওলী, বুযুর্গ, পীর, ফকীর সকলের উপর রাসুলুল্লাহ ﷺ এর শরীয়ত মেনে চলা আবশ্যক। এই শরিয়তের বিপরীতে কেউ যেতে পারবে না। শরীয়তের বিধান অনুযায়ীই সব কিছুর বিচার করা হবে। আর যারা অন্য কোনো পন্থা বা পদ্ধতিতে আল্লাহর বিধান জানার দাবী করবে তাদের যিনদিক আখ্যা দিয়ে হত্যা করা হবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

তার চেয়ে অধিক জালেম কে আছে যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা

বলে অথবা বলে আমার উপর ওহী হয়েছে অথচ তার উপর কিছুই ওহী হয়নি। আর যে বলে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন আমি তার সমপর্যায়ের কিছু নাযিল করতে সক্ষম। [সুরা আনআম / ৯৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল কুরতুবী ﵀ বলেন,

قلت: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة، إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص، فلا يحتاجون لتلك النصوص.وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ، ويستدلون على هذا بالخضر، وأنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم، عما كان عند موسى من تلك الفهوم.وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب، فإنه يلزم منه هدم الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم.

এর মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীস ফিকহ ও পূর্ববর্তী আলেমগণ যে পথে ছিলেন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, আমার অন্তরে এমন ধারণা হয়েছে অথবা আমার অন্তর আমাকে এই খবর দিয়েছে। তারা তাদের অন্তরে যা উদিত হয় এবং

অনুমানে যা শক্ত মনে হয় সেই অনুযায়ী কথা বলে এবং দাবী করে যেহেতু তাদের অন্তর সমস্ত প্রকারের কলূষতা হতে পবিত্র এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের চিন্তা হতে মুক্ত তাই তাদের নিকট আসমানী জ্ঞান ও রব্বানী তথ্য প্রকাশিত হয় ফলে তারা সমস্ত বস্তুর গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত হয় এবং প্রতিটি শাখা প্রশাখায় কি বিধান তা তারা জানতে পারে। ফলে শরীয়তের কোনো কিছুর প্রতি তারা মুখাপেক্ষী নয়। তারা এও বলে যে, শরীয়তের এসব বিধি বিধান কেবল নিম্ন স্তরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য। এর মাধ্যমে বোকা ও সাধারন লোকদের বিচার করা হবে কিন্তু আল্লাহর ওলী ও বিশেষ ব্যক্তিদের এসব কোরআন হাদীসের দলীলের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা যা বলে তার মধ্যে এসেছে, “যত মুফতীই তোমাকে ফতওয়া দিক তুমি তোমার অন্তরের নিকট ফতওয়া চাও”। তারা এ বিষয়ে খিজির عليه السلام কে দলীল হিসাবে পেশ করে। তারা বলে তিনি তো মুসা عليه السلام এর শরীয়তের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন না বরং তার নিকট যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল তাই তার জন্য যথেষ্ট হতো। এ ধরনের কথা কুফরী ও যিনদিকতা। যে এমন বলবে তাকে হত্যা করা হবে, তাকে তওবা করতেও বলা হবেনা। তার সাথে কোনরুপ আলোচনারও প্রয়োজন নেই। কেননা এ ধরনের চিন্তা চেতনা শরীয়তকে ধ্বংস করে এবং প্রমাণ করে যে, আল্লাহর নবী ﷺ এর পরও নবী আসবে। [তাফসীরে কুরতুবী]

iii. ওয়াহদাতুল উযুদ তথা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করা।

তাসাউফ পন্থীরা সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়ংকর যে বিদয়াতটি তৈরী করেছে তা হলো, ওয়াহদাতুল উজুদ (وحدة الوجود) তথা একক অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার সবই একক সত্ত্বা। এগুলো সবই আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া কিছু নয়। [নাউযু বিল্লাহ]

ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ বলেন,

غلاة الصوفية فان اكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسليم وتفويض الأمر بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة ثم غلا بعضهم فعذر الكفار ثم غلا بعضهم فزعم ان المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود وعظم

তাসাউফপন্থীদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রথম যখন আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়ার কথা বলল, তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল বেশি বেশি আনুগত্য করে নিজেকে আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে পেশ করে দেওয়া (তারা সত্যি সত্যিই আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়া উদ্দেশ্যে করেনি)। কিন্তু সুফীদের একদল বাড়াবাড়ি করল (তারা সত্যি সত্যিই আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়ার মতবাদে বিশ্বাসী হলো)। এমনকি তারা মুরজিয়াদের মত বাড়াবাড়ি করল এবং কোনো কাজই বান্দা করে না বরং আল্লাহ করেন এই মতবাদে বিশ্বাসী হলো। ফলে তারা পাপীদের দোষ দিতো না। এমনকি

তাদের একটি দল কাফিরদেরকেও নির্দোষ মনে করত। তারপর তারা আরও বাড়াবাড়ি করল। তারা বলতে শুরু করল, তাওহীদ অর্থ হলো ওয়াহদাতুল উযুদ (وحدة الوجود) বা জগতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সব কিছুকেই আল্লাহ মনে করা (নাউযু বিল্লা)। [ফাতহুল বারী]

মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী বলেছে,

ما آدم في الكون ما إبليس ما ملك سليمان وما بلقيس

الكل إشارة وأنت المعنى يا من هو للقلوب مغناطيس

আদম কিছুই না, ইবলিশও কিছুই না, বাদশা সুলাইমান বা রানী বিলকিস কেউ কিছু না সবই ইশারা মাত্র আর আপনিই (আল্লাহ) উদ্দেশ্য, আপনি অন্তরের জন্য চুম্বক স্বরুপ।

চিন্তা করুন ইবলিশও আল্লাহর একটি রুপ (নাউযু বিল্লাহ)

এই কবিতাটি উল্লেখের পর আল-আলুসী বলেন,

وأكثر كلامه قدس سـره من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوها وإياك أن تقول كما قال ذلك الأجل حتى تصل بتوفيق الله تعالى ما إليه وصل

তার বেশির ভাগ কথাই এধরণের (সব কিছুতেই আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে) বরং তিনি ওয়াহদাতুল উযুদের মা, বাবা, পুত্র এবং ভাই (অর্থাৎ ওয়াহদাতুল উযুদ বা একক অস্তিত্বের মতবাদের সাথে তার এতটাই নিবিড় সম্পর্ক)। খবরদার তুমি

যেনো এমনটি বলো না যেমনটি এই মহান ব্যাক্তি বলেছেন যতক্ষন না তিনি যে স্তরে পৌছেছিলেন তুমিও সে স্তরে পৌছাও। [রুহুল মায়ানী]

রুহুল মায়ানীর লেখকের শেষের কথাটি লক্ষ্যণীয় তিনি বলছেন, এই মহান!? ব্যক্তি যে স্তরে পৌঁছেছিলেন সে স্তরে না পৌঁছানো পর্যন্ত এধরণের কথা যেনো অন্য কেউ না বলে। প্রশ্ন হলো মহান ব্যক্তিদের শরীয়ত কী অন্যদের চেয়ে আলাদা? তাছাড়া আমরা যেটা জানি তা হলো মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ করতে হয়। তারা যা বলে তা বলতে হয় এবং তারা যা করে তা করতে হয়। আসলে মহান ব্যক্তিদের জীবনীও পড়া হয় মূলত তাদের অনুসরণ করার জন্য। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে একজন মহান ব্যক্তি যা করেছেন অন্যদের তা করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

ইমাম শাফেয়ী رحمه الله কত সুন্দরই না বলেছেন!

ولو تصوف رجل أول النهار لم يأت الظهر إلا وهو أحمق

যদি কোনো লোক সকালে তাসাউফে প্রবেশ করে তবে দুপুর হওয়ার আগেই সে আহমক হয়ে যায়।

[সিফাতুস সফওয়া; ইবনুল জাওযী]

‘ওয়াহদাতুল উজুদ’ তথা ‘সব কিছুই আল্লাহ’ এর উপর বিশ্বাস করার অনিবার্য ফলাফল হলো, জগতে যা কিছু ঘটছে তার সবই

আল্লাহ নিজে করছেন। যেহেতু সব কিছুই আল্লাহর অস্তিত্ব। তাই পাপ-পূণ্য, ঈমান-কুফর, তাওহীদ-শিরক ইত্যাদি সবই সমান। মুসলিম আর মুশরিকে কোন ভেদাভেদ নেই।

ইবনে আরাবীর ভাষায়,

عقد الخلائق في الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه

সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন আকীদা স্থাপন করেছে। তারা যা কিছু আকীদা রেখেছে আমি তার সবই মেনে নিচ্ছি (নাউযু বিল্লাহ)।

এই সকল চিন্তাধারা তাসাউফপন্থীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে তাদের বেশিরভাগ এগুলো গোপন রাখতো আর কেউ কেউ প্রকাশ করতো। এসব আক্বীদা যারা প্রকাশ করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলো, হুছাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ ও মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী। এই দুজন স্পষ্ট ধর্মদ্রোহী ছিল। তাদের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপ ইয়াহুদী খৃষ্টানদের চেয়েও খারাপ ছিল। হাল্লাজের জীবনী প্রসঙ্গে পৃথক একটি গ্রন্থে আমরা এসব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আল্লাহর নিকট আমরা এসব বিভ্রান্তি হতে আশ্রই চাই।

গ. সংশোধিত তাসাউফ।

উপরে তাসাউফ পন্থীদের যেসব বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ছিল খুবই মারাত্মক পর্যায়ের। এক সময় মুসলিম সমাজে এসব আক্বীদা-বিশ্বাসের ব্যাপক প্রচার প্রসার ছিল। মানুষ পীরের নিকট প্রার্থনা করতো, পীরকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই জান্নাত লাভ হবে এমন মনে করতো। এমন কি নামধারী আলেমদের একটি বিরাট অংশ তাসাউফের বিভ্রান্ত আক্বীদাতে বিশ্বাসী ছিল। মুসলিম সমাজ দরগা, মাজারে ছেয়ে গিয়েছিল। মাজার পূজা ও অন্যান্য শিরক-কুফরের অস্তিত্বও ছিল আশঙ্কাজনক। তাসাউফপন্থীদের একচেটিয়া প্রচার-প্রসারের একটা মৌলিক কারণ ছিল রাজনৈতিকভাবে সহযোগিতা। সাধারণতা পীর-মুরিদরা দুনিয়ার যে কোনো ব্যাপারে নাক গলানো থেকে দূরে থাকতো। রাজা-বাদশারা যা কিছু জুলম-অত্যাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হতো তারা সেগুলো মুখ বুজে সহ্য করতো। কিন্তু হক্বপন্থী আলেম-ওলামারা এসব ব্যাপারে শাসকদের সাথে সংগ্রাম করতেন। তাদের মুখের সামনে হক্ব কথা শোনাতেন। একারণে বেশিরভাগ মুসলিম রাষ্ট্রে রাজনৈতিকভাবে সূফীরা বেশি সুবিধা ভোগ করতো। আলেম ওলামারা অবশ্য তাদের তীব্রভাবে নিন্দা ও তিরষ্কার করতেন এবং দলিল প্রমাণের মাধ্যমে তাদের মতামত খন্ডায়ন করতেন। কিন্তু তাসাউফপন্থীরা দলীল প্রমাণের তোয়াক্কা করতো না। আর সাধারন মানুষ দলীল প্রমাণ বুঝতো না। তাই এই সকল বিভ্রান্ত

আক্বীদা-বিশ্বাসকে নির্মূল করা কষ্ট সাধ্য হয়ে গিয়েছিল। সত্যপন্থী ওলামায়ে কিরামের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ব্যার্থ করে এসকল বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস বন্যার স্রোতের মতো মুসলিম উম্মাহকে গ্রাস করতে থাকলো। যদি এভাবে চলতে থাকতো তাহলে আমরা এখন দেখতাম, ৯০% মুসলিম কবরপূজা করে এবং পীরের গায়েবী ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। হয়তো আজকে মানছুরে হাল্লাজ বা মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীকে নিন্দা করে কিছু লিখলে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হতো। কিন্তু আল্লাহ ভিন্ন কৌশলে এই ফিতনা থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেছেন। মূলত দুটি কারণে মুসলিম উম্মাহ তাসাউফের ভয়াল আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

i. মুসলিম শাসকদের হক্বের পক্ষাবলম্বন।

কোনো কোনো শাসক মাজার পূজা, পীর ভক্তি প্রভূতি অপকর্মের বিপরীতে হক্বপন্থী ওলামায়ে কিরামের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যেমন, সৌদি আরবের বাদশা শায়েখ আব্দুল ওয়াহহাব নাজদীকে এ ব্যাপারে সহযোগীতা করেন। ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় সেখানে এ ফিতনা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাতিল আক্বীদা বিশ্বাসকে দমন করার জন্য মৌখিক প্রচারের সাথে সাথে তরবারীর আঘাত একান্ত জরুরী। এভাবে

দমন না করলে বিদয়াতী ও বিভ্রান্ত আক্বীদার লোকদের চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব হয় না। মুসলিম উম্মাহর অন্যান্য এলাকাতে একই পন্থায় বিদয়াতী সূফীদের দমন করা গেলে তা নিশ্চয় উত্তম হতো কিন্তু শাসকদের সবাই সমান নয় আবার সব এলাকার অবস্থাও একই রকম নয়। এমন এলাকাও ছিল যেখানে তাসাউফপন্থীদের দৌরাত্ব এতটাই বেশি ছিল যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের দমন করতে গেলে বিদ্রোহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া আল্লাহ ﷻ এই বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। তা না হলে তিনি তো প্রথমেই এটাকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। এই বিভ্রান্ত আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হলে সেই পরীক্ষার সুযোগ থাকে না। হয়তো সে কারণেই সব জায়গায় শাসকদের মাধ্যমে এটা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেন নি। তবে সেসব এলাকাতে সাধারন মুসলিমদের উপর দয়াপরবশ এই ফিতনার তীব্রতা হ্রস করেছেন যাতে পরীক্ষা সহজ হয়। এটা সম্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পন্থায় আর তা হলো,

ii. তাসাউফপন্থীদের ঘরের মধ্যে সংস্কার।

আল্লাহর ইচ্ছায় তাসাউফপন্থীদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব ও সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটলো যারা নিজেরা তাসাউফপন্থীদের নিকট বিশ্বস্ত ও মান্যবর ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলো,

মুজাদ্দেদে আলফে ছানী, শাহ ওলীউল্লাহ দেহলোবী ও তাদের অনুসারী অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম। তাফসীরে রুহুল মায়ানীর লেখক আল-আলুসী এবং তাফসীরে মাজহারীর লেখক ছানাউল্লাহ পানিপথীও এই পর্যায়ের আলেম। তারা নিজেরা তাসাউফপন্থী ছিলেন কিন্তু প্রচলিত তাসাউফের সংস্কার করার চেষ্টা করেছেন। তাসাউফের মধ্যকার বিভিন্ন বিভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাস তারা খন্ডায়ন করেছেন এবং তীব্রভাবে সেগুলোর নিন্দা করেছেন। অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের প্রচার-প্রসারে তাসাউফপন্থীরা কর্ণপাত না করলেও নিজেদের ঘরের লোকের কথায় তাদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তাসাউফপন্থীদের আক্বীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সংশোধন ও সংষ্কার শুরু হয়। কিন্তু ঘরের মধ্যে বসে সংষ্কার করতে হলে কিছুটা ছদ্মবেশ গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। একারণে এসকল ওলামায়ে কিরাম তাসাউফপন্থীদের নিকট সুপরিচিত ও সম্মানিত ব্যাক্তি বা বিষয়ের ব্যাপারে সরাসরি মন্তব্য করতেন না। বরং হয়তো এড়িয়ে যেতেন বা এমনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতেন যাতে শরীয়তের মূলনীতি রক্ষিত হয় আবার তাসাউফপন্থীরাও সন্তুষ্ট হয়। মানছুরে হাল্লাজ, ইবনে আরাবী, ইবনে ফারিদ প্রমুখ ধর্মদ্রোহী যেসব কুফরী কথা বলেছে সে ব্যাপারে তারা কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন। হয়তো তাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্যই করেন নি অথবা শরীয়তের

মানদন্ডে তাদের কার্যকলাপকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, তারা হয়তো বেহুশ অবস্থায় এগুলো বলেছে বা এসব কথার আসলে ভিন্ন কোনো অর্থ রয়েছে যা আমরা বুঝি না।

আল-আলূসী বলেন,

وإياك أن تقول بظاهره مع ما أنت عليه وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل الله تعالى فسلمه لهم بالمعنى الذي أرادوه مما لا تعلمه أنت ولا أنا لا بالمعنى الذي ينقدح في عقلك المشوب بالأوهام

সাবধান! তুমি (যেনো ইবনে আরবীর কথার) প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করো না যেহেতু তুমি একজন নগন্য ব্যক্তি আর যখনই তুমি আল্লাহ ওয়ালাদের!! নিকট এমন (শরীয়ত বিরোধী) কথা শোনো তখন তুমি মনে করবে তুমি জানো না বা আমি জানি না এমন কোনো অর্থেই তারা কথাটি ব্যাবহার করেছেন। খবরদার যেনো তাদের কথার এমন অর্থ করো না তোমার অপূর্ণ বোধ শক্তিতে যেটাকে নিন্দনীয় মনে হচ্ছে।

[তাফসীরে রুহুল মাআনী]

ইবনে আরাবীর পক্ষে ওকালোতী করে ইমাম সুয়ূতীও একটা বই লিখেছেন। যেখানে তিনি একই কথা বলেছেন।

একইভাবে ওয়াহদাতুল উযুদ সম্পর্কেও এই সকল ওলামায়ে দ্বীন সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য দেন নি। তারা না এটাকে সরাসরি স্বীকার করেছেন আর না এটার বিরুদ্ধে স্বোচ্চার হয়েছেন।

এটা হয়তো ঠিক যে, যদি তারা সরাসরি এসব বিষয়ে মন্তব্য করতেন তবে তাসাউফ পন্থীরা তাদের ঘরের লোক না ভেবে পরের লোক ভাবতো। ফলে তাদের সকল কথা পরিত্যাগ করতো। যেভাবে অন্যান্য ওলামায়ে হক্কের কথা পরিত্যাগ করেছিল। সেক্ষেত্রে তাসাউফের মধ্যে যতটুকু সংস্কার হয়েছে তাও সম্ভব হতো না। এটা আমরা স্বীকার করি যে, এভাবে রাখ ঢাক করে প্রচার করার কারণে তাসাউফের মধ্যে কিছু সংস্কার ও সংশোধন সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা এই সকল আলেম-ওলামাদের অবদানকেও স্বীকার করি। তবে সেই সাথে এটাও সত্য যে, এভাবে রাখ ঢাক করার কারণে তাসাউফপন্থীদের অনেক আক্বীদা-বিশ্বাস পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে টিকে থাকার সুযোগ পেয়েছে। মূলত সেকারণেই সংশোধন ও সংস্কারের পরও আজ অবধি যারা হক্কানী পীর হিসেবে পরিচিত তাদের আক্বীদা বিশ্বাসের মধ্যেও এমন কিছু বিভ্রান্তি পাওয়া যায় যা পূর্বের বিভ্রান্তির অনুরূপ।

উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে যারা হক্কানী পীর হিসেবে পরিচিত তাদের কিতাবাদিতে লেখা আছে, পীর সাহেবের ভুল ধরা যাবে না। সগীরা গোনাহ হলে তো ধরাই যাবে না আর যদি কবিরা

গোনাহ হয় তবে কেবল ফকীহ শ্রেণীর লোকেরা ধরতে পারবে অন্যরা নয়। অর্থাৎ সাধারন মুরীদানরা পীর সাহেবকে যদি জেনা করতেও দেখে তবু নিরবে সহ্য করবে, কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না। একইভাবে পীর সাহেব যদি আদেশ করেন তাহলে মুরিদ মদ দিয়ে জায়নামাজ ভিজিয়ে ফেলবে বা জেনা করতে পর্যন্ত সম্মত হয়ে যাবে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, যে এমন বলে তার উদ্দেশ্য হলো, পীর সাহেব মারেফতের জ্ঞানে পারদর্শী। অতএব তার কার্যাবলী ও আদেশ-নির্দেশ শরীয়তের বিপরীত হলেও আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না। যেভাবে মুসা عليه السلام এর জন্য খিজির عليه السلام এর উপর আপত্তি উত্থাপন করা সঠিক ছিল না। এটি আসলে পূর্বের বিভ্রান্ত সুফীদের যুক্তি যা বর্তমানের সুফীরা কিছুটা সংশোধিতভাবে পেশ করে। তাদের প্রশ্ন করলে সরাসরি এটা স্বীকার না করে ভিন্নভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। যেমন, পীর সাহেব বুযুর্গ মানুষ। তিনি শরীয়তের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারেন না। যদি আমাদের নিকট তার কোনো নির্দেশ শরীয়তের বিরুদ্ধে বলে মনে হয় তবু ধরে নিতে হবে এটা আসলে শরীয়তের বিরুদ্ধে নয়। তাই সেটা পালন করতে হবে। এভাবে মূল আক্বীদাটি ঢেকে ফেলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই যুক্তিটিও আরেকটি বিভ্রান্তি। পীর সাহেব শরীয়তের বিরুদ্ধে কোনো নির্দেশ দিতে পারেন না এ বিষয়ে কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়। আমরা তো জানি নবীরা ছাড়া আর

কেউ মা'সুম (নিষ্পাপ) নয়। তাহলে পীর সাহেব যে কোনো পাপে লিপ্ত হবেন না এটার গ্যারান্টি কী?

একইভাবে ওয়াহদাতুল উজুদ তথা সব কিছুই আল্লাহ এই মতবাদটি একটু ভিন্নভাবে প্রচার করা হয়। বলা হয়, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। অথচ মুসলিম উম্মাহ ইজমা করেছেন যে, আল্লাহ ﷻ স্বত্ত্বাগতভাবে তার সৃষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন। তিনি সৃষ্টির মধ্যে নন সৃষ্টিও তার মধ্যে নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَالسَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ سَلَفِ الْأُمَّةِ

পূর্ববর্তী ইমামগণ বলেন, আল্লাহ তার আরশের উপর আছেন সমস্ত সৃষ্টি হতে তিনি সত্ত্বাগতভাবে বিচ্ছিন্ন আছেন। যেমনটি কুরআন সুন্নাহ্ ও পূর্ববর্তীদের ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

অন্য স্থানে তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ لَيْسَ فِي مَخْلُوقَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا فِي ذَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ

তিনি আকাশের উর্দ্ধে আরশের উপর আছেন। তিনি সৃষ্টি থেকে স্বাত্তাগতভাবে বিচ্ছিন্ন আছেন। তার সৃষ্টির মধ্যে তার স্বত্ত্বার কোনো কিছু নেই এবং তার সত্ত্বার মধ্যে তার সৃষ্টির কোনো

কিছু নেই।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইমাম আজ-জাহাবী ﷺ তার আল-উলু নামক কিতাবে বিশটিরও বেশি পূর্ববর্তী বরেণ্য আলেম হতে এ মত বর্ণনা করেছেন। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তার সৃষ্টি হতে স্বত্ত্বাগতভাবে বিচ্ছিন্ন। তিনি সৃষ্টির সাথে মিশ্রিত হন না এবং সৃষ্টি তার সাথে মিশ্রিত হয় না। সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথে তার স্বত্ত্বার কোনো কিছু স্পর্শ করে বা সংযুক্ত হয়ে নেই। তবে তার জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ওলামায়ে কিরাম এই মতবাদটি তুলে ধরেছেন। যা ইমাম আজ-জাহাবী ﷺ তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

একইভাবে পূর্বে বর্ণিত বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসের পক্ষে তর্ক-বিতর্ক করা এবং ঐ সকল আক্বীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী ধর্মদ্রোহীদের আল্লাহর ওলী ও নেককার বুযুর্গ মনে করাও একটি চরম বিভ্রান্তি।

মোট কথা সংশোধন ও সংস্কারের পর যে তাসাউফ আমাদের সামনে দৃশ্যমান রয়েছে সেটিও ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এর মধ্যে বহু সংখ্যক বিদয়াতী চিন্তাধারা রয়েছে। অতএব, আবারও এটার সংশোধন প্রয়োজন। হক্বপন্থী ওলামায়ে কিরামের দায়িত্ব হলো এসব ব্যাপারে শরীয়তের দলীল প্রমাণের অনুসরণ করা এবং বাতিল ও বিভ্রান্ত আক্বীদা পরিত্যাগ করা। বড় বড় বুযুর্গরা

এসব আক্বীদার পক্ষে ছিলেন, এই যুক্তিকে ভ্রান্ত মতবাদকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করা মোটেও সঠিক চিন্তাধারা নয়।

ইবনুল জাওজী ﷬ তাসাউফ পন্থীদের বিভিন্ন বিভ্রান্তি উল্লেখ করে বলেন,

وقعت من بعض أشياخهم غلطات لبعدهم عن العلم فان كان ذلك صحيحا عنهم توجه الرد عليهم إذ لا محاباة في الحق وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول وذلك المذهب من أي شخص صدر

তাসাউফপন্থীদের শায়েখদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু ভুলত্রুটির শিকার হয়েছে। কারণ তারা অজ্ঞ ছিল। তাদের থেকে যেসব ভ্রান্ত কথা বর্ণিত আছে যদি তারা সেগুলো সত্যিই বলে থাকে তবে আমরা যা কিছু প্রতিবাদ করেছি তা তাদের বিরুদ্ধেই। কেননা হক্ব কথা বলার ব্যাপারে কোনো ব্যক্তিকে পরওয়া করা সঠিক নয়। আর যদি সেগুলো তারা না বলে থাকে তবে আমরা কেবল কথাগুলো থেকে মানুষকে সতর্ক করছি। এসব কথা যারাই বলে থাকুক তাদের ব্যাপারে আমাদের পন্থা এটাই। [তালবিসু ইবলিস]

৪. আল্লাহ ﷻ এর সিফাত সম্পর্কে বিভ্রান্তি।

পূর্বযুগে বিভিন্ন বিদয়াতী সম্প্রদায় আল্লাহ ﷻ এর সিফাত সম্পর্কে ভুল ধারণায় পতিত হয়েছিল। মু'তাজিলা ও জাহামিয়্যারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করতো। আর মুজাসসিমা সম্প্রদায় আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে

করতো। আমরা ‘আল-ইতক্বান ফি তাওহিদ আর রাহমান’ নামক গ্রন্থে এই দুটি সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস খন্ডায়ন করে এসব বিষয়ে সত্যপন্থী ওলামায়ে কিরামের আক্বীদা-বিশ্বাস সুবিস্তারে বর্ণনা করেছি। এখানে আমরা তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরবো।

আল্লাহ ﷻ বলেন, ليس كمثله شيء

তার মতো কিছুই নেই। [শুরা/১১]

আল্লাহ ﷻ এর সিফাত সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে এই আয়াতটিকে সকল ওলামায়ে কিরাম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ ﷻ এর সিফাতসমূহ কোনো ভাবেই সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এ ব্যাপারে তারা একমত হয়েছেন। একারণে যেসব আয়াতে আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে চোখ, হাত, নেমে আসা, আরশে সমাসীন হওয়া ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে ওলামায়ে কিরাম ঐ সকল আয়াতকে মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট আয়াত হিসেবে গণ্য করেছেন।

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের একটি বিরাট অংশ এই সকল আয়াত সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতেন না এবং এগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করাও পছন্দ করতেন না। ইমাম মালিককে “আরশে আসীন” হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, (والاقرار به واجب والسؤال عنه بدعة) “এ বিষয়ে ঈমান রাখা ওয়াজিব কিন্তু এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদয়াত” [ফাতহুল বারী] পরবর্তীতে

ওলামায়ে কিরাম ইমাম মালিকের এই কথাটি এ বিষয়ে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা এই সকল আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে অনুৎসাহিত করতেন এবং যত্র-তত্র আলোচনা করা অপছন্দ করতেন। উমর ﵁ থেকে বর্ণিত আছে একজন ব্যক্তি এধরণের প্রশ্ন করলে তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করেন। সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে বাইহাকী সহীহ সনদে বর্ণনা করেণ তিনি সিফাত সম্পর্কিত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, (فتفسيره تلاوته والسكوت عنه) "এসব আয়াতের ব্যাখ্যা হলো তেলাওয়াত করে চুপ থাকা" [ফাতহুল বারী] ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমি আওজাঈ, মালিক ও লাইছকে এইসব আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তারা বলেন, (أمروها بلا كيف) "কেনো মন্তব্য না করেই এগুলো অতিক্রম করে চলে যাও।" [ফাতহুল বারী; ইবনে রজব]। আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরাম হতে এধরণের সতর্কতা অবলম্বনের বর্ণনা প্রচুর পরিমাণ রয়েছে যা এখানে সবিস্তারে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

ওলামায়ে কিরামের একটি অংশ এসব আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা বৈধ মনে করেছেন তবে সেক্ষেত্রে শর্ত হলো, যে ব্যাখ্যাটি করা হচ্ছে তা যেনো আরবী ভাষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং আল্লাহর সম্মানের সাথে খাপ খায়। এর অন্যথা হলে সে ব্যাখ্যা বিদয়াতী ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে।

এই সকল অস্পষ্ট আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করার ব্যাপারে বরেণ্য

ওলামায়ে কিরামের কর্মপন্থা সম্পর্কে ইমাম নাব্বী ﵀ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على مايليق بها على حسب مواقعها وانما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الاصول والفروع ذا رياضة في العلم

জেনে নাও, সিফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের দুটি পন্থা রয়েছে। প্রথম পন্থাটি হলো, বেশিরভাগ বরং সকল সালাফদের পথ। আর তা হলো, আমরা এসব আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করবো না বরং তারা বলেন আমাদের উপর কেবল এতটুকু দায়িত্ব যে আমরা এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপণ করবো এবং নিশ্চিতভাবে মনে করবো যে, এগুলোর এমন কোনো অর্থ আছে যা আল্লাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় (কিন্তু সে অর্থটি কি তা আমরা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবো না)। সেই সাথে দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ ﷻ তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নন এবং তিনি দেহ ধারণ করা, স্থান গ্রহণ করা, স্থানান্তরিত হওয়া, কোনো একটি

নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করা ইত্যাদি সকল প্রকার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হতে পবিত্র। মুতাকাল্লিমীন (কালামশাস্ত্রবিদ) ওলামায়ে কিরামের একটি অংশ এই মতই পোষণ করেন। তাদের মধ্যকার মুহাক্কিকগণ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। এই মতটিই অধিক নিরাপদ।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় পন্থাটি হলো বেশিরভাগ মুতাকাল্লিমীনদের মত। তারা বলেন, এই সকল আয়াতকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যা সঙ্গতিপূর্ণ হয়। তবে এই সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করা কেবল তার জন্য বৈধ হবে যে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখে। তাকে আরবী ভাষা এবং শরীয়তের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখতে হবে। জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে তার ব্যাপক অনুশীলন থাকতে হবে।

[শারহে মুসলিম]

যারা এসকল আয়াতের সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা করা বৈধ মনে করেছেন তারা চোখ, হাত, আঙ্গুল ইত্যাদি শব্দকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী, (واصنع الفلك بأعيننا) "তুমি আমার চোখের সামনে নৌকা নির্মাণ করো" [সূরা হুদ/৩৭] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকরা (بأعيننا) "আমার চোখের সামনে" এর অর্থ সম্পর্কে বলেছন, (بمرأي منا) "আমার দৃষ্টি সীমার মধ্যে", (بحفظنا) "আমার তত্ত্বাবধায়নে"

ইত্যাদি। ইমাম কুরতুবী, ইবনে কাছির, ইমাম বাগাবী, আল-মাওরুদী প্রমুখ মুফাসসিরিনে কিরাম বিভিন্ন সাহাবা ও তাবেয়ী থেকে এই সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে আল্লাহ 'আমার চোখ' বলতে তার ফেরেশতাদের চোখ বুঝিয়েছেন। [কুরতুবী]

অনেকে প্রশ্ন করতে পারে, ফেরেশতাদের চোখকে আল্লাহ কিভাবে আমার চোখ বলবেন। দুদিক থেকে এর উত্তর দেওয়া যায়,

এক. যেহেতু ফেরশতাদের চোখ তিনিই সৃষ্টি করেছেন ফলে তার মালিকও তিনি। তাই এক্ষেত্রে আমার চোখ বলা সম্ভব। যেভাবে আমরা বলি, আমার বই। অর্থাৎ বইটির মালিক আমি। আদম عليه السلام এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেছিলেন, "আমি তার মধ্যে আমার রুহ প্রবেশ করাবো" [হিজর/২৯] এখানে আল্লাহর নিজের স্বত্ত্বাগত রুহ উদ্দেশ্য নয় বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তার মালীকানাধীন একটি রুহ বোঝানো হয়েছে।

দুই. এখানে রুপক অর্থে আল্লাহ সৃষ্টির চোখকে নিজের চোখ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যেভাবে একটি হাদীসে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আমাকে খাবার দাও নি, আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম আমাকে পানি পান করাও নি, আমি রোগাগ্রস্থ ছিলাম আমাকে সেবা করো নি [সহীহ

মুসলিম]। আসলে এখানে অন্যান্য মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও রোগা-বালাইকে আল্লাহ রূপক অর্থে নিজের ব্যাপারে প্রয়োগ করেছেন।

এভাবে যে আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন, “আদমকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি” এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কিরাম বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন, “আল্লাহর দুই হাত উম্মুক্ত রয়েছে” [মায়েদা/৬৪] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী ﵀ হাত (يد) শব্দের বিভিন্ন অর্থের বর্ণনা দিয়েছেন। অঙ্গ অর্থে হাত শব্দের ব্যবহার থেকে শুরু করে, নিয়ামত (نعمة) বা অনুগ্রহ অর্থে, কুদরত (قدرة) ও কুওয়া (قوة) তথা ক্ষমতা প্রদর্শন অর্থে ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থের বর্ণনা দিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ্ ﷻ এর বিশেষ একটি সিফাত যা অঙ্গ নয় আবার প্রকৃত অর্থে হাতও নয় এমন বোঝাতেও হাত শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে ঐ আয়াতটি উল্লেখ করেছেন যেখানে আদম ﵇ কে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন। [সদ/৭৫]

পরবর্তীতে এই আয়াতের ব্যখ্যায়ও তিনি বিভিন্ন মতামত বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন রকম সম্ভাবনার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আদম ﵇ এর সম্মান প্রমাণ করার জন্যই তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেভাবে সালিহ্ ﵇ এর উষ্ট্রীকে আল্লাহর উষ্ট্রী (ناقة الله) বলা হয়েছে এবং

মসজিদকে বিশেষত কা'বা শরীফকে বায়তুল্লাহ্ (بيت الله) বা আল্লাহর ঘর এবং ঈসা ﷺ কে রুহুল্লাহ্ (روح الله) বা আল্লাহর রুহ্ বলা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন,

وقيل: أراد باليد القدرة، يقال: مالي بهذا الأمر يد. وما لي بالحمل الثقيل يدان. ويدل عليه أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع

এমনও বলা হয়ে থাকে যে, এখানে আসলে ক্ষমতা তথা কুদরত উদ্দেশ্য। এমন বলা হয়, ''এ বিষয়ে আমার হাত নেই'' (অর্থাৎ আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই), ''এতো ভারি জিসিন বহন করার মতো দুটি হাত আমার নেই'' (এখানেও ক্ষমতা নেই এটিই উদ্দেশ্য)। এই মতটির স্বপক্ষে প্রমাণ হলো, কুদরত (قدرة) বা ক্ষমতা ছাড়া সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এ ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। [তাফসীরে কুরতুবী]

এরপর তিনি একটি কবিতা উল্লেখ করেন যেখানে ক্ষমতা অর্থে দু'হাত প্রয়োগ করা হয়েছে।

আদম ﷺ কে দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করা সম্পর্কে ইবনে হাযার আসক্কালানী ﷬ বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই তিনি ইবনে বাত্তাল ﷬ থেকে দুটি হাত বলতে দুটি সিফাত বোঝানোর মতটি উল্লেখ করেন। পরে বলেন,

وقال غيره هذا يساق مساق التمثيل للتقريب لأنه عهد ان من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه فيستفاد من ذلك ان العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره

এ ধরণের কথা উপমা হিসেবে বলা হয়ে থাকে যাতে কোনো বিষয় সহজে বোধগম্য হয়। যে ব্যক্তি কোনো বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং সে বিষয়ে যত্নবান হয় সে সেটা স্বহস্তে করে (তাই স্বহস্তে করা বলতে যত্মসহকারে করা বোঝানো হয়েছে)। এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটা বোঝা যায় যে, আদম ﷺ কে যতটা গুরুত্ব সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে অন্যদের সেভাবে করা হয়নি।

এরপর তিনি বলেছেন, হাত শব্দটির বহু অর্থ রয়েছে তার মধ্যে আমি ২৫ টি অর্থ অবগত হতে সক্ষম হয়েছি। পরে তিনি উক্ত ২৫ টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যার প্রতিটির স্বপক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء

সকল মানুষের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে একটি অন্তরের মতোই। আল্লাহ যেভাবে খুশি সেগুলো পরিবর্তন করে থাকেন। [সহীহ্ মুসলিম]

ইমাম নাব্বী রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريبا أحدهما الايمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد قال الله تعالى ليس كمثله شئ والثاني يتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا المراد المجاز كما يقال فلان في قبضتي وفي كفي لا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي ويقال فلان بين إصبعي أقلبه كيف شئت اي انه مني على قهره والتصرف فيه كيف شئت فمعنى الحديث انه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع عليه منها شئ ولا يفوته ما أراده كما لايمتنع على الانسان ما كان بين إصبعيه فخاطب العرب بما يفهمونه

এই হাদীসটি সিফাতের হাদীস সমূহের মধ্যে গণ্য। পূর্বেই বলেছি এ বিষয়ে আলেমদের দুটি মত রয়েছে। একদল আলেম বলেন, এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করতে হবে কোনোভাবেই এগুলোর ব্যাখ্যা করা হবে না এবং তার অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে না। শুধু এতটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এগুলো সত্য ও সঠিক এবং বাহ্যিকভাবে এ থেকে যা কিছু বোধগম্য হচ্ছে তা উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু আল্লাহ্ বলেছেন, কোনো কিছুই তার মতো নয়। দ্বিতীয় মতটি হলো, এসব বর্ণনাকে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে। এই মত অনুযায়ী বলা হবে, এখানে রুপক অর্থে আঙ্গুলের কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয় অমুক আমার মুঠোর মধ্যে বা সে আমার হাতের তালুতে, এর মাধ্যমে এটা বোঝানো হয়না যে, সে আসলেই তার হাতের মুঠোর মধ্যে বা হাতের তালুতে রয়েছে। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, সে আমার ক্ষমতার অধীন রয়েছে। একইভাবে বলা হয়, অমুক আমার দুই

আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে, আমি তাকে যেভাবে খুশি পরিচালনা করি। অর্থাৎ সে আমার অনুগত, আমি তাকে যেভবে খুশি পরিচালিত করি। অতএব হাদীসটির অর্থ হবে, আল্লাহ ﷻ তার বান্দাদের অন্তরসমূহ যেভাবে ইচ্ছা পরিচালিত করে থাকেন। কোনো কিছুই তার আয়াত্বের বাইরে নয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তার বাইরে কেউ যেতে পারে না। যেভাবে একজন মানুষের দুই আঙ্গুলের মাঝে যা থাকে তা তার আয়ত্বের অধীন থাকে। এখানে আরবরা যেভাবে বোঝে সেভাবে তাদের বোঝানো হয়েছে (প্রকৃতই আঙ্গুলের কথা বলা হয় নি)।

এরপর তিনি বলেন,

فان قيل فقدرة الله تعالى واحدة والاصبعان للتثنية فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنية والجمع والله أعلم

যদি কেউ বলে, আল্লাহর ক্ষমতা তো একক তাহলে এখানে দুই আঙ্গুলের কথা বলা হচ্ছে কেন? তবে বলা হবে, পূর্বেই বলেছি এখানে রুপক অর্থ উদ্দেশ্য তাই উপমা হিসেবে মানুষ যেভাবে চিন্তা করে সেভাবে বলা হয়েছে। দ্বিবচণ বা বহুবচন ইত্যাদি কোনো কিছুই এখানে উদ্দেশ্য নয়। [শারহে মুসলিম]

অন্য একটি স্থানে আঙ্গুল সম্পর্কিত বর্ণনার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته وهذا غير ممتنع والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة

এমনও বলা হয় যে এখানে আঙ্গুল বলতে আল্লাহর কোনো সৃষ্টির আঙ্গুল বোঝানো হয়েছে। এটিও অসম্ভব নয়। মোট কথা, এর মাধ্যমে অঙ্গ বোঝা যাবে না। [শারহে মুসলিম]

সিফাত সম্পর্কে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত হলো, পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার উপর এক চুলও বৃদ্ধি করা যাবে না। উদহারণস্বরূপ হাত ও আঙ্গুলের কথা বলা হয়েছে তার সাথে লোম বা নখের কথা কল্পনা করা যাবে না।

আল্লাহ ﷻ এর সুরাত (صورة) তথা আকৃতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কিছুই বলা হয় নি। এ বিষয়ে কিছু হাদীস রয়েছে। কিন্তু একটিতেও প্রকৃত অর্থে আল্লাহর আকৃতি বোঝার উপায় নেই। একটি হাদীসে বলা হয়েছে, (إن الله خلق آدم علي صورته) "আল্লাহ আদমকে তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন" [মুসলিম] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে আল্লাহকে একটি উত্তম আকৃতিতে দেখেন [তিরমিযী]। সহীহ মুসলিমের অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ প্রথমে এমন এক সূরতে আসবেন যাতে মুমিনরা তাকে চিনতে পারবে না পরে তিনি এমন এক সূরতে আসবেন যাতে তারা চিনতে পারবে।

এই সকল হাদীসের সূরত তথা আকৃতি শব্দটি প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যায় না। যেহেতু প্রথম হাদীসটিকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ আদমকে তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহর আকৃতি ধরে নিলে অর্থ হয়, আদম عليه السلام তথা মানুষের আকৃতি আল্লাহর মতো [নাউযু বিল্লাহ]। দ্বিতীয় হাদীসটিতে স্বপ্নে আল্লাহকে দেখার কথা বলা হচ্ছে আর এটা জানা কথা যে, স্বপ্নে যা দেখা হয় তা উপমা স্বরূপ, বাস্তব নয়। একারণে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়। স্বপ্নে যদি সব কিছু সরাসরি দেখা বা শোনা যেতো তবে তো স্বপ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকতো না। তাই স্বপ্নে আল্লাহকে যেভাবে দেখা যায় বাস্তবে তিনি তাই এটা মনে করা সঠিক নয়।

ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

قال القاضي واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها وان رآه الانسان على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام لأن ذلك المرئي غير ذات الله تعالى إذ لا يجوز عليه سبحانه وتعالى التجسم ولا اختلاف الأحوال

কাজি ইয়াদ رحمه الله বলেছেন, আলেমরা একমত হয়েছেন যে, আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব। যদিও কেউ তাকে এমনভাবে দেখে যেটা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়। যেমন হয়তো তাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শারিরিক বৈশিষ্ট্যে দেখে (তবু সমস্যা নেই) কারণ স্বপ্নে যা দেখা যাচ্ছে সেটিই বাস্তবে মহান রব নন (বরং এটা উপমা)। [শারহে মুসিলম]

তৃতীয় হাদীসটিতে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ ﷻ একেক সময় একেক সূরতে প্রকাশিত হচ্ছেন। যদি এখানে সূরাত অর্থ আকৃতি বা রূপ ধরা হয় তবে তার অর্থ হবে আল্লাহ একেক সময় একেক রূপ ধারণ করেন। [নাউযু বিল্লাহ]

হাদীসটির ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান আল-জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وهذا شيء قد تخبط فيه جماعة فالمتقدمون من السلف قرأوه وعبروا ولم ينطقوا بشيء مع علمهم واعتقادهم أن الصورة التي هي تخاطيط لا تجوز على الله عز وجل ولا التغير وهذا أصلان لا بد من اعتقادهما التخاطيط لا تكون إلا في الأجسام والتغير لا يصلح أن يطرأ على الإله

এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী সালফে সালেহীনরা এইসব হাদীস পাঠ করতেন এবং অতিক্রম করে চলে যেতেন তারা এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতেন না। তবে তারা দৃঢ়ভাবে এটা বিশ্বাস করতেন যে, সুরাত (আকৃতি) হলো এটি নির্দিষ্ট গঠন ও রুপরেখা যা আল্লাহর ক্ষেত্রে সঙ্গত নয়। একইভবে তার বৈশিষ্ট্যে কোনোরুপ পরিবর্তন ঘটাও সম্ভব নয়। এদুটি বিষয় এমন দুটি মূলনীতি যা আবশ্যকভাবে বিশ্বাস করতে হবে। কেননা নির্দিষ্ট গঠন ও রুপরেখা কেবল তার থাকতে পারে যার দেহ রয়েছে এবং যিনি ইলাহ তার বৈশিষ্ট্যে কোনোরুপ পরিবর্তন সাধিত হতে পারে না।

এরপর তিনি বলেন,

فإذا وقع اعتقاد هذين الأصلين ثم سكت الساكت عن تفسير هذه الكلمات فقد سلك مذهب القدماء

যে ব্যক্তি এই দুটি বিষয় নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস স্থাপণ করবে এবং নিরব থাকবে সে পূর্ববর্তী সালফে সালেহীনদের পথ অনুসরণ করলো।

এরপর তিনি এ হাদীসটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন এবং এক পর্যায়ে বলেন,

فأحوجتنا لذلك الأدلة إلى تأويل صورة تليق إضافتها إليه سبحانه ويصح عليها التغير والتعريف والتنكير وما ذلك إلا الحال التي يوقع عليها أهل اللغة اسم صورة فيقولون كيف صورتك مع فلان وفلان على صورة من الفقر

(যেহেতু আল্লাহর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হতে পারে না) একারণে আমরা এই হাদীসটির সুরাত শব্দটিকে এমন একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে বাধ্য হই যা আল্লাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। সেই সাথে পরিবর্তিত হওয়া এবং একবার অপরিচিত ও অন্য বার পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়। আর সেই ব্যাখ্যাটি হলো সুরত শব্দটিকে অবস্থা অর্থে গ্রহণ করা। আরবী ভাষাভাষী লোকেরা সুরত শব্দটি এ অর্থে ব্যাবহার করে থাকেন। তারা বলেন, অমুকের সাথে তোমার সুরত কেমন? (অর্থাৎ তার সাথে তোমার সম্পর্ক, সদ্ভাব ইত্যাদির অবস্থা কেমন)। অমুক দরিদ্র সুরতে (দরিদ্র

অবস্থায়) আছে। [কাশফুল মুশকিল]

অর্থাৎ দ্বিতীয়বার এমন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আল্লাহ্ প্রকাশিত হবেন যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে যে আসলে মহাবিশ্বের প্রতিপালক প্রকাশিত হয়েছেন। এই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেই বলা হয়ে সুরত। সুরত এখানে আকৃতি অর্থে নয়।

আল্লাহ ﷻ এর অবস্থান সম্পর্কে বিভ্রান্তি রয়েছে। একদল লোক দাবী করেছে আল্লাহ্ সব জায়গায় আছেন। তারা নিজেদের পক্ষে বেশ কিছু দলিল-প্রমাণ পেশ করেছে। যেমন,

{وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ}

তিনিই আল্লাহ আকাশে ও পৃথিবীতে আছেন। তিনি জানেন তোমরা কি গোপন করো আর কি প্রকাশ করো। [আনয়াম/৩]

{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

আল্লাহ পূর্ব পশ্চিমের মালিক। তোমারা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকে তার চেহারা রয়েছে তিনি সর্বব্যাপী মহাজ্ঞানী। [বাকারা/১১৫]

{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা সেখানেই থাকো না কেনো। তিনি তোমাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন। [হাদীদ/৪]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى

যখন তোমাদের কেউ সলাত আদায় করে সে যেনো তার সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে কেননা যে সলাত আদায় করে আল্লাহ তার সামনের দিকে থাকেন। [বুখারী ও মুসলিম]

এই সকল আয়াত ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করে একদল লোক আল্লাহ ﷻ আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান এমন দাবী করে।

অন্য আর একদল বলেছে তিনি আকাশে আছেন। তারা নিজেদের পক্ষে বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস ব্যাবহার করে। যেমন,

{أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ}

তোমরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে যে যিনি আকাশে আছেন (আল্লাহ) তোমাদের পায়ের নিচের মাটি ধসিয়ে দিতে পারেন ... [মুলক/১৬]

ফিরআউন বলল,

يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى

হে হামান আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করো যাতে আমি আকাশে উঠতে সক্ষম হই এবং মুসার ইলাহকে দেখতে পারি। [সূরা মুমিন/৩৬,৩৭]

তারা বলে, মুসা ﷺ দাবী করেছিলেন যে তার রব আকাশে আছেন সেকারণে ফিরআউন তামাশার ছলে বলেছিল তবে আকাশে উঠে আমি দেখবো সেখানে কোনো রব আছে কিনা।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

পৃথিবীবাসীর প্রতি তোমরা দয়া প্রদর্শন করো যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। [আবু দাউদ, তিরমিযী]

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ একটি দাসীকে প্রশ্ন করেন, (أين الله) "আল্লাহ্ কোথায়?" সে বলে, (في السماء) "আকাশে"। এরপর তিনি বলেন, (فمن أنا) "আমি কে?" সে বলে (انت رسول الله) "আপনি আল্লাহর রাসুল"। একারণে রসুলুল্লাহ্ ﷺ স্বাক্ষ দেন যে, উক্ত দাসীটি ঈমানদার।

এই সকল দলিল-প্রমাণের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে একদল লোক বলে আল্লাহ্ আকাশে আছেন।

এই সকল আয়াত ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করে উপরে যে দুটি মত বর্ণনা করা হয়েছে উভয় মতই ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য। আহ্‌লুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত আক্বীদা হলো, আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই আল্লাহর সৃষ্টি আর আল্লাহ তার সৃষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থান করা হতে পবিত্র। তিনি স্বত্ত্বাগতভাবে সকল সৃষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন। তবে তিনি তার জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে প্রতিটি সৃষ্টির সাথে আছেন। পূর্বে আমরা এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করেছি।

এই হচ্ছে সিফাত সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের মতামত এবং তাদের অনুসৃত পথ। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় কিছু লোক এ বিষয়ে নিজেদের মনগড়া পন্থা-পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাদের কেউ কেউ বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। এদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি এটা আসলে ওয়াহদাতুল উযুদ তথা সর্বেশ্বরবাদের একটি ভিন্নরূপ। এর মাধ্যমে আসলে আল্লাহর নিজস্বগুণাবলীকে অস্বীকার করা হয়। সে হিসেবে এই আক্বীদাটি জাহামিয়াদের আক্বীদার অনুরূপ। এদের বিপরীতে একদল লোক রয়েছে যারা নিজেদের সালাফী হিসেবে দাবী করে কিন্তু আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা

মুজাসসিমাদের পন্থা অবলম্বন করে। উপরে সিফাত সম্পর্কে যে সঠিক আক্বীদা বর্ণনা করা হয়েছে তার আলোকে এই সকল লোকদের চিহ্নিত করার সঠিক উপায় নিচে বর্ণনা করা হলো।

ক. এদের বৈশিষ্ট্য হলো এরা আল্লাহ ﷻ এর সিফাত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে সেগুলো যে মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট বিধান হিসেবে গণ্য তা স্বীকার করে না। আমরা উপরে বলেছি ওলামায়ে কিরাম সিফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিসের মধ্যে অস্পষ্টতা ও জটিলতা আছে বলে মনে করতেন। তারা বলতেন, এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। ফলে এ সম্পর্কে আলোচনা করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। সাধারন লোকদের সামনে তো নয়ই এমন কি তালেবে ইলমদের নিকটও এসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতেন না বরং এড়িয়ে যেতেন। অন্যদের এসব বিষয়ে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতেন না বরং এগুলে সম্পর্কে নিরব থাকতে আদেশ করতেন। যারা যত্রতত্র এসব বিষয়ে প্রশ্ন করতো তাদের বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু বর্তমানে সালাফী নামধারী কিছু লোক সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে থাকে। একজন নির্বোধ লোক তারই মতো কিছু নির্বোধ লোককে সামনে নিয়ে সিফাতের আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। ভরা মজলিসে আল্লাহর হাত-পা, চোখ কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে বলে মন্তব্য করে। এদের

কাছে আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা করাটা অন্যান্য সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার মতই সহজ ও স্বাভাবিক। যারা এসব আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করতে চায় না বরং নিরব থাকে তাদের তিরষ্কার করে বলে, কুরআন-হাদীসে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে অতএব, ভয় পাওয়ার কি আছে! এসব মুর্খরা স্মরণ রাখে না যে, কুরআন ও হাদীসের একটি অংশ মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট যে ব্যাপার নিরব থাকাটাই বেশিরভাগ আলেমের নীতি। এবং সেগুলোর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করলে ভয়াবহ আক্বীদা বিভ্রাট ঘটতে পারে। খৃষ্টানরা একারণেই ধ্বংস হয়েছিল।

ইমাম ইবনুল জাওজী ﵀ বলেন,

فما أشنع مقالة من يصدر قوله عن الجهالة ويتعلق بالظواهر كما تعلقت النصارى في المسيح وقالوا هو روحه حقيقة

ঐ সকল লোকদের এসব মুর্খতাসূলভ কথা-বার্তা কত নিকৃষ্ট যারা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে যেভাবে খৃষ্টানরা ঈসা ﵇ এর ব্যাপারে করেছিল। (ঈসা ﵇ কে রুপক অর্থে আল্লাহর রুহ্ বলা হয়) তারা বলেছিল ঈসা ﵇ বাস্তবেই আল্লাহর রুহ (প্রাণ)।(অর্থাৎ তিনি একজন ইলাহ)। [কাশফুল মুশকিল]

খ. সিফাত সম্পর্কে তারা যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপণ করে

তার বেশিরভাগই ওলামায়ে কিরামের নিকট অগ্রহণযোগ্য এবং বিদয়াত হিসেবে চিহ্নিত। যেমন, হাত-পা, চোখ ইত্যাদি বিষয়কে তারা আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে কল্পণা করে। তারা অবশ্য এটা বলে যে আল্লাহর হাত অন্যান্য সৃষ্টির হাতের মতো নয়। এর উদাহরণে তারা বলে, মানুষের হাত আর বানরের হাত এক রকম নয়। অর্থাৎ আল্লাহর একটি হাত আছে যা দেখতে অন্যান্য সৃষ্টির হাতের চেয়ে ব্যাতিক্রম কিন্তু সেটি একটি অঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ হয়তো আল্লাহর হাতে আঙ্গুল থাকলো ১০ টি বা ১০০ টি অথবা কুনুই থাকলো একাধিক এভাবে যে কোনো দিক থেকে অন্যান্য সৃষ্টির সাথে কিছু পার্থক্য থাকলেই আল্লাহর হাত থাকাতে সমস্যা নেই। চোখ, চেহারা ইত্যাদি বিষয়েও তারা একই মন্তব্য করে। কিন্তু ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, আল্লাহর ব্যাপারে হাত, পা, চোখ, চেহারা ইত্যাদি যা কিছুর কথা কুরআন-হাদীসে বলা হয়েছে তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে গণ্য নয়। বরং হয়তো তা আল্লাহর ক্ষমতা ও তত্ত্বাবধায়ন অর্থে গ্রহণ করা হবে অথবা অন্য কোনো ব্যাখ্যা করা হবে যা আল্লাহর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যারা এসব বিষয়কে আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে কল্পণা করে তারা সুস্পষ্ট বিদয়াতের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে।

গ. এই সকল লোকদের আরেকটি বিদয়াত হলো তারা কিয়াস করে আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রমাণের চেষ্টা করে। কুরআন-

হাদীসের কোথাও আল্লাহর ব্যাপারে কান শব্দটি প্রয়োগ করা হয়নি। কিন্তু এরা বলে, আল্লাহর কান আছে তা না হলে তিনি শুনতে পান কিভাবে? [নাউযু বিল্লাহ] এটা সুস্পষ্টভাবে মুজাসসিমাদের আক্বীদা। যেহেতু কান না থাকলে শুনতে পাবে না এটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা স্রষ্টার উপর প্রয়োগ করার অর্থ হলো তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মতামত হলো, যেসব বিষয় কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই সেগুলো কিয়াস বা ইজতিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যাবে না।

বদরুদ্দীন আল-আইনী رحمه الله বলেন,

وقال الخطابي الأصل في الإصبع ونحوها أن لا يطلق على الله إلا أن يكون بكتاب أو خبر مقطوع بصحته فإن لم يكونا فالتوقف عن الإطلاق واجب

ইমাম খাত্তাবী বলেন, হাতের আঙ্গুল বা এই জাতীয় বিষয়ে কথা হলো আল্লাহর ব্যাপারে এমন কোনো শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না যা কুরআন ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হাদীসে নেই। এভাবে প্রমাণিত নয় এমন কোনো বিষয় আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা হতে বিরত হওয়া ওয়াজিব। [উমদাতুল কারী]

সুতরাং যারা বলে, কান না থাকলে আল্লাহ শোনেন কিভাবে তারা বিভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী। একইভাবে যারা বলে কিয়ামতে দিন মুমিনরা আল্লাহকে দেখতে পাবে অতএব নিশ্চয় তার

আকৃতি আছে অর্থাৎ আল্লাহকে দেখতে হলে তার আকৃতি থাকা লাগবে তারাও বর্তমান যুগের মুজাসসিমা।

ঘ. এই সকল লোকদের আরও একটি বিদয়াত হলো যেসব ওলামায়ে কিরাম, সিফাতের আয়াহতসমূহের ব্যাপারে তাদের ব্যাখ্যার বিপরীত কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এরা তাদের আক্বীদায় সমস্যা আছে বলে মনে করে। উপরে আমরা ইমাম নাব্বী, হাফিজ ইবনে হাযার আসক্বালানী, বদরুদ্দীন আইনী, ইমাম কুরতুবী প্রমুখ ওলামায়ে কিরাম থেকে যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছি এরা সেগুলোকে বিভ্রান্ত আক্বীদা মনে করে বিধায় ঐ সকল ওলামায়ে কিরামের উপর আপত্তি উত্থাপন করে। এই সকল ওলামায়ে কিরামের আক্বীদার ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করে তাদের অনেকে বেশ কিছু কিতাবাদিও রচনা করেছে। হাস্যকরই বটে! কিছু নির্বোধ লোক নিজেদের বিদয়াতী আক্বীদা বিশ্বাস সংশোধন করার পরিবর্তে আলেম ওলামাদের আক্বীদায় ত্রুটি অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। কথায় বলে, চোরের মার বড় গলা!

জাহান্নামের উপর আল্লাহ্ ﷻ নিজের পা রাখবেন এ সম্পর্কিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় যারা মনে করে পা বলতে এখানে আল্লাহর সিফাত সমূহের মধ্যে একটি সিফাত বোঝানো হয়েছে তাদের তিরষ্কার করে ইমাম আব্দুর রহমান ইবনুল জাওজী رحمه الله বলেন,

كان من تقدم من السلف يسكتون عند سماع هذه الأشياء ولا يفسرونها مع علمهم أن ذات الله تعالى لا تتبعض ولا يحويها مكان ولا توصف بالتغير ولا بالإنتفال ومن صرف عن نفسه ما يوجب التشبيه وسكت عن تفسير ما يضاف إلى الله عز وجل من هذه الأشياء فقد سلك طريق السلف الصالح وسلم فأما من ادعى سلوك طريق السلف ثم فهم من هذا الحديث أن القدم صفة ذاتية وأنها توضع في جهنم فما عرف ما يجب لله ولا ما يستحيل عليه ولا سلك منهاج السلف في السكوت ولا مذهب المتأولين وأخسس به من مذهب ثالث ابتدعه من غضب من البدع قال أبو الوفاء بن عقيل تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة هذا عين التجسيم ثم إنه لا يعمل في النار أمره وتكوينه حتى يستعين بشيء من ذاته

পূর্ববর্তী সালফে সালেহীনরা এই সকল বিষয় শোনা মাত্র নিরাবতা অবলম্বন করতেন। এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতেন না। সেই সাথে তারা এ বিশ্বাস রাখতেন যে, আল্লাহর সত্ত্বা বিভিন্ন অংশে (যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গে) বিভক্ত নয়, কোনো স্থানে অবস্থিত নয়, কোনোভাবে পরিবর্তিত বা স্থানান্তরিত হতে পারে না। যে কেউ আল্লাহর ব্যাপারে এমন সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হতে বিরত থাকে যাতে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয় এবং আল্লাহর সাথে ঐরুপ যা কিছু সম্পর্কিত করা হয়েছে সে সেগুলোর কোনোরুপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে না বরং নিরব থাকে সে সালফে সালেহীনদের পথ অনুসরণ করে। আর যে নিজেকে সালাফদের অনুসারী বলে

দাবী করে কিন্তু মনে করে এই হাদীসে পা বলতে আল্লাহ ﷻ এর স্বত্ত্বাগত সিফাত (বৈশিষ্ট্য) বোঝানো হয়েছে এবং এমন দাবী করে যে আল্লাহ জাহান্নামে এটা রাখবেন সে এটা বুঝতেই সক্ষম হয় নি যে, আল্লাহর ব্যাপারে কেমন কথা বলা উচিৎ আর কেমন কথা তার ব্যাপারে অসম্ভব। সে না সালফে সালেহীনদের নিরব থাকার নীতি অবলম্বন করেছে আর না সে (সঙ্গতিপূর্ণ) ব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করেছে। তার এই তৃতীয় বিদয়াতপন্তী মতবাদটি কত নিকৃষ্ট! যারা বিদয়াতের বিরোধীতা করে তারাই এই বিদয়াত তৈরী করেছে। আবুল ওফা ইবনে আক্বীল বলেন আল্লাহ এ থেকে পবিত্র যে, তার একটি সিফাত থাকবে যা কোনো স্থানে অবস্থান করবে। এটিই তো প্রকৃত মুজাস্‌সিমাদের আক্বীদা। তাছাড়া আল্লাহ্ ﷻ কি এতটাই অক্ষম হয়ে গেলেন যে, জাহান্নামকে আদেশ দান করার মাধ্যমে নিরব করতে পারলেন না এমন কি নিজের স্বত্ত্বাগত একটি সিফাত (বৈশিষ্ট্য) ব্যবহার করতে (জাহান্নামের ভিতরে রাখতে) বাধ্য হলেন! [কাশফুল মুশকিল]

৫. জিহাদবিরোধী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা।

বর্তমান সময়ের প্রচলিত একটি বিভ্রান্ত মতবাদ হলো গণতন্ত্র। এটি এমন একটি মতবাদ যা থেকে বহু সংখ্যক বিভ্রান্ত ও বিদয়াতী আক্বীদা-বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে। নিম্নে আমরা সেসব

বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করছি।

ক. জিহাদের অপব্যাখ্যা।

গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে জিহাদবিরোধী আখ্যায়িত করা এবং বিদয়াতী আক্বীদা হিসেবে গণ্য করার বিষয়টি অনেকের নিকট অপছন্দ হবে বলেই মনে হয়। তারা বলেন, জিহাদ অর্থ হলো, চেষ্টা প্রচেষ্টা করা। যারা গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামী আন্দোলন করছেন তারাও দ্বীন কায়েমের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত আছেন। অতএব, তাদের জিহাদ বিরোধী আখ্যা দেওয়া সঠিক হতে পারে না। ‘‘জিহাদ অর্থ চেষ্টা প্রচেষ্টা করা অতএব, যে কোনো ভাবে ইসলামের জন্য কিছু করাই হলো জিহাদ’’- এই মতবাদটি বর্তমানে ব্যাপক প্রশিদ্ধি লাভ করেছে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী মিছিল, মিটিং, বই লেখা, গলা ফাটিয়ে বক্তব্য দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকান্ডকে জিহাদ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। একটি মাদ্রাসা বা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এম,পি মন্ত্রীদের নিকট গমণ করে তাদের পদ লেহন করাও এখন জিহাদ হিসেবে গণ্য। মাদ্রাসার শিক্ষকরা একত্রিত হয়ে ২১ শে ফ্রেব্রুয়ারী বা ১৬ ই ডিসেম্বরে মিছিলে অংশগ্রহণ করা, স্মৃতি সৌধে ফুল দেওয়া ইত্যাদি কর্মাকান্ডও জিহাদ। যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্যেই এগুলো করা হয়। কোনো কোনো

মহাপন্ডিত তো এতদূর পর্যন্ত বলেছে যে, মুশরিকরাও জিহাদ করে। যেহেতু আল্লাহ বলেন, যদি তোমার (মুশিরিক) পিতা-মাতা তোমাকে দিয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করানোর চেষ্টা করে তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। [আনকাবুত/৮] এই আয়াতে চেষ্টা করার স্থানে জাহাদা (جاهد) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি জিহাদ খুবই ফজিলতপূর্ণ একটি ইবাদত। এই সকল গাধারা কি তাহলে এমন বলবে যে, মুসলিমদের বিপরীতে যখন কাফিররা সংগ্রাম করে তখন তাদেরও সওয়াব হয়! কেউ কেউ আবার বলেন এখন বুলেটের জিহাদ শেষ হয়ে ব্যালটের জিহাদ শুরু হয়েছে।

প্রকৃত সত্য হলো, এই সকল নির্বোধরা জিহাদের শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম নয়। তারা এ দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। যাতে মুসলিম উম্মাহ জিহাদের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। সত্যান্বেষী পাঠককে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামী বিধিবিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো শব্দের শাব্দিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তার পারিভাষিক অর্থ তথা শারয়ী অর্থ গ্রহণযোগ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ নামাযকে আরবীতে বলা হয়, সলাত। সলাত (صلاة) শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা করা বা দোয়া করা [আল-মুগনী]। একারণে পবিত্র কুরআনে যারা যাকাত দেয় তাদের জন্য সলাত পড়তে (দোয়া করতে) আদেশ করা হয়েছে

[তাওবা/১০৩]। এছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্য আমরা বিশেষভাবে যে দোয়া করি, যাকে আমরা বলি দরুদ পাঠ করা, আরবীতে এটাকেও সলাত (صلاة) বলা হয়। যে আয়াতে রাসুলের উপর দরুদ পাঠ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [আহযাব/৫৬] এখন আল্লাহ ﷻ আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ফরজ করেছেন। প্রশ্ন হলো, দিনের মধ্যে পাঁচবার দোয়া করলে বা দরুদ পাঠ করলে কি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাত আদায় হবে? সলাত আদায় করার যেসব ফজিলতের কথা বলা হয়েছে কেবল, দোয়া বা দরূদ পাঠ করে কি সেসব সওয়াব পাওয়া যাবে? বিপরীত দিকে যে আয়াতে সলাত আদায়ের জন্য ওযু করা শর্ত করা হয়েছে [মায়েদা/৬] যদি সেই আয়াতে সলাত বলতে দোয়া বা দরুদ পাঠ করা বোঝা হয় তবে অর্থ হবে দোয়া বা দরুদ পাঠের সময়ও ওজু করে নিতে হবে। এটা কি সঠিক বুঝ হবে? বুদ্ধিমান যে কেউই জানেন যে এটা সঠিক হবে না কারণ সলাত শব্দটির শাব্দিক অর্থ যদিও দোয়া করা কিন্তু পারিভাষিকভাবে এটার অর্থ হলো, এমন একটি ইবাদত যার শুরু হয় তাকবীর বলে এবং শেষ হয় সালাম দিয়ে। মাঝে কিরাত, রুকু, সাজদা ইত্যাদি বিভিন্ন আমল করতে হয়। যদি কোনো ব্যক্তিকে বলা হয় আসুন সলাত (নামাজ) আদায় করি আর সে বলে, সলাত মানে হচ্ছে দোয়া করা আর আমরা তো সারাক্ষণ দোয়া-দরুদ

পাঠ করে থাকি সুতরাং আমাদের সলাত আদায়ের কথা কেনো বলা হচ্ছে! তবে কথাটি কেমন শোনাবে? পাঠককে স্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে যে, যখন কাউকে বলা হয় আপনি কি জিহাদ করবেন না? বা জিহাদ কি ফরজ নয়? আর সে বলে জিহাদ মানে হলো, চেষ্টা প্রচেষ্টা করা, আমরা তো বিভিন্নভাবে দ্বীনের জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টায় লিপ্ত আছি। তবে এটা হুবহু ঐ ব্যক্তির মতোই হয়। সুতরাং শাব্দিক অর্থ আর পারিভাষিক অর্থকে গুলিয়ে ফেলাটা একটি বিদয়াত কিন্তু তার চেয়েও বড় বিদয়াত হলো, পারিভাষিক অর্থটি অস্বীকার করা বা বিকৃত করা। যারা বলে, জিহাদ অর্থ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা অতএব, যুদ্ধ-বিগ্রহের কোনো প্রয়োজন নেই বরং বই লেখা, বক্তব্য দেওয়া, ব্যালট পেপারে ছিল মারা ইত্যাদি কাজই যথেষ্ট হবে। তারা আসলে জিহাদের প্রকৃত অর্থটি মুছে ফেলতে চায়। এখানে স্মরণ রাখথে হবে যে, কুরআন-হাদীসে কেবল জিহাদ শব্দটি উল্লেখ করা হয় নি বরং কিতাল বা গযওয়া শব্দও উল্লেখ আছে। পবিত্র কুরআনে জিহাদ শব্দটি উল্লেখ আছে চারটি স্থানে আর সরাসরি কিতাল (قتال) তথা যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে তেরোটি স্থানে। যুদ্ধ করার নির্দেশ ও যুদ্ধ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে পবিত্র কুরআনে ত্রিশটিরও অধিক স্থানে কিতাল শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো যে আয়াতে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা ফরজ করা হয়েছে সেখানে জিহাদের পরিবর্তে কিতাল শব্দ

উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

তোমাদের উপর কিতাল (যুদ্ধ) ফরজ করা হয়েছে। যদিও তোমরা এটা অপছন্দ কর। এমন হতে পারে যে, তোমরা কোনো বিষয়কে অপছন্দ করছো অথচ তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা কোনো বিষয়কে পছন্দ করছো অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না। [বাকারা/২১৬]

এছাড়া সূরা বাকারার ১৯৩ নং আয়াত এবং সূরা আনফালের ৩৯ নং আয়াতে ফিতনা শেষ হওয়া এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদুটি আয়াতেও কিতাল শব্দ ব্যবাহার করা হয়েছে জিহাদ নয়।

সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াতে কাফিররা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া আদায় না করা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে। সেখানেও জিহাদের পরিবর্তে কিতাল শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

এভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি স্থানে জিহাদের পরিবর্তে কিতাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ ﷻ জানতেন একদল

লোক জিহাদ শব্দটিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের বিধানটিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সম্ভবত সে কারণেই জিহাদের পরিবর্তে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা সরাসরি যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। অতএব মুনাফিক শ্রেণীর লোকদের এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, জিহাদ শব্দটি যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করে নিলেই কাফিরদের সাথে আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন থাকবে না। বরং যদি আমরা মেনেও নিই যে, জিহাদ অর্থ হচ্ছে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো তবুও কিতালের আয়াতগুলোর কারণে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা ফরজ এটা প্রমাণিত হবে। অতএব, তর্ক-বিতর্ক করে লাভ নেই বরং স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা ফরজ করা হয়েছে।

খ. মুসলিমদের নিরস্ত্র করার অপচেষ্টা।

গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার দ্বিতীয় বিদয়াতটি হলো মুসলিমদের অস্ত্র সম্পর্কে গাফিল করে দেওয়া। আমরা উপরে বলেছি, মহান আল্লাহ আমাদের কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। যুদ্ধ করতে হলে অস্ত্র প্রয়োজন। তাই তিনি আমাদের উপর অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করাও ফরজ করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}

তোমরা তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য যতদূর সম্ভব শক্তি সংগ্রহ করো ও ঘোড়া প্রস্তুত করো। যাতে করে এর মাধ্যমে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভয় দেখাতে পারো। [আনফাল/৬০]

তিনি আরও বলেন,

{وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً}

কাফিররা চায় যদি তোমরা অস্ত্র-সস্ত্র সম্পর্কে গাফিল হও, যাতে তারা তোমাদের উপর একটি বার হামলা করতে পারে। [নিসা/১০২]

উমর ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

من حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله والسباحة والرمي

পিতার উপর সন্তানের হক এই যে, পিতা তাকে আল্লাহর কিতাব, সাতার ও তীর নিক্ষেপ শিক্ষা দেবে।

[আহকামুল কুরআন জাসসাস, বায়হাকী]

ইমাম আল কুরতুবী বলেন

وتعلم الفروسية واستعمال الاسلحة فرض كفاية

ঘোড়া ও অস্ত্র চালানো শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া [তাফসীরে কুরতুবী]

এই হচ্ছে কুরআন-হাদীসের রায় এবং সে আলোকে ওলামায়ে দ্বীনের বক্তব্য কিন্তু গণতন্ত্র মুসলিমদের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। গনতন্ত্র বলে, ইসলামপন্থীদের হাতে কোনো অস্ত্র থাকবে না। বরং অস্ত্র থাকবে কাফির মুশরিকদের হাতে তৈরী এবং তাদের অনুগত সেনাবাহিনীর হাতে। যারা ইসলামের জন্য আন্দোলন কারতে চায় তারা জনগণের ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করুক। যদি তারা ভোটে পরাজিত হয় তবে পাঁচ বছরের জন্য তাগুতী আইনকে মেনে নিয়ে সুনাগরিক হয়ে দেশে বসবাস করবে আর যদি কখনও জয়ী হয় তবে এই সেনাবাহিনী তাদের ক্ষমতায় রাখা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখবে। যদি তারা ইসলামটাকে কেবল দাড়ি-টুপির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং দাদা হুজুরদের সন্তুষ্টি বজায় রেখে চলে তবে হয়তো তাদের ক্ষমতায় রাখা হবে আর যদি একটু অগ্রসর হয়ে চোরের হাত কাটা, জেনাকারীকে রজম করা বা অন্যান্য ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বা কোনো কারণে বিশ্ব মোড়লরা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয় তবে সেনাবাহিনী এসব নিরস্ত্র গণতান্ত্রিক হুজুরদের ক্ষমতাচ্যুত করে ভোটে পাশ করার অপরাধে কারাদন্ড বা এমনকি মৃত্যুদন্ডে পর্যন্ত দন্ডিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিকট অতীতে আল-জেরিয়াতে এবং বর্তমানে মিশরে যা ঘটেছে তাতে আমরা এই শিক্ষাই পায়। যদি কেউ মনে করে অস্ত্র ব্যবহার না করেই কাফিরদের সাথে আলোচনা ও

সমোঝতার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব তাদের দুটি চোখই অন্ধ। একদিকে যেমন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হতে তারা বহু দূরে অবস্থান করছে সেই সাথে বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই। তারা এটা ভুলে গেছে যে, কাফিররা দয়া ও অনুকম্পা করে কখনও ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না এবং ইসলাম কারো দয়া ও অনুকম্পা গ্রহণ করার জন্য পৃথিবীতে আসে নি। পাঁচবছর ইসলামী আইন চলবে আর পাঁচ বছর কুফরী আইন চলবে এটাও ইসলাম স্বীকার করে না। সেটা সম্ভব হলে তো মাক্কী যুগেই দ্বীন কায়েম হয়ে যেতো! বদর বা উহুদে রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধের কি প্রয়োজন ছিল? মক্কার কাফিররাও তো রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলেছিল,

এসো কিছু দিন তোমরা আমাদের উপাস্যের ইবাদত করবে এবং আমরা কিছুদিন তোমাদের উপাস্যের ইবাদত করবো। [তাফসীরে তাবারী, ইবনে কাছির ও অন্যান্য]

এই সহজ পদ্ধতিটি রাসুলুল্লাহ ﷺ কেনো গ্রহণ করলেন না? কেনোই বা মহান আল্লাহ তাকে এটা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন? কারণ ইসলাম হলো, মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যিনি এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা। কারো সাথে আপোস-রফা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং তিনি নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের দাবীদার। ইসলাম শিরক-কুফরীর সাথে মিলে-মিশে থাকার জন্য আসে নি বরং সকল ধর্মের উপর কর্তৃত্ব করতে এসেছে। মহান

আল্লাহ বলেন,

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}

তিনি রাসূল প্রেরণ করেছেন সৎ পথ এবং সত্য দ্বীন সহকারে যাতে তিনি এই দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন যদিও মুশরিকরা এটা অপছন্দ করে। [তাওবা/৩৩]

যারা আল্লাহর দ্বীনকে অপছন্দ করে তাদের সংখ্যা যত বেশিই হোক আল্লাহ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এটাই আল্লাহর নির্দেশ। কাদের পক্ষে ভোট বেশি হলো এটা বিবেচ্য বিষয় নয় বরং "সৃষ্টি যার আইন চলবে তার" এটাই বিবেচ্য বিষয়।

বাতিলের সাথে আপোস করতে হলে বাতিলের কিছু অংশ মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। গণতন্ত্র মুসলিমদের এটাই শেখায়। বিপরীত দিকে বাতিলকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অস্ত্র ধরার কোনো বিকল্প নেই। ইসলাম আমাদের এ শিক্ষায় দেয়।

সুতরাং নিজেরা অস্ত্র পরিত্যাগ করে কাফির-মুশরিকরা কবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেয় সেই আশায় কাফিরদের দেখানো পদ্ধতিতে ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সুস্পষ্ট বিদয়াত ও বিভ্রান্ত চিন্তাধারা। এই ব্যক্তির উদাহরণ তার মতো

যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

{كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ}

সে পানির দিকে হাত বাড়িয়ে থাকে যাতে পানি নিজ থেকে তার নিকট হাজির হয়। কিন্তু পানি তার নিকট হাজির হয় না। [রা'দ/১৪]

গ. তথাকথিত মানবতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।

গণতন্ত্রের আরেকটি বড় বিদয়াত হলো, আমল-আখলাক ও আক্বীদা-বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে সকল মানুষকে সমান মনে করা। একারণে গণতন্ত্রে কাফের-মুসলিম, নেককার-বদকার সকলের মতামতকে সমানভাবে বিবেচনা করা হয়। সাধারনভাবে এটা দাবী করা হয় যে, সকল মানুষের অধিকার সমান। তারা এটার নামকরণ করে, মানবতা। অর্থাৎ তাদের নিকট মানবতা বলতে বোঝায় মানুষ হিসেবে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা সবাই সমান। কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কেউ ছোট বা বড় নয়। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে মানবতার এই সংজ্ঞাটি যথার্থ নয়। কাজ-কর্ম ও চিন্তা-চেতনাকে গুরুত্ব না দিয়ে জন্মসূত্রে সকলকে সমান মনে করা পশুর ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে যেহেতু তাদের বিচার-বিবেচনা ও চিন্তাশক্তি নেই তাই তাদের কাজের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু মানুষের বোধ-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনা রয়েছে। কেবল

জন্মের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে গণ্য হতে পারে না, মানুষ হতে হলে মানুষের মতো কাজ করতে হয়। পশুর মতো মানুষের কাজ-কর্ম বিবেচনা না করে কেবল জন্মসূত্রে সকল মানুষকে সমান মনে করলে তাতে মানবতাকে অপমান করা হয়। যেহেতু এর মাধ্যমে মানুষের সাথে পশুর যে পার্থক্য তথা বোধ-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনাকেই অগ্রাহ্য করা হয়। যাই হোক, ইসলাম জন্মসূত্রে সকল মানুষকে সমান মনে করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে অজ্ঞ আর বিজ্ঞ সমান নয়, নেককার আর বদকার সমান নয়, কাফির আর মুসলিম সমান নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}

আপনি বলুন যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে! [যুমার/৯]

তিনি আরও বলেন,

{أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ}

যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল আমল করেছে তাদের কি আমি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সমান করবো? আমি কি নেককার আর বদকারকে সমান করবো? [সাদ/২৮]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন,

{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}

যারা খারাপ আমল করেছে তারা কি এমন মনে করে যে, আমি তাদের নেককার মুমিনদের সমপর্যায়ে রাখবো? [জাসিয়া/২১]

এছাড়া আল্লাহ ﷻ মুমিনদের ক্ষেত্রে বলেছেন, তারা খয়রুল বারিয়্যা (خير البرية) তথা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আর কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তারা শাররুল বারিয়্যা (شر البرية) তথা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি। [সূরা বায়্যিনা/৬,৭] মুমিন বান্দারা আল্লাহর নিকট পবিত্র কা'বা ঘরের চেয়েও বেশি সম্মানিত আর কাফিররা কুকুর বা শুকরের মতো জন্তু জানোয়ারের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট।

{أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل}

তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। [আ'রাফ/১৭৯]

সুতরাং ধর্ম-কর্মকে উপেক্ষা করে কেবল মানুষ পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে সকলকে সমান মনে করার যে নীতি গণতন্ত্র শিক্ষা দেয় ইসলাম তা গ্রহণ করে না।

গণতন্ত্রের আর একটি শিক্ষা হলো সকল ধর্মের লোকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা। যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে। কাউকে নিজ ধর্ম পালনে কোনোরূপ বাধা প্রদান করা হবে না

এবং নিজ ধর্ম পরিত্যাগে বাধ্য করা হবে না। সকল মানুষ একে অপরের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা সম্মান করবে এবং প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করার অধিকার আছে এটা বিশ্বাস করবে। এ ধরণের চিন্তাধারার কারণ হলো এরা সকল ধর্মকে সমান মনে করে। তারা বলে, সকল ধর্মই মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত। স্রষ্টা বলে কিছু নেই এবং কোনো ধর্মই তার পক্ষ থেকে নয়। বরং ধর্ম হলো মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত কিছু চিন্তাধারা। মুসলমানরা এই কুফরী আক্বীদাতে বিশ্বাসী নয়। তারা বলে, মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি মানুষের জন্য ইসলাম ধর্মকে মনোনিত করেছেন। ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম আর অন্য সকল ধর্ম বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল ধর্মকে সমান মনে করা বা সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা সম্মান করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মকে মুসলিমরা শিরক-কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং তীব্রভাবে ঘৃণা করে। মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ}

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সাজিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের

নিকট কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে ঘৃণিত করে দিয়েছেন। এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। [হুজুরাত/৭]

যেহেতু অন্য সকল ধর্মকে মুসলিমরা বাতিল মনে করে তাই সেগুলোকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে শিরক কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তারা সদা-সর্বদা স্বচেষ্ট থাকে।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر

আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ এবং আমিই বিনাশকারী। আল্লাহ আমার মাধ্যমে কুফরীকে বিনাশ করবেন।

[সহীহ বুখারী]

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ

আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষন না তারা স্বীকার করে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (অর্থাৎ মুসলিম হয়ে যাবে)। যখন তারা তা স্বীকার করবে তাদের সম্পদ ও রক্ত আমার নিকট সংরক্ষিত বিবেচিত হবে। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

আমর ইবনে আবাসা ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করেন, (بأي شيء أرسلك) "আল্লাহ আপনাকে কি উদ্দেশে প্রেরণ করেছেন? রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء

আমাকে পাঠানো হয়েছে যাতে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখি, মূর্তি ভেঙে ফেলি এবং যাতে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় তার সাথে কাউকে শরীক না করা হয়। [সহীহ মুসলিম]

মুস্তাদরাকে হাকীমে এই হাদীসের অন্য একটি বর্ণানায় এসেছে,

أن تعبد الله و تكسر الأوثان و الأديان

আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল মূর্তি ও অন্য সকল ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য।

আমর ইবন আবাসা ﷺ এটা শুনে বললেন, (نعم ما أرسلك به) "আল্লাহ আপনাকে কত উত্তম দায়িত্ব দিয়ে প্রেরন করেছেন!"

মোট কথা ইসলাম অন্য সকল ধর্মকে বাতিল মনে করে তাই সেগুলোকে ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা করার নির্দেশ প্রদান করে। মুসলমানদের উপর আল্লাহ ও রাসুলের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা অপমানজনক কিছু শর্ত মেনে নিয়ে

ইসলামী রাষ্ট্রকে জিজিয়া প্রদান করতে সম্মত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

ঐ সকল কিতাবীদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তার যা হারাম করেছেন তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করে না, এবং সত্য দ্বীনকে গ্রহণ করে না যতক্ষণ না তারা অপমানিত অবস্থায় স্বহস্তে জিজিয়া কর প্রদান করে। [সূরা তাওবা/২৯]

অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদান করার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে বিভিন্ন অপমানজনক শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো, কাফিররা তাদের ধর্ম প্রচার করতে পারবে না, প্রকাশ্যে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে না বরং গোপনে পালন করবে, নতুন কোনো উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না, ইসলামী রাষ্ট্রে তারা কোনো সম্মানিত পদ পাবে না ইত্যাদি। [ইবনে কাসির ও অন্যান্য]

বর্তমানে কেউ কেউ দাবী করে, যেসব কাফির জিজিয়া প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে তাদের মুসলিমদের সমান অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কেবল নির্বোধ লোকেরাই এধরণের কথা বলে থাকে। ইসলামে জিজিয়ার

বিধান সম্পর্কে এরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। আল্লাহ নিজেই জিজিয়ার সাথে অপমানিত অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম এর উপর আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে শিরক-কুফরকে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা সুযোগ দেওয়ার জন্য ইসলাম পৃথিবীতে আসে নি বরং শিরক-কুফরকে সম্ভব হলে ধ্বংস করে ফেলা বা কমপক্ষে বাধাগ্রস্ত করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। যাতে কাফিরদের পরাজিত করে ইসলাম গ্রহণ করতে বা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদান করতে বাধ্য করা হয়।

যারা মনে করে, ইসলাম যে কোনো ধর্ম পালন করার স্বধীনতা প্রদান করে তাদের নিকট প্রশ্ন হলো, যারা কাফির থেকে মুসলিম হয় ইসলাম তাদের সাদরে বরণ করে কিন্তু মুসলিম থেকে কাফির হয়ে গেলে তাকে হত্যা করতে আদেশ করে কেনো? এই প্রশ্নের জবাবে এসব অজ্ঞ লোকেরা বলে, যে মুসলিম কাফির হয়ে যায় তাকে হত্যা করতে হবে এটিই একমাত্র বিধান নয় বরং তাকে জেলে দেওয়া বা এমন কি ছেড়ে দেওয়াও যায়। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, (من بدل دينه فاقتلوه) “যে কেউ তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো” [সহীহ বুখারী]

ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وأجمع أهل العلم علي وجوب قتل المرتد

মুরতাদকে হত্যা করার ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন। [আল-মুগনী]

সুতরাং সকল ধর্মের লোকদের সমঅধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি বিদয়াতী মতবাদ যা বর্তমানে ইসলামের নামে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

উপসংহারঃ

এ অধ্যায়ে আমরা বিদয়াতের উদাহরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রথমেই আমরা এমন কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছি যেগুলো প্রকৃত অর্থে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। যেহেতু সে ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের দ্বিমত রয়েছে এবং সেগুলো হারাম পর্যায়ের নয় বরং মাকরুহ পর্যায়ের। পরবর্তীতে আমরা এমন কিছু বিদয়াতী কর্মকান্ডের বর্ণনা দিয়েছি যেগুলো নিষিদ্ধ বিদয়াত হওয়ার ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরাম একমত এবং মুসলিম উম্মাহর উপর এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। দা'ওয়াতের সঠিক কর্মপন্থা হলো, অপ্রয়োজনীয় ও অগুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিত্যাগ করে নিশ্চিত ক্ষতিকর বিষয় হতে মুসলিম উম্মাহকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। কিন্তু শয়তান চায় দ্বীনের দা'ওয়াতকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে প্রবাহিত করতে। বড় বড় শিরক-কুফর এবং সুস্পষ্ট বিদয়াতী কর্মকান্ডের পরিবর্তে,

তাবিজ-তুমার, মিলাদ-মোনাজাত ইত্যাদি কর্মকান্ডের পিছনে লেগে সময় নষ্ট করানোই তার উদ্দেশ্য। যারা দ্বীনের দা'ওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান হলো, আসুন আমরা ছোট-খাটো ও ব্যাখ্যা স্বাপেক্ষ্য বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করে মুসলিম উম্মাহকে খন্ড-বিখন্ড করার পরিবর্তে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিগুলো সংশোধনের চেষ্টা করি। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা। তারই নিকট আশ্রই পার্থনা করি। তারই সহযোগিতা কামনা করি। আমিন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

تمت بالخير

লেখকের অন্যান্য বই

* গ্রন্থাবলী:

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্

* রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):

১৬. ছোটদের আক্বাইদ

১৭. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৮. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
১৯. মাসায়িলুল ই’তিকাফ (আরবী)
২০. সংশয় নিরসন

* ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:

২১. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উম্মোচন)
২২. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৩. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৪. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৫. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৬. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৭. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৮. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)

* ভাষা শিক্ষা:

২৯. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩০. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)
২. বায়াত (উপন্যাস)